৬৫।৮

Regd. No. D. 65.

৬ষ্ঠ বর্ষ । বৈশাখ । ১ম সংখ্যা ।

সন ১৩২০ সাল ।

আর্য্য-দর্পণ

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা ।)

———:0:———

শান্তি—আশ্রমের
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

সূচী ।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ।)

যোরহাট,
দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত ।
শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪২৭ ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা ।} {প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ আনা ।

আর্য্য-দর্পণের নিয়মাবলী।

"আর্য্য-দর্পণ" প্রধানতঃ ধর্ম্ম-ও-নীতি-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা বটে। সময় সময় ইহাতে তদানুসঙ্গিক বিষয়াদিও বিবৃত হইতে পারিবে।

সর্ব্বশ্রেণীর গ্রাহকগণের জন্যই আর্য্য-দর্পণের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২৲ দুই টাকা অগ্রিম দেয়। নমুনার প্রয়োজন হইলে ৵১০ সাড়ে তিন আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হইবে।

প্রতি মাসের প্রথমেই "আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশিত হইয়া সেই মাস মধ্যে গ্রাহকগণের সমীপে প্রেরিত হইবে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা সেই সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী নহি।

গ্রাহকগণ পত্রাদি লেখার সময় বা মূল্য প্রেরণের সময় স্বীয় স্বীয় নম্বর লিখিয়া দিবেন। নূতন গ্রাহক "নূতন" এই কথাটী লিখিয়া দিবেন; ঠিকানা পরিবর্ত্তন যথাকালে কার্য্যাধ্যক্ষকে না জানাইলে, পত্রিকার অপ্রাপ্তিজন্য আমরা দায়ী হইব না।

এক পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ ও বিনিময়-পত্রাদি সম্পাদকের নামে পঠাইবেন। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাকটিকেট পাঠাইতে হইবে।

যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের স্থিতির অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইবেন: শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের আহুতি কল্পে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা, কি এককালীন দান—**যিনি যাহা শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেন,** তাহা যতই অল্প হউক না কেন, সাদরে গৃহীত ও আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা-স্তম্ভে স্বীকৃত হইবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

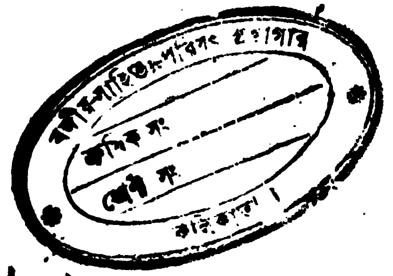
কেহ ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। কেন না কাহারও কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে কিম্বা কাহারও দোষ অন্বেষণ করিতে আর্য্য-দর্পণ-পত্রিকা অত্যন্ত ঘৃণাবোধ করেন। অনর্থক বাজে বিষয় লইয়া বাদ প্রতিবাদ করার অত্র পত্রিকায় স্থানাভাব।

ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন বিষয় অত্র পত্রিকায় সমালোচিত হয় না। সমাজের বা গ্রন্থকারের বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করিলে গুণাংশ ব্যতীত অন্য বিষয় সমালোচনা বাহুল্য বিবেচনা করি।

পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে বা মূল্য পাঠাইতে হইলে আমার নামে পাঠাইবেন।

আর্য্য-দর্পণ-কার্য্যালয়।
পোঃ কোকিলামুখ,
শান্তি-আশ্রম (যোরহাট)।

বিনীত—
শ্রীকুমার চিদানন্দ,
কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ।"



ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

ওঁ নববর্ষাধিপতয়ে নমঃ।

স্তোত্রম্।

দারিদ্র্য রোগ ভয় বিহ্বল মানসোঽহং
যজ্ঞাদিনা দুরিত শান্তি বিধাবশক্তঃ।
সর্ব্বার্ত্তিহৃৎ সকল শান্তি বিধান বীজং
মাতস্ত্বদীয় চরণাম্বুজ মেব যাচে॥ ১॥

যস্যাঃ শিশোঃ স্ফুরতি নৈব কদাপি বাণী
ক্ষুত্তৃষ্ণয়োরপি ন রোদিতু মস্তি শক্তিঃ।
সা কিং ন তস্য তনুজস্য মুখং নিরীক্ষ্য
মাতা স্বয়ং প্রকুরুতে স্তন সন্নিকৃষ্টম্॥ ২॥

তাদৃক্ শিশোরিব দশাং মম পশ্য মাতঃ
কার্য্যং মদর্থমিহ যৎ কুরু তদ্ বিবিচ্য।
জানামি নৈব মম কিং হিতমন্যথা বা
কিং বার্থয়েঽহম্ ভুবন প্রতিপালিকে ত্বাম্॥ ৩॥

অঙ্কে নিবাস মনুচিন্ত্য তবার্ভকা যে
নিত্যং বসন্তি সুখিনো বিনিবৃত্ত শঙ্কাঃ।
ধন্যা হি তে ক্ষিতিতলে মনুজেষু দেবাঃ
কালাধিকার মপহায় ভবন্তি মুক্তাঃ॥ ৪॥

নিত্যাসি দেবি ভুবনং তব রূপমেব
যো যত্র তিষ্ঠতি সদা স তবাঙ্ক এব।
জানামি বিশ্ব জানি শ্রুতি বাক্যতোঽহং-
মক্যাদৃতে তব ন কুত্র বসামি সত্যম্ ॥ ৫ ॥

জ্ঞানং যদত্র গুরু শাস্ত্র বচোভ্য আপ্তং
সম্যক্ ফলায় নহি তৎ যদিদং পরোক্ষম্।
তস্মাত্তে চরণয়োর্মতি রস্তি চাহং
তাপত্রয়েণ সততং পরিদহ্যমানঃ ॥ ৬ ॥

মোহান্ধকার মলিনীকৃত দৃষ্টিরেষ
ত্বৎ সন্নিকর্ষ মুপলব্ধু মহং ন শক্তঃ।
সর্ব্বাত্ম বাসিনি সমস্ত জগৎ স্বরূপে
মন্যে ত্বমস্যখিল ধাত্রি সুদূর দেশে ॥ ৭ ॥

কুত্রাসি কিং ন দয়সে তনুজং সুদীনং
সংসার চক্র পরিপীড়িত মর্ম্মসন্ধিম্।
একাকিনং ভববনে পতিতং বিনষ্টং
ত্রায়স্ব মোহগহনাদ্ ভবদৃষ্টি যোগ্যা ॥ ৮ ॥

ত্বন্নাম কীর্ত্তন বলা ন্মনুজা স্তরন্তি
দুঃখার্ণবং মুনিভিরুক্ত মিদং পুরাণৈঃ।
দুর্গেতি নাম জগদীশ্বরি তে গৃণন্তো
মাতঃ কথং দুরিত রোগ ভয়াকুলাঃ স্মঃ ॥ ৯ ॥

মাতঃ শৃণোষি রুদিতং স্বর মাত্মজানাং
তেষাঞ্চ দুঃখ মখিলং স্বরমেব বেৎসি।
দুঃখান্তক স্তব পদাশ্রয় এক এব
তত্রাপি হেতুরিহ তে করুণৈব নান্যঃ ॥ ১০ ॥

যদ্যাস্তিকে তব কৃপা গুণকর্ম্মলভ্যা
কিং কথ্যসে মুনিগণৈঃ করুণাময়ীতি।
কস্তে কৃপাবল মৃতে শুভ কর্ম্ম কর্ত্তুং
শক্নোতি বা গুণলবং জননীহ লব্ধুম্ ॥ ১১ ॥

মাতর্ব্বয়ং স্বকৃত পাতক জন্য দুঃখং
ভুক্ত্বাবসন্ন হৃদয়াঃ শরণাগতাস্ত্বাম্।
কিং কর্ম্ম কর্ত্তু মুচিতং দুরিত ক্ষয়ায়
বিদ্মো ন দেহি জগদীশ্বরি নঃ সুবুদ্ধিম্ ॥ ১২ ॥

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চাচরিতং সতাং তথা
বিশুদ্ধ বুদ্ধেঃ প্রিয় মাত্মনশ্চ যৎ।
এতৈঃ প্রমাণৈরপি তেঽনুকম্পয়া
বিনা ন কর্ত্তব্য নিরূপণং ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥

যস্মাদিহামুত্র শুভংহি জায়তে
যেনাশু নশ্যন্তিহ সর্ব্ব দুর্দ্দশাঃ।
তৎ কর্ম্ম মাতর্দিশ শঙ্করি স্বয়ং
কর্ত্তুঞ্চ তন্নঃ সততং নিয়োজয় ॥ ১৪ ॥

দুরারাধ্যাসি ত্বং হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতিভি
রিতি শ্রুত্বা বাণীং ভগবতি পুরাণাদি কথিতাম্!
ন ভগ্নোৎসাহোঽহং তব চরণ লাভাভিলষিতে
দয়ানর্হং সূনুং ক্বচিদপি ন জানাতি জননি ॥ ১৫ ॥

মনস্তাপ ক্লিষ্টে বিবিধ মল দুষ্টার্ত্তবপুষি
সদা নানা চিন্তা হুতবহ শিখা দগ্ধ হৃদয়ে।
মহা মোহাচ্ছন্নে কুরু মরিকৃপাং দীন পতিতে
প্রসীদাদ্যে দুর্গে জননিবরদাকান্ত ভিষজি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবরদাকান্ত রায়েণ বিরচিতং
সাহিত্যপরিষদি পঠিতঞ্চ।

———:0:———

জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় ধর্ম্মমত।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যখন পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ ও নাস্তিকতার কঠোর—কর্কশ আরাবে দিগ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত; তখন অবসর বুঝিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিক ও কাপালিকগণ বিকট বদনে বেদানুগ্রহ-ছায়াশ্রিত ভারতভূমিকে গ্রাস করিয়া বসিল—পঞ্চ ম-কারের সাধনার নামে মদ-মাংসের শ্রাদ্ধ ও নারীর সতীত্ব লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।* জপ, তপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চ্চা উঠিয়া গেল; বিষয়াসক্তি ভারতবর্ষকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় গ্রাস করিয়া বসিল। তপস্তেজবীর্য্যবান্ ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ নিভৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, মুনিগণ যোগিগণ লোকসমাজের অগোচরে লুক্কায়িত হইলেন। সাধারণ লোকসকল বিষয়ের দাস হইয়া—সংসারের কীট হইয়া স্বর্গ সুখাদি ভোগকামনায় ব্রহ্মজ্ঞান—আত্মসমাধি আদি ভুলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকেই আদর করিতে লাগিল। ভারতসন্তানগণ জগৎপতিকে ভুলিয়া জড় জগতের সেবায় মনোনিবেশ করিল;—ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া নরগণ নারায়ণকে বিদায় দিয়া, সংসারকেই সার ভাবিয়া স্বার্থ সেবার ব্রতী হইল। ভারতভূমির বৈদিক-প্রতিভা অন্তর্হিত হইল,—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উজ্জ্বল হেমপ্রভা কালের নিষ্পেষণে শুকাইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ভারতের সর্ব্বত্র অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল।

সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া দেবগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন,—ভগবানের চির স্নেহের ভারতের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার অটল সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেইসময়ে শিব-তেজ-বীর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবীপ্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতে আবির্ভূত হইয়া ভারত-সিংহাসনে বেদান্ত শাস্ত্রের বিজয় মুকুট স্থাপন করিলেন। বেদান্ত শাস্ত্রের পুনঃপ্রচার করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনিত্যতা, জগতের অসত্যতা, কুজ্ঝটিকাবৎ সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং ব্রহ্মই সত্য ইহাই লোক সকলকে শিক্ষা দিলেন। তিনি বুঝাইলেন,—জীবও ব্রহ্ম, জগৎও ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার প্রতিভা ও তপস্তেজবীর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম, চীন, জাপান, তিব্বত, লঙ্কা প্রভৃতি তদানীন্তন অনার্য্যদেশে যাইয়া আধিপত্য বিস্তার করিল। কেহ কেহ বা পর্ব্বতগুহায় কিম্বা নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল। মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিভার নিকট জড় হইয়া গেলেন। সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গুরুর কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। দেশের আপামর সাধারণ তাঁহার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতি অল্পকালেই সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল,—তিনি লোকগুরু—জগদ্গুরুরূপে ভারতের সর্ব্বত্র শান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধমন্দিরে

---

* ভ্রষ্ট বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবগণের কুৎসায় প্রকৃত বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবগণের কিম্বা তাঁহাদিগের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতার কোনরূপ গৌরবহানি হয় না। প্রবন্ধলেখক।

দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত এবং বৌদ্ধমঠ গুলি হিন্দুমঠে পরিণত হইল। আবার সকলে বেদ বেদান্তোক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; অপূর্ণ মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিয়া মর্ত্ত্যেই অমরত্ব লাভ করিল।

শঙ্করাচার্য্য হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং গান্ধার (গুজরাট) হইতে চট্টল (চট্টগ্রাম) পর্য্যন্ত দেশে দেশে ভ্রমন করিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষকে পুনর্জ্জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। অশ্রুসিক্ত ভারতমাতার মলিন বদনে আবার বিদ্যুদ্বিকাশ দেখা দিল। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠাতাগণ ভগবানের কোন বিশেষ একটী লক্ষণ নিরূপণ করিয়া, তাহা লাভের উপায় প্রচার করিয়াছেন। তাই যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে বিদ্বেষ-কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়া, যে বিশ্বব্যাপী উদারমত প্রচার করিলেন; তাহাতে সর্ব্বাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। তাই আজি হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, পার্শী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিশাল গর্ব্ভে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। এমন সর্ব্বমত-সমন্বয়ী ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমঞ্জসা উদার ধর্ম্মমত কখনও কোনও দেশে কাহারও কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। এমন ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, প্রেমিক-প্রচারক বুঝি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বত্রিশ বৎসর মাত্র তাঁহার পরমায়ু; এই বয়সে তিনি সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত হইয়া সাধন দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন, উপধর্ম্ম-পরিপ্লাবিত ভারতবর্ষে তিনি পদব্রজে, (তখন রেল, ষ্টিমার ছিল না) পর্য্যটন পূর্ব্বক সমগ্র ভারতে সত্য সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কত কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল,—কতবার দুর্ব্বৃত্তের হাতে জীবন সংশয় ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শারীরিক সূত্রের ভাষ্য, দশোপনিষদের ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য, যোগশাস্ত্রের টীকা, বাইট খানি বৈদিক গ্রন্থ এবং ভক্তি গদ্‌গদ্‌চিত্তে কত দেব দেবীর স্তবাদি রচনা করিয়াছিলেন। মোহমুদ্গার, বিজ্ঞানভিক্ষু, আত্মবোধ, মণিরত্ন-মালা, অপরোক্ষানুভূতি, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পাঠক! একজনের বত্রিশবর্ষ আয়ুষ্কাল মধ্যে এরূপ কর্ম্মময় জীবন আর কাহারও দেখিয়াছ কি?—ভাবিতে গেলে আমাদিগের ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া যাইবে। তাই বুঝি আজি ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে শঙ্করের সুমহান্ নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়। ভারতের অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রচারকগণ আপন দেশের গণ্ডীর ছাড়াইয়া কোন সময়ে অন্য দেশের সাধারণ লোকের হৃদয় অধিকার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্কররূপে ভারতের ঘরে ঘরে পূজিত হইতেছেন।

তবে বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মহিমা বুঝিবার সুযোগ পান নাই। যে দেশের লোক ভগবান্ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার জানিয়াও হৃদয়ের শ্রদ্ধা

ভক্তির পরিবর্ত্তে "বেদ-বিরোধী নাস্তিক" বলিয়া ঘৃণা করে, তাহারা যে শঙ্করাচার্য্যকেও "প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?—আবার বঙ্গের এক সম্প্রদায় স্বকপোল-কল্পিত কাহিনী রচিয়া বলিয়া থাকে,—"যখন ভগবান্ দেখিলেন যে, ভারতের সমগ্র লোক ধর্ম্মবলে উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, তখন শিবকে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজকে বিপথে পরিচালনা করিতে তিনি আদেশ করেন, তাই শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব।" বলিহারি যুক্তি!—এ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। এরূপ কাহিনী প্রচারে শঙ্করাচার্য্যের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, কিন্তু ভগবানের "দয়াময়" নামের যে সপিণ্ড-করণ হইয়া গেল,—ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ যে ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহা সম্প্রদায়ান্ধ গোঁড়াগণ পণ্ডিত হইয়াও বুঝিতে পারিল না। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে ঐতিহাসিক সত্যও বুঝি তাহারা জানিত না; জানিলে নির্লজ্জের ন্যায় এ কাহিনী রচনা সম্ভবপর হইত না। তখন যে বেদ ও বেদ-প্রতিপাদিত ভগবানের কথা ভুলিয়া নাস্তিকতা ও জড়ত্বের দানবী-নিশ্বাসে ভারত অধঃপাতে গিয়াছিল, তবে "লোক উদ্ধার হইয়া গেল" বলিয়া ভগবানের মাথাব্যথা হইবে কেন? বরং শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সেই নাস্তিকতা ও জড়ত্বের পরিবর্ত্তে ভারতের পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দেন। তাই আত্ম কৃতজ্ঞতায় অনু-প্রাণিত হইয়া বুঝি এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইতেছে;—নতুবা এত বড় একটা অধঃ-পতিত জাতিকে অন্য দেশের লোক সহজে চিনিতে পারিবে কিরূপে? বঙ্গদেশে কখনই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব ছিল না; তাই আদি-শূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক এতদ্দেশে স্থাপনা করেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগেরই বংশধর। কালে তাহারা স্থানীয় ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া-মিশিয়া বৈদিকধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া ভ্রষ্টাচারী হইয়া গেল। তাই এতদ্দেশে বৃক্ষ ছাড়িয়া পর-গাছার আদর হইয়া থাকে,—তাই বেদানু-মোদিত ঋষি-প্রণীত স্মৃতির স্থলে রঘুনন্দনের ব্যবস্থা, পাণিনীর স্থলে মুগ্ধবোধ কলাপ, আয়ুর্ব্বেদের স্থলে বৈদ্যশাস্ত্র, আতপের স্থলে সিদ্ধ, এবং সংযমের স্থলে স্বেচ্ছাচার অধিকার করিয়াছে। বাংলার পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ন্যায় দর্শনেই শুষ্কতর্কের রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে কখনই বেদ-বেদান্তের আলোচনা হয় নাই। দুই একজন পণ্ডিত বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিলেও অম্বয়, শব্দার্থ ব্যতিরেকে "জায়তে জ্ঞানমুত্তমং"—অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতে পারেন নাই; বিদ্যালয়ের বালকোচিত সগুণ-নির্গুণের অর্থ করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ বেদান্তের আদর করিতে শিখিয়াছে বটে; কিন্তু তাহারাও উশৃঙ্খলতাবশতঃ নানামত বাহির করিয়া নাম জাহির করিয়া বেড়াইতেছে। তাই এতদ্দেশে বেদান্ত বা তৎপ্রচারক শঙ্করা-চার্য্যের মহত্ত্ব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। যাহার চিত্ত যেরূপ অনুশাসিত, সে সেইরূপ বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে;

কিন্তু সত্যপ্রত্যক্ষকারী ব্যতীত বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে কাহারও শক্তি নাই। তবে ক্রমশঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্য্যের সিংহাসন স্থাপিত হইতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুগ্রহে তাঁহার সেবকগণও এতদ্দেশে বেদান্ত ও শঙ্করের মত প্রচার করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশে কেহ বেদান্ত বা শঙ্করাচার্য্যের মহোচ্চ গম্ভীর ভাব ধারণা করিতে পারুক আর নাই পারুক, সুদূর ইয়োরোপ—আমেরিকার গুণগ্রাহিব্যক্তিগণ শান্তি-বারি ও কণ্ঠের ভূষণ জ্ঞানে বেদান্ত ও শঙ্করের মত সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীমৎ স্বামী-বিবেকানন্দ একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারাই চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় ভারতের ধর্ম্ম-গৌরব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাই আজ বেদান্তশাস্ত্র পাশ্চাত্য ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড় দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি আট বৎসর বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই অনেক রাজা মহারাজা তাঁহার সুকুমার দেহ, যুক্তিপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদীয় সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাতার নিকট কৌশলে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মদান ও ব্রহ্মজ্ঞানে ভারতের ভূমিভার অবতারণার্থ শঙ্করাচার্য্য গৃহত্যাগ করিয়া স্বামী গোবিন্দপাদাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করতঃ সন্ন্যাসী হইলেন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—উপনিষৎ ও তাহার মীমাংসা স্বরূপ শারীরিক সূত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এবং প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনের অভাবে—গুরুর অভাবে—সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকারানুরূপ তত্ত্ব কথার প্রচারাভাবে ভারতে এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি অল্প সময়েই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া বিপন্ন ভারতের উদ্ধারার্থ দৃঢ়সংকল্প হইলেন। বহু আলোচনা, বহু সময় ও বহু আয়াস-সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার যে বিপুল বিঘ্ন-বিপত্তি-সংকুল একজনের জীবিতকালের মধ্যে সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, তাহা বুঝিয়াই তিনি সংসারের মায়া মমতা কাটাইয়া একাকী সহস্রজন-সাধ্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদাদির ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিলেন। পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর-মণ্ডন ও ত্রোটক এই প্রধান শিষ্য চতুষ্টয় সহ বেদান্তশাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারার্থ ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণের জন্য সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যবস্থা করিলেন; সাধারণের জন্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি প্রতীকোপাসনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; চিত্তশুদ্ধির জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত নিষ্কাম কর্ম্মের বিধিও অনুমোদন করিলেন। তাই সর্ব্বাধিকারী জনগণ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের উদার গর্ভে স্থানলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। কাশ্মীরের শারদাপীঠে আরোহণ এবং সমগ্র ভারতের সর্ব্বাধিকারী জনগণের গুরু হইবার সৌভাগ্য শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন

প্রচারক লাভ করিতে পারেন নাই। তাই শঙ্করাচার্য্য জগদ্গুরু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। কলিতে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিমত পুনঃ প্রচলন করিয়া—ভারতে তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া—শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন রাখিবার সদুপায় দেখাইয়া দিয়া শিবস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য কেদারনাথ তীর্থে বত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য বেদোক্ত চারিটী মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে চারিটী বৃহৎ মঠ স্থাপন করিলেন। পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি চারিজন প্রধান শিষ্যকে মঠের আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া প্রত্যেক মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, দেবদেবী, তীর্থ, বেদ ও মহাবাক্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাই সন্ন্যাসী মাত্রকেই নিজ নিজ মঠানুসারে তাহার এক একটী গ্রহণ করিতে হয় ও তদনুসারে পরিচয় দিতে হয়। যথাঃ—

উত্তরে জ্যোতির্ম্মঠ, ক্ষেত্র—বদরিকাশ্রম, দেব—নারায়ণ, দেবী—পুন্নাগরী, তীর্থ—অলকনন্দা, বেদ—অথর্ব্ব এবং মহাবাক্য—অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

দক্ষিণে শৃঙ্গগিরি মঠ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর, দেব—আদিবরাহ, দেবী—কামাখ্যা, তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা, বেদ—যজু এবং মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি।

পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠ, ক্ষেত্র—পুরী, দেব জগন্নাথ, দেবী—বিমলা, তীর্থ—মহোদধি, বেদ—ঋক্ এবং মহাবাক্য প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

পশ্চিমে শারদা মঠ, ক্ষেত্র—দ্বারকা, দেব সিদ্ধেশ্বর, দেবী—ভদ্রকালী, তীর্থ—গঙ্গাগোমতী, বেদ—সাম এবং মহাবাক্য তত্ত্বমসি।

এই চারিটী প্রধান মঠ ব্যতীত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রায় বারশত মঠ ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত আছে। মঠের প্রধান চারিজন আচার্য্যের মধ্যে আদ্যর বিশ্বরূপাচার্য্যের তীর্থ ও আশ্রম এই দুইটী শিষ্য, পদ্মপাদাচার্য্যের বন ও অরণ্য এই দুইটী শিষ্য, ত্রোটকাচার্য্যের গিরি, পর্ব্বত ও সাগর এই তিনটী শিষ্য এবং পৃথ্বীধরাচার্য্যের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই তিনটী শিষ্য, সমুদায়ে দশটী শিষ্য হইতে দশটী সম্প্রদায় হইয়াছে। এই দশনামা সন্ন্যাসীদিগকে আপন আপন সম্প্রদায়ানুসারে সাধন করিতে হয়। সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে, দশটী উপাধির তাৎপর্য্য আছে। যথা তীর্থ—

ত্রিবেণী সঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থ ভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গম-তীর্থে যিনি স্নান করেন তাঁহার নাম তীর্থ। আশ্রম—

আশ্রম গ্রহণে প্রৌঢ়ঃ আশাপাশ বিবর্জ্জিত।
যাতায়াত বিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রম লক্ষণং॥

যিনি আশ্রম গ্রহণে সুনিপুণ ও নিষ্কাম হইয়া জন্মমৃত্যুবিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম আশ্রম। বন—

সুরম্য নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশ বিনির্ম্মুক্ত বন নামা স উচ্যতে॥

যিনি বাসনাবর্জ্জিত হইয়া রমণীয় নির্ঝর নিকটবর্ত্তী বনে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার

নাম বন। অরণ্য—

আরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দ নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্য লক্ষণং কিল॥

যিনি আরণ্যব্রতাবলম্বী হইয়া সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আনন্দপ্রদ অরণ্যে চিরদিন বাস করেন, তাঁহার নাম অরণ্য। গিরি—

বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরা চলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥

যিনি সর্ব্বদা গিরি-নিবাস-তৎপর, গীতাভ্যাসে তৎপর, যিনি গম্ভীর ও স্থিরবুদ্ধি, তাঁহার নাম গিরি। পর্ব্বত—

বসেৎ পর্ব্বত মূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যান ধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি পর্ব্বত মূলে বাস করেন, ধ্যান-ধারণায় সুনিপুণ এবং যিনি সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহার নাম পর্ব্বত। সাগর—

বসেৎ সাগর গম্ভীরো বনরত্ন পরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘ্যেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সাগরতুল্য গম্ভীর, বনের ফলমূল মাত্র ভোগী ও যিনি নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তাঁহার নাম সাগর। সরস্বতী—

স্বরজ্ঞান বসেন্নিত্যং স্বরবাদী, কবীশ্বরঃ।
সংসার সাগরে সারাভিজ্ঞো যো হি সরস্বতী॥

যিনি স্বরতত্ত্বজ্ঞ, স্বরবাদী, কবিশ্রেষ্ঠ এবং সংসার সাগর মধ্যে সারজ্ঞানী, তাঁহার নাম সরস্বতী। ভারতী—

বিদ্যাভরণে সম্পূর্ণ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখভার অনুভব করেন না, তাঁহার নাম ভারতী। পুরী—

জ্ঞানতত্ত্বেন সংপূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণতত্ত্ব পদে অবস্থিত এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁহার নাম পুরী।

আজ তীর্থে তীর্থে, বনজঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে, গ্রাম নগরে এবং ইয়োরোপ-আমেরিকায় যে, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দেখিতেছ, তাঁহারা সকলেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অপারমহিমা বিঘোষিত করিতেছে এবং তাঁহারই অমানুষী কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, প্রথম আশ্রমত্রয়ের যথাবিধি ধর্ম্ম-পালন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিবে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্যবস্থা করিলেন, বৈরাগ্যের উদয় হইয়া উপযুক্ত হইলেই যে কোন ব্যক্তি—যে আশ্রমীই হউক না কেন একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে। তাই তাঁহার মতের উদার গর্ভে আশ্রয় লাভ করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণ তদীয় মহত্ব বিঘোষিত করিতেছেন।

এই সন্ন্যাসিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক দণ্ডী স্বামী,—দ্বিতীয় পরমহংস। প্রথম অবস্থায় মুমুক্ষু সাধক দণ্ডীস্বামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানা-লোচনা করিবেন, পরে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হইলে পরমহংস হইয়া লোক শিক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও জগদ্ধিতায় নিযুক্ত হইবে। এই সন্ন্যাসিগণ হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের গুরু। কেন না, যে বেদ-বেদান্ত ও পুরাণের মতানুসারে হিন্দুসমাজ গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে,

তাহা ভগবান্ ব্যাসদেবের রচিত ও ব্যাখ্যাত। সুতরাং ব্যাসদেব সর্ব্বসম্মত হিন্দুসমাজের গুরু। তাঁহার সন্তান ও শিষ্য শুকদেবাচার্য্য, শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য, গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ পাদাচার্য্য, গোবিন্দপাদের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য এবং শঙ্করের শিষ্যোপশিষ্য বর্ত্তমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়; সুতরাং সন্ন্যাসিগণই হিন্দু-সমাজের গুরু। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "আদ্য জগদ্গুরু" নামে ভারতে আখ্যাত। আবার এই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন মহাত্মা হইতে ভারতের আধুনিক (ব্রাহ্ম ব্যতীত) অবধূত, রামানন্দী, গোরক্ষ-নাথী, বল্লভাচারী, উদাসিন্, কবিরপন্থী, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ-মিশন প্রভৃতি যাবতীয় সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। আধুনিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আপন আপন সম্প্রদায়েরই আচার্য্য হন; কিন্তু সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্তজনগণের আচার্য্যরূপে সেবিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, রাম-কৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ অপেক্ষা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্তব্যক্তি সাধারণের হৃদয়ের এমন শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অনেক অনভিজ্ঞের ধারণা শঙ্করাচার্য্য ভক্তি-তত্ত্বের আস্বাদ পান নাই; কিন্তু যিনি, "মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী" অর্থাৎ—"মুক্তিলাভের যত প্রকার কারণ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধানতমা" বলিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তিনি ভক্তিমাহাত্ম্য অবগত নহেন, মূর্খ ভিন্ন অন্যের মুখে এ কথা শোভা পায় না। "বিবেক-চূড়ামণি" নামধেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই, অনভিজ্ঞের বিজ্ঞতা অবজ্ঞাত হইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটী প্রধান মঠর অধ্যক্ষ বা মহন্তগণ বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

———:0:———

প্রেমে-সমাধি।

———:0:———

ভূমিকা।

———:0:———

প্রেম ভগবানের স্বরূপ;—প্রেম স্বর্গের জিনিষ। সেই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন কথা। সেই প্রেমে মজিলে,- তাহাতে তন্ময় হইলে, সংসার সুখের আগার,—সংসার নন্দনকানন। প্রেমের উৎস ভগবানের বহির্ব্বাটী। সেই উৎস ধরিয়া থাকিলে, সেই উৎসে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া গা' ঢালিয়া দিলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা বড় সহজ। ভক্তির উন্নত অবস্থাই প্রেম। একে ভক্তি লাভ করাই সুকঠিন, প্রেম লাভ করা তো আরও। তবে কি সে প্রেম সংসারে কেউ লাভ করে না? করে বৈ কি।

তাঁহার ইচ্ছায় সব হয়। যাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় জগৎ সংসারের সকল হইয়াছে; আমি হইয়াছি, তুমি হইয়াছ; তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে, মানুষ প্রেমে পাগল হইয়া আপনা ভুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইবে; ভাবে বিভোর হইয়া ক্ষণে হাসিবে, ক্ষণে নাচিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যের ফলে,—বহু তপস্যার বলে প্রেম লাভ হয়। মানুষ ভগবানের সেই আশীর্ব্বাদ,—সেই প্রেম-হেম-হার মাথায় করিয়া জগন্ময় ঘুড়িয়া বেড়াইয়া কৃতার্থ হয়।

সেই প্রেম-মগ্ন প্রেমিকেরও সংসারে আসিলে অনেক কষ্ট সহিতে হয়; অনেক লাঞ্ছনা, অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। কুলোকের হাতে পড়িয়া পবিত্র প্রেমও অনেক সহ্য করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর নব আলোকে উদ্ভাসিত যুবকগণ প্রেমকে অপবিত্র ভাবে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে অতি নিন্দনীয় ভাবে, হাস্যরসের কথায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহা ভগবানের স্বরূপ বলিয়া আখ্যাত হয়; যাহা প্রত্যেক অবতারের অঙ্গের ভূষণ, হৃদয়ের ধন; যে প্রেম জগতে অতুলনীয়, মহামূল্য, সেই প্রেম কি ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যবহার করা যায়? কত সহস্র সহস্র লোক একবিন্দু প্রেমের আশায় মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া থাকেন;—সেই গোপীর মধুর ভাবের জন্য চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কলির অবতারগণ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন;—সেই গোপীভাব—ভুবনে এক অপূর্ব্ব প্রেমের বিচিত্র সমাবেশ, আজ বিংশ শতাব্দীতে কি অশ্লীল কুরুচি পূর্ণ হইল? হউক, ক্ষতি নাই। তাহাতে প্রেমের কি হইবে? যাহা প্রেম তাহা প্রেমই। প্রেমের ইতর বিশেষ নাই; নিজের কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। যিনি যত উন্নত তিনি প্রেমকে তত উন্নত অঙ্গের বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রেম যে কত উচ্চ অঙ্গের এপর্য্যন্ত তাহার কেহ সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সাগর মাপিতে গিয়া লবণের পুতুলের যে দুর্দ্দশা হয়, প্রেমের জগতেও তাই। এ সাগরে যিনি ডুবিয়াছেন তিনি আর উঠিতে পারেন নাই। প্রেমে চিরজীবনেরতরে সমাধি লাভ করিয়াছেন।

আমি সেই প্রেমের লুকায়িত অঙ্কুর, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সোপানে উঠাইয়া মহা-প্রেম-সাগরে ডুবাইতে চলিয়াছি। পাঠকগণ, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

—0—

প্রথম খণ্ড।

—:0:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:0:—

ঘোর অন্ধকার,—অন্ধকার অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়াছে। আঁধারের উপর আঁধার আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। সে গুরু-প্রচাপন সহ্য করিতে না পারিয়া, অন্ধকার মুখ কালো

করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া পলায়নে তৎপর হইয়াছে। যেখানে আলো দেখিয়াছে সেইখানে ছুটিয়া গিয়াছে; যেখানে আনন্দ দেখিয়াছে সেইখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; যেখানে সুখের অমৃত-তরঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়াছে, সেইখানেই পাদস্পর্শ করিয়াছে। তাহার নিবিড় চুম্বনে কালো হইয়া সুখ দূরে গিয়াছে, দুঃখ আসিয়াছে, আলো দূরে গিয়াছে, আঁধার আসিয়াছে। আঁধার আঁধারকে আনিয়াছে।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল। জগৎ নিস্তব্ধ জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। জগতের সেই শান্ত শীতলতার মধ্যে কেবল প্রকৃতির অব্যক্ত ঝঙ্কার,—সেই ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। একটী দ্বিতল গৃহ; উপর তলের এক প্রকোষ্ঠে এক যুবক বিনিদ্র ; মুখে প্রশান্তির ছায়া পড়িয়া মূর্ত্তি বড় মধুময় করিয়াছে। এমন মধুর সুষুপ্তির অবস্থায় যুবক স্বপ্নে দেখিতেছে, সে যেন কোথায় চলিয়াছে; চলিতে চলিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে, তবুও যেন পথ ফুরায় না। দুইদিকে সমুন্নত পর্ব্বতমালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনন্তের সঙ্গে মিশিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্তরের পর স্তর তাহার পর আবার স্তর; স্তরে স্তরে মিশামিশি করিয়া অনন্ত আকাশের কোন্ প্রদেশে যেন মিশিয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে অতুল বনরাজিকান্তি, মধ্যপ্রদেশে বিচিত্র বর্ণের লম্বমান প্রস্তরখণ্ড সমূহ, আর শিখরদেশে অমল ধবল তুষার-স্তূপ, ঊষার স্বর্ণ কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া কষিতকাঞ্চননির্ম্মিত কিরীটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যুবক পদব্রজে চলিয়াছে। বিচিত্রবর্ণের বিহগ-কাকলী-মুখরিত পর্ব্বতের এক বনান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়া যুবক সম্মুখে দেখিল এক সুরম্য প্রাসাদ। চরণের গতিরোধ হইল, কেন যেন যুবকের মনে হইল এইখানেই তাহার ভ্রমনের অবসান। সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল এক ভয়ঙ্কর সর্প বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইয়াছে। ফণীর মাথায় এক অত্যুজ্জ্বল মণি। সে মণির প্রভা ভাস্কর-রশ্মিকেও পরাস্ত মানাইয়াছে। হেলিয়া হেলিয়া, দুলিয়া দুলিয়া সেই ভয়ানক সর্প যুবকের নিকটে আসিতেই সে ভীত-কাতর হইয়া যেই চীৎকার করিতে যাইবে, অমনি কে যেন তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। যুবক চাহিয়া দেখিল আর সে সর্প নাই, পশ্চাতে ফিরিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইল না। গৃহের সম্মুখের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেই পবিত্র স্বর্গীয় গন্ধে নাসিকা পূর্ণ হইয়া উঠিল,—প্রাণে বিমল শান্তি আসিল। সে সম্মুখে চাহিয়াই দেখিল এক প্রকাণ্ড জ্যোতিতে গৃহখানি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; সে জ্যোতিতে নয়ন ধাঁধিয়া গেল। আবার চাহিতেই দেখিতে পাইল,—এক দিব্যমূর্ত্তি। দীর্ঘজটাভার মস্তক ছাড়িয়া স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, অঙ্গ বিভূতি ভূষিত, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আসীন, আর পদতলে দিব্য জ্যোতিসম্পন্না, অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ী এক দেবীমূর্ত্তি। তিনি যুবকের দিকে চাহিয়া মিটমিটি হাসিতেছেন। যুবক অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। যুবক আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—'আমার স্ত্রী;—তুমি আমার আমার স্ত্রী; তুমি এখানে? তুমি কবে এখানে আসিলে? চল আমরা

বাড়ী যাই, আর এখানে থাকিও না; তুমি আমায় ছাড়িয়া থাকিলে আমি কাহাকে লইয়া ঘর করিব? এই বলিয়া যুবক উন্মত্তের মত সেই দেবী মূর্ত্তিকে ধরিতে যাইবে, অমনি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার! আর নিদ্রা হইল না; যুবক শয্যায় উঠিয়া বসিল। মনে কেবল এই এক চিন্তা—কি দেখিলাম?

যুবক পরলোক বিশ্বাস করে না। পরলোকে আদৌ আস্থা নাই। তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস এই জন্মই শেষ; আর জন্ম হইতে পারে না। এই জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা প্রভৃতি যত কিছু আছে, সকলেই মহাসমাধি হইয়া যায়। ভৌতিকদেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যায় অবশেষ কিছুই থাকে না। আমরা যাহাকে আত্মা বলি সে তাহাকে প্রকৃতির একটা বিশেষ শক্তি বলিয়া স্বীকার করে; এবং তাহার ধারণা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিও প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং পরলোক বা জন্মান্তর সে আদৌ মানিতে চাহে না।

সেই যুবকই আজ এই স্বপ্ন দেখিয়া মনে করিতেছে, কি দেখিলাম। কোথায় গেলাম, আর কেনই বা গেলাম, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না। লোকে বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে পারে না। যুবকও পারিল না। আবার ঘুমে চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার বোধ হইল যেন সম্মুখের দেয়াল নাই।—কেবল শূন্য; যেন সে বহুদূর দেখিতেছে। দেয়ালের পরপৃষ্ঠের গাছপালাও ঠিক ঠিক তাহার নয়নগোচর হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া যুবক চাহিতেই আবার দেখিতে পাইল, বহুদূরে যেন একটী ক্ষুদ্র জ্যোতি। জ্যোতিটী ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর,—উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। যুবকের নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত দূরে আসিয়া একেবারে থামিয়া গেল। সে আলোতে আঁধার দূরে গেল। যুবক পলকবিহীন হইয়া সেই জ্যোতিটী দেখিতে লাগিল।—দেখিতে পাইল সেই সুবৃহৎ জ্যোতিটী কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার ভিতর হইতে এক প্রোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি প্রসব করিল। মূর্ত্তি স্থিরনেত্রে যুবকের দিকে চাহিতেই তাহার মন হইল,—পরলোক আছে,—মানুষ মরিলে নিশ্চয়ই পরলোকে যাইবে, আত্মার বিনাশ নাই,—জন্মান্তর ধ্রুব সত্য। পলক ফেলিতে ফেলিতেই সেই জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া হাসিয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে যুবক অস্ফুট চীৎকার করিয়া শয্যায় পড়িয়া গেল। বস্তুতঃ, এ তাহার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তী।

ক্রমশঃ।

শ্রীপীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—০—

অনন্তশয্যায় নারায়ণ।

:0:

মরি কি মধুর রূপ ভুবন মোহন,
অনন্ত সাগর কোলে, অনন্ত লহরী খেলে,
অনন্ত-শয়নে হরি নীরদ বরণ!

দশ দিশি করি আলো রূপের আভায়
ভুবন মোহিনী রমা, মরি মরি কি সুষমা,
সেবিছেন বিভুপদ সপি মন কায়!

সাগরও হয়েছে যেন ভাবেতে তন্ময়
নারায়ণে বুকে ধরে, কি যেন কি মনে করে,
সিন্ধু বুকে বহে ভাব-তরঙ্গ-নিচয়!

আকুল পরাণে নিয়া ঊর্ম্মি উপহার—
দুর হতে সসম্ভ্রমে, আসি সিন্ধু যায় নমে,
কত ভাব খেলে আজি হৃদয়ে তাহার!

নাভিপদ্মে পদ্মযোনি করি আরোহণ
চারি বেদ নিয়ে হাতে,—পুলক পুরিত চিতে—
করিছেন স্তুতি তার সৃষ্টির কারণ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে,
মণিময় হার গলে, কৌস্তভ রতন দোলে,
বাসুকী ধরেছে ফণা মস্তক উপরে!

হেরি এ বিরাট রূপ ভুবন মোহন
মনে হয় দিবা নিশি, ও চরণে থাকি মিশি
সংসার-ভাবনা স্রোতে নাহি দিয়ে মন।

জগতের পালয়িতা তুমি নারায়ণ,
এই বিশ্ব চরাচর, সুখে থাক নিরন্তর
ইহাই অনন্তমনে করিছ চিন্তন।

বাধা বিঘ্ন ঊর্ম্মিরাশি ঠেলিয়া চরণে
জগতেরে শান্তি দিতে, চরাচরে বাঁচাইতে
ভাসিয়াছ নারায়ণ অনন্ত-শয়নে।

জীবের মঙ্গল নিত্য কামনা তোমার,
এক মুখে তব স্তব, কি করিব হে মাধব,
সবারি অন্তরে তুমি আছ সারাৎসার।

জগতের পালয়িতা, নমি তব পদে
অন্তিমে চরণে তব, স্থান যেন পাই দেব,
তোমায় ভুলি না যেন বিপদে সম্পদে।

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

:0:

সুখ-তত্ত্ব।

কি চায়?

এই সমন্তাৎ পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বে মানব জন্মগ্রহণ করিয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ ভেদে নিয়তই যেন কি প্রয়োজন সাধনের জন্য ফিরিতেছে। শুধু মানুষ কেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জড় ও চেতন রাজ্যের জীব মাত্রেই, অর্থাৎ একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতি রাজ্যের অত্যুন্নত প্রাণী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই যেন কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যগ্র। জীবের প্রাণ যেন কি এক মহান্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। মানুষ কত জিনিষ

লইয়া টানাটানি করিতেছে, কত জিনিষে তার সেই হারাপ্রাণের হারানিধিকে অন্বেষণ করিতে করিতে হয়রাণ হইতেছে। তাই ভাবিতে গেলে সর্ব্বদাই যেন আমাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, যে "মানুষ কি চায়"? শাস্ত্রকারগণ বারংবার বলিয়াছেন যে—

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"

অর্থাৎ লক্ষ্যহীন হইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। তবে জ্ঞান-রাজ্যে কত উন্নত ধীর ধীষণাসম্পন্ন মানব যে অহোরাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, তাহাতেও বা কোন সুমহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়া কিরূপ ভাবে বলিতে সাহস করিব? অতএব দেখিতে হইবে যে, কোন মহাশক্তি মানবকে এইরূপ ভাবে "সুত্রে মণিগণাইব" কর্ম্মসুত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

সুখেচ্ছাই জীবের প্রেরক।

আমরা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যে, একমাত্র চির অতৃপ্ত সুখ-পিপাসাই মানবের সকল কর্ম্মের,—সকল সাধনার—সকল পাপের,—সকল পুণ্যের, সকল ধর্ম্মের,—সকল অধর্ম্মের—এক কথায়—সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির মূল। শাস্ত্রকারগণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

"সুখার্থং খলু ভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তিতাঃ"।

জীবের সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির মূলেই একমাত্র সুখের কামনা ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত আছে। জীবের অতৃপ্ত সুখা-কাঙ্ক্ষাই ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে নররক্তের নদী প্রবাহিত করে, মানুষ অতৃপ্ত সুখাভিলাষে প্রণোদিত হইয়াই কঠিন পাষাণ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হইয়া রাক্ষসবেশে তীক্ষ্ণধার কৃপাণ ভ্রাতৃবক্ষে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। আবার অন্যদিকে ঐ যে শিক্ষিত সভ্য, জগতে পূজ্য, ধনী, মানী এক দেব-মূর্ত্তি স্বীয় সকল ধন-সম্পদ, বিলাস-ভোগ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নীচ, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্যজাতীয় কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত, বদাকার পাপীকে কোলে করিয়া তার রোগ-বেদনায়,—পাপের তাড়নায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার সেবায় আত্ম-বিস্মৃত; নিজের দুঃখের প্রতি দৃকপাত না করিয়া অনবরত আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার মূলেও সেই—চির-অতৃপ্ত সুখের বাসনা। ঐ যে মানুষের বাণিজ্যতরী, রণতরী প্রবল ঝটিকা, ভীম ঊর্ম্মিমালা অগ্রাহ্য করিয়া সমুদ্র বক্ষে 'ধনং দেহি, ধনং দেহি,' রবে ধাবিত হইতেছে, ঐ যে মানুষ যেখানে অঙ্গারক-বাষ্প-রাশির বিস্ফোরণে যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব ধ্বংশ হইতে পারে, সেই ভূগর্ভস্থ খনির গাঢ়-তমিস্রার মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্যের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, সেই খানেও মানবের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত সুখাভিলাষই প্রবর্ত্তক। আর ঐ যে একজন রাজার ছেলে, অমন সুবর্ণ-ময়ী পুরী, অমন রূপ-লাবণ্য-গুণবতী সহ-ধর্ম্মিনী, অত বিলাস-ভোগ, অত যান বাহন, অত মণি-মাণিক্য, অমন দুগ্ধ-ঘৃত-নবনীতপুষ্ট-নধর শিশু, আদি সব বিসর্জ্জন দিয়া গৈরিকবেশে গহন কাননের দিকে ছুটিতেছে, উহার প্রাণও সেই একই গভীর সুখ পিপাসায় আকুল। প্রকৃতি রাজ্যে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইব যে, একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা অহর্নিশ আহারান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও সুখের জন্য। এইরূপে আমরা জীবের সমস্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তির মূলেই সুখ বা আনন্দ-

লাভের বাসনা বিদ্যমান আছে দেখিতে পাই।

তবে এখন দেখিতে হইবে জীব মাত্রেরই এইরূপ সুখ-লালসা হয় কেন? জীব জগতের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও আরও চাই, আরও চাই, বলিয়া সুখের জন্য এত পিপাসিত কেন? আমরা একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, বাস্তবিক জীবের স্বরূপই সুখ বা আনন্দ; জীবের উৎপত্তি সুখ হইতে, জীব সুখে সুখে পরিপূর্ণ। সুতরাং জীবের সর্ব্বতোভাবে সুখ প্রবৃত্তিই হইবে; জীব নিজের নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে চাহিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

সুখ জীবের স্বরূপ। সুতরাং সুখের প্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। সুখ-স্বরূপ।

তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সুখ কি? এবং উহা কি প্রকারে জীবের স্বরূপ হইতে পারে? তাহার জন্যই বা সকলে লালায়িত কেন? বেদ জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন যে, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ, শ্রুতিও বলিয়াছেন "আকাশ আনন্দঃ, আনন্দ রূপং পরমং যদ্বিভাতি"। দৈবী মীমাংসা দর্শনও বলিয়াছেন যে, "রস রূপঃ পরমাত্মা", অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই রস বা আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন," অস্তি, ভাতি প্রিয়, (১) হ্লাদিনী সন্ধিনী, সম্বিৎ (২) সত্তা চিত্তি সুখ ক্ষেতি" (৩) ইত্যাদি ব্রহ্মের আনন্দরূপ প্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতি-বচন যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই সুখরূপ বা রস-রূপ

এই আনন্দরূপ কারণ ব্রহ্মই কার্য্য ব্রহ্মরূপে চির-বিবর্ত্তিত। সুতরাং ব্রহ্ম বা আনন্দসত্তা সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছে। কেন না অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী, তদীয় ইচ্ছারূপিনী মহামায়ার লীলা-বশে আনন্দস্বরূপ তিনি কার্য্যব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত। অতএব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" (৪) ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে ও "বাসুদেবঃ সর্ব্ব মিত্যাদি গীতোক্ত বচন দ্বারা ব্রহ্মের বিশ্ব-সৃষ্টি-কার্য্যে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণতা বিষয়ে প্রামাণিকতা কেন হইবে না? শ্রুত্যুক্ত "তজ্জলান্" এই শব্দের বর্ণভেদে অর্থগত সংযম করিলে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে যে, উহার মধ্যে ব্রহ্মের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিত্ব গূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। "তজ্জ", "তল্ল" ও "তদন্" এই তিনটি শব্দ একত্র সংমিশ্রিত হইয়া "তজ্জলান" এই বৈদিক প্রয়োগ হইয়াছে। "ততো জায়তে" ইতি তজ্জ,—অর্থাৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়; "তত্রৈব লীয়তে ইতি "তল্ল" অর্থাৎ তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়; এবং "তত অনীতি" অর্থাৎ তাঁহা দ্বারাই স্থিতি হয়। এই জন্যই শ্রুতি মধুর নিনাদে গাহিয়াছেন—

ব্রহ্ম বা আনন্দ-সত্তা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

"আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্য-"

(১) সরস্বতী রহস্যোপনিষদ্। (২) বিষ্ণু পুরাণ। (৩) পঞ্চদশী। (৪) ছান্দোগ্যোপনিষদ।

ভিসংবিশন্তীতি" * (১) অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এসমস্ত ভূতজাতের উৎপত্তি, আনন্দের দ্বারাই স্থিতি এবং শেষে আনন্দেতেই বিলীন হয়।

ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ, জগৎ তাঁহার বিবর্ত্ত এই কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মের আনন্দসত্তা সর্ব্বত্র বিরাজিত ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জগতের সর্ব্বত্রই আনন্দ সমভাবে প্রবাহিত হয় না কেন? আনন্দরূপ-ব্রহ্মের আকাশ-শরীর তমোময় দুঃখ-রূপ জলদ-জালে সমাচ্ছন্ন হয় কেন? প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে ব্রহ্মানন্দসত্তা অনুস্যূত থাকিলেও,-সে অনুস্যূতির তারতম্য না থাকিলেও,-সেই আনন্দ-ধারার গতি-বিরাম না থাকিলেও,—সেই আনন্দ-স্রোতস্বিনী সর্ব্বত্র সম-গভীরা হইলেও, ব্যষ্টি-সমষ্টি সৃষ্টি আনন্দ বিকাশের তারতম্য নয়নপথের পথিক করা কেন! এই সকল গভীর বিষয়ের উপর সংযম করিলে দেখিতে পাওয়া যায়

গুণত্রয়াভিব্যক্তির তারতম্যই আনন্দ-তারতম্যের কারণ।

যে, সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী প্রকৃতির অনভিব্যক্তি ও অভিব্যক্তি এবং অভিব্যক্তির মধ্যেও গুণ-ত্রয় বিকাশের তারতম্যই উল্লিখিত আনন্দ তটিনীর গভীরতার পরিমাপক। যেখানে প্রকৃতির অভিব্যক্তি নাই;—যেখানে তদীয় ইচ্ছারূপিণী মহামায়া ইচ্ছাময়েরই সুকোমল অঙ্কে কত শত কালব্যাপিনী, গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা,—যে খানে তাঁহার গুণ-বিলাস, বৈষম্য-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরম সাম্য ভজনা করিতেছে এবং চিরশান্তি-সদনে বিশ্রাম লাভ করিতেছে—(এক কথায় অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা)—তথায় আনন্দের পূর্ণ বিকাশ। প্রকৃতি পারাবার পারংগত, নির্ব্বিকল্প-সমাধি পদারূঢ় রাজ-যোগী এই জন্যই অনন্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। কেন না তাঁহার প্রকৃতি পরা প্রকৃতিতে মিশিয়াছে; তাঁহার সত্তা বিরাটের অনন্ত সত্তায় বিলীন হইয়াছে, তাঁহার প্রাণ বিশ্ব প্রাণ, বিশ্বপ্রাণের সহিত একীভূত হইয়াছে, তাঁহার অন্তঃকরণ সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে, সুতরাং জ্ঞান ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত সেই যোগীর পক্ষে এতাদৃশ আনন্দলাভ সুকর হইতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য,—প্রকৃতির অভিব্যক্তির মধ্যে গুণ-বিকাশের তারতম্য,—সেখানে আনন্দ-সত্তা-বিকাশেরও তারতম্য হইবে, সন্দেহ নাই।

আনন্দসত্তা স্বয়ং প্রকাশিত হইলেও গুণত্রয়ে আবৃত।

আনন্দ স্বত্তাও স্বয়ংই প্রকাশিত, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পৃথক পুরুষার্থের আবশ্যকতা হয় না। তবে প্রকাশরোধক আবরণ মুক্ত করিয়া দিলেই তিনিও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন। ভগবান্ পতঞ্জলি-দেব বলিয়াছেন "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণ-ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" * অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন-ক্ষেত্র-বিপ্লাবন বিষয়ে সলিল-সঞ্চালন-হেতুভূত ক্ষেত্রস্বামীর চেষ্টা যেরূপ নিমিত্তমাত্রই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সলিলপ্রবাহের অন্তরায়-সমূহ নিরাকৃত করিয়া দিলে যেমন সলিল স্বয়ং ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া ক্ষেত্রাভিপ্লাবন করিয়া থাকে, সেইরূপ চাঞ্চল্য-বহুল-প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত

*(১) তৈত্তিরীয়োপনিষদ।

* যোগদর্শনের কৈবল্য পাদীয় ৩য় সংখ্যক সূত্র।

করিয়া দিলেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা দৃগ্‌গোচর হইয়া থাকেন।

এতদ্বারা প্রতীত হইল যে ব্রহ্মানন্দসত্তা জগদ্ব্যাপিনী হইলেও, আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতে তাঁহার পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মিকা সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী প্রকৃতির গুণ-বিকাশের তারতম্য হেতু আনন্দ-বিকাশেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের ক্রম প্রাধান্য অনুসারে অর্থাৎ যে পদার্থে সত্ত্বের প্রাবল্য তথায় রজ এবং তমঃ অপেক্ষা আনন্দসত্তা-স্ফুর্ত্তির আধিক্য থাকে। এই রূপে রজ এবং তমো গুণের মধ্যেও তমঃ অপেক্ষা রজো গুণের আনন্দাভিব্যঞ্জক-শক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থিত হইয়া আমরা যদি জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে কি দেখিতে পাই? দেখি তথায় কেবল ব্রহ্মের সত্তামাত্রই বিকশিত। উপলখণ্ডে আনন্দের বিদ্যমানতা কোথায়? চিৎ-সত্তার শুভ্র-জ্যোতিঃ শিলাখণ্ডকে তো উদ্ভাসিত করিতে দেখা যায় না; কেন না সেখানে যে তমোময়ী প্রকৃতি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। রজঃ-সত্ত্ব-সৌদামিনী যে তথায় ঘোর তমোমেঘে সমাচ্ছন্ন। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরে দ্বয়ং"।

অর্থাৎ জড়রাজ্যের অন্তর্গত মৃত্তিকা ও শিলাখণ্ড প্রভৃতিতে কেবল ব্রহ্মের ভাবত্রয়ের মধ্যে সদ্ভাবেরই বিদ্যমানতা, চিৎ ও আনন্দ-সত্তার বিকাশ তথায় নাই; (আর থাকিলেও অতিসূক্ষ্ম ও অভিভূতভাবে আছে)। এই ত গেল জড় জগতের কথা। ক্রমশঃ এই জড়-জগৎ হইতে চেতন জগতে আসিয়া আমরা কি দেখিতে পাই তাহা বারান্তরে বক্তব্য। এখন বিদায় হই।

মহোপদেশক শ্রীচন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ।
শ্রীমহামণ্ডল, ৺কাশীধাম।

———:0:———

সাধক সঙ্গীত।

[১]

মনরে মিছে কেন কর কালের অপমান।
বিধির আদেশে,　　কৃতান্তের বেশে,
সে যে সংসার সংহার-যজ্ঞে হয়েছে রে যজমান॥
এ যজ্ঞের এই রীতি,　　বার, যোগ, নক্ষত্র, তিথি,
কালাকাল, শুদ্ধাশুদ্ধের নাই বিধান;
হাহাকার ক্রিয়ার অঙ্গ,　　নাই তাতে মুহূর্ত্ত ভঙ্গ,

মুহুর্ম্মুহু হতেছেরে অনুষ্ঠান;—
বায়ু বিলোম-প্রকারে করে পৌরহিত্য সমাধান ॥
ভূমি জলাশয় মাত্র, প্রণীতা প্রক্ষণী পাত্র,
কাষ্ঠ, রজ্জু সে যজ্ঞের উপাদান;
পূর্ব্বাপর আছে ক্রম, শ্মশান স্থণ্ডিলে হোম,
নিয়তি অনল অতি বেগবান্;—
হ'চ্ছে—আধিব্যাধি ঘৃত-যোগে জীবনের আহুতি দা'ন ॥
(ও মন) কি কব অধিক আর, তপ্ত পিণ্ড চরু তার,
বিবেক ঔদাস্য ব্রহ্মা বর্ত্তমান;
দশদিক্ সদস্য তথা, রুদ্র আছেন নিত্য হোতা,
দেবতা ক্রব্যাদ্‌গণের অধিষ্ঠান;—
ও তার উদ্গাতা শ্মশান বন্ধু, হরিধ্বনি সামগান ॥
শৃগাল কুকুর পাল, নিমন্ত্রিত চিরকাল,
গৃধিনী শকুনী রবাহুত প্রধান;
গোবিন্দ কয় অবোধ মন, ভুলনারে রেখ স্মরণ,
এ যজ্ঞের দক্ষিণা— রূপের অন্তর্ধান;—
শেষে পরিজনের নয়ন জলে বিধান অবভৃথ্ স্নান ॥

উপদেশ-সংগ্রহ।

১। মুক্তাবস্থা জীবের স্বাভাবিক, ইহা লাভ করা বড় আয়াসসাধ্য নহে; শুধু গুরু বাক্যে বিশ্বাস—গুরুতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবে—সে জীবন্মুক্ত।

২। সেতার, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের একটী তার বেঠিক থাকিলে তাহা হইতে উত্থিত ধ্বনি, চিত্ত-বিনোদক না হইয়া বরং বিরক্তি-করই হইয়া থাকে; সেইরূপ যে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত সভ্যগণ যদি এক প্রাণে এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে না পারে তবে তাহা-দিগদ্বারা দেশের—দশের—সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের নিজেদেরই পতন অবশ্যম্ভাবী।

৩। সেবক হওয়া খেলার কথা নয়, এ জগতে একমাত্র ভগবানই সেবকের আদর্শ; সুতরাং সেবকত্ব লাভ করিতে হইলে মান, অপমান, হিংসা, দ্বেষ আদি, আত্মীয়স্বগণ,

এমন কি, আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

৪। কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া আর কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করিও না; কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বিচার করা উচিত; তাই কথায় বলে, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

(ক্রমশঃ।)

---:0:---

দ্বিজ রামপ্রসাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমরা এক্ষণে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম। সাধারণতঃ প্রসাদী গানে প্রসাদ, রামপ্রসাদ, প্রসাদ দীন, দ্বিজ রামপ্রসাদ, দীন রামপ্রসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ, কবি রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদ দাস, রামপ্রসাদ কবি, ভীবকপ্রসাদ প্রভৃতি নামের ভণিতা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসাদ দীন, দীন রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতার গানগুলি দ্বিজ রামপ্রসাদের এবং অন্যান্য ভণিতার গানগুলি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিরচিত। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ও অপরাপর কতিপয় ব্যক্তিও দ্বিজ ভণিতা দিয়া কয়েকটী গান রচনা করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া গানগুলি লোকমুখে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বিকৃতও হইয়া গিয়াছে। অতএব প্রচলিত প্রসাদী গানগুলির মধ্যে কোন্‌টী কাহার রচিত, এবিষয়ের প্রভেদ নির্ণয় অসাধ্য না হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

যে সকল গান সরস ও সরল, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় পরিব্যক্ত,—ভাষায় কঠোরতা নাই,—শুনিবামাত্র সকলেরই বোধগম্য হয়, এবম্বিধ গানগুলিই দ্বিজ রামপ্রসাদের বিরচিত। জীবনের ঘটনাবলী দ্বারাই লৌকিক বৃত্তান্ত সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট হয়। নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে পরম রমণীয় বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইলেও যেমন তদীয় রূপমাধুরী কাহারও নয়নগোচর হয় না, কেবল মৃদু সঞ্চালিত গন্ধবহ সুগন্ধ বহন করিয়া পুষ্পের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়; তদ্রূপ পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব তদ্বিরচিত গীতাবলীই প্রকাশ করিতেছে। ভাবুকের অন্তঃস্থলভেদী সরস ও সরল ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা হৃদয় আকুল হয়, এই ব্যাকুলতাই গান সৃষ্টির মূলীভূত কারণ; একটু অনুধাবন করিলে দ্বিজ রামপ্রসাদের গানগুলি ও প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সত্যতা প্রতিপাদন করিবে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের শিশুকালেই মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় পিসীর যত্নে লালিত-পালিত হন। এই পিসীই সংসার-বিতরাগ রামপ্রসাদকে সংসারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পিসীর নাম ছিল কুমুদিনী দেব্যা। রাজসাহী জেলার আটগ্রামে রামপ্রসাদের জন্ম হয়। ইহাঁরা তিনটী সহোদর; জ্যেষ্ঠ—ভবানীপ্রসাদ, মধ্যম—রামপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ—গোপাল। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণকালে ইহাঁরা তিন সহোদরই নিমন্ত্রিত হন। ইহাঁদের পিতা হরিদেব রায় তিনটী পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাণী ভবানীর সভাস্থলে লইয়া যান। দেশ দেশান্তর হইতে

সমাগত ব্রাহ্মণবালকগণের মধ্যে রাণী ভবানী রামপ্রসাদের কনিষ্ঠ গোপালকে পুত্ররূপে মনোনীত করিলেন।* ভবানীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

আকাঙ্ক্ষিত রাজ্য অপরের করতলগত হওয়ায় রামপ্রসাদ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল; কিন্তু তিনি অভিমানে মহারাজ রামকৃষ্ণের অন্নে প্রতিপালিতহইতে স্বীকৃত হইলেন না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গমন করিলেন। দারিদ্রতায় নিষ্পেষণে এবং পরশ্রীকাতরতায় তাঁহার শান্তি-সুখ বিনষ্ট হইল। এই সময় হইতেই তিনি সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন।

তিনি সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সংসার অসার, মায়াময় ও অনিত্য,—ত্রিতাপনাশিনী, কালভয়বারিনী ব্রহ্মময়ী কালীর চরণ ব্যতীত জীবের উপায় নাই। তিনি কালী নামে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন আসিল—মায়ের নামে মাতোয়ারা হইলেন। রামপ্রসাদের যথা-সময়ে বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সংসারা-বদ্ধ হইলেও মায়াতীত মহাপুরুষের ন্যায় হই-লেন। ফণী যেমন আহারান্বেষণে নিযুক্ত থাকিয়াও আপন মস্তকমণি সন্তর্পণে রক্ষাকরতঃ সতত সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সহস্র সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও তিলার্দ্ধ কালের জন্যও রামপ্রসাদ ইষ্টচিন্তা বিস্মৃত হইতেন না। কালীগুণানুকীর্ত্তনই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র। তিনি সর্ব্বদা কালীনামগানেই মত্ত থাকিতেন। সময় সময় ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া সংসার কালীময় দেখিতেন,—কালীর সঙ্গে কথা কহিতেন। এজন্য সাধারণের চক্ষে তিনি পাগল বলিয়া গণ্য হইলেন। রাম-প্রসাদ ভক্তিকেই মুক্তির মূল বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বাণমুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, সেব্য-সেবক ভাবই ভাল বাসিতেন।

কিছু দিন পরে জগন্মাতা কৃপা করিয়া রাম-প্রসাদের সামান্য সংসার-বন্ধনটুকুও ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রটী ও সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রামপ্রসাদ—"কালী সব ঘুচালি লেঠা" বলিয়া নিরানন্দ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এতদিনে তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া গাহিলেন,—

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশি।
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে তোর কোলে যাব না।

রামপ্রসাদ সাংসারিক সকল সম্বন্ধ পরি-ত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন; এবং কামাখ্যা-পীঠে উপনীত হইয়া কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। যথাসময়ে তিনি দৈববাণী শুনিলেন; "বৎস! ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কোন শ্মশানভূমে তুমি সশক্তি সিদ্ধি-লাভ করিবে। আমিই তোমার পথ প্রদর্শক। তুমি যদৃচ্ছা গমন কর, সতত শূন্যোপরি আমার নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইবে। কিন্তু সাবধান! ঊর্দ্ধদিকে কিম্বা পশ্চাতে দৃষ্টি করিও না।"

দৈবাদেশে প্রাপ্ত মাত্রেই রামপ্রসাদ ঊর্দ্ধ-

* গোপালই পোষ্যপুত্র হইয়া মহারাজা রামকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হ'ন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ লাহিড়ী মহাশয় হইতে এ বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইল।

দেশে নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কাজেই কৃতকার্য্যে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামাখ্যাধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাস্থানে ভ্রমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি চীনীশপুর গ্রামে উপনীত হইলেন। এই সময়ে সহসা নূপুরধ্বনি শ্রুত না হওয়ায় চমকিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অন্যমনস্কে বসিবার কালে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিলেন। অমনি পুনরায় দৈববাণী হইল ;— "বৎস! তুমি আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, কাজেই আমি এই থানে রহিলাম। এই তোমার সাধনা ক্ষেত্র। অদ্যাবধি তুমি বাক্‌-সিদ্ধ এবং আবশ্যকানুসারে আবার আদেশ প্রাপ্ত হইবে। এই থানেই তুমি আমার দর্শন লাভ করিবে।"

মা এইখানেই রহিলেন, এই আমার সাধনাক্ষেত্র, এই স্থান কোনমতেই পরিত্যজ্য নহে ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া রামপ্রসাদ সন্নিহিত একটী বটবৃক্ষের মূলে আসন স্থাপন করতঃ দেবীদর্শন আকাঙ্ক্ষায় লোলুপ হইয়া হৃষ্টচিত্তে কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

রামপ্রসাদ দক্ষিণাকালীর উপাসক ছিলেন; তিনি দেবীর আদেশে চীন ক্রমে অর্থাৎ— তন্ত্রের বীরাচার প্রণালীতে মায়ের সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় শক্তির প্রয়োজন; তিনি কলি-ধর্ম্মসম্মত স্বীয় ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত সাধনা করিবেন স্থির করিয়া সন্নিহিত টেঙ্গরীপাড়া গ্রামের জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রামপ্রসাদ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার যে উদ্দেশ্যে বিবাহ করা, তাহাতে সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন ছিল না।'

যাহাহউক যথাকালে তিনি দেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে এতদ্দেশে কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি নিম্নে বিবৃত হইল।

১। জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী যৌবনকালে দারিদ্রতা-নিবন্ধন সংসার ত্যাগ করিয়া নানা-স্থানে ভ্রমন করিয়া বেড়ান; তিনি একদা এক শ্বাপদ-সঙ্কুল পর্ব্বতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, তদীয় বামপার্শ্বে সারি সারি তিনি খানি আসন— শূন্যাবস্থায় পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসী ধ্যান-মগ্ন—স্তিমিত নয়ন, তপ্তকাঞ্চন কান্তি; জয়-নারায়ণ প্রণত হইয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যোগী চক্ষুরুন্মিলন করিলেন; সম্মুখে একটী নির্ঝরিণী ছিল, অমনি কুল কুল নাদে জলে পূর্ণ হইয়া গেল। চারিটী দুগ্ধপাত্র সেই জলে ভাসিতে ভাসিতে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তিনি একটি গ্রহণ করিলেন, অপর পাত্র তিনটী ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জয়নারায়ণ এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি, অবস্থা শোচনীয়—বিবাহ হয় নাই। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শিষ্য করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, তোমার বিষয়স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই।" একটী বিল্বপত্রে কিছু

লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, এই লও, ইহা তুমি বরদাখাত পরগণার জমিদার মীর্জ্জা হাসেনালীর হস্তে প্রদান করিও। তোমার কথঞ্চিৎ অভাব মোচন হইবে।”

সন্ন্যাসী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদান করিয়া সেই শূন্য আসন তিন খানির বিবরণ বিবৃত করেন। প্রথম আসন মির্জ্জা হোসেনালীর। একদা দেবপ্রদত্ত দুগ্ধপান করিবার কালে তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হওয়ায় মুসলমানকুলে জন্ম হইয়াছে। দ্বিতীয় আসন রাজা রামকৃষ্ণের। একদা দেবপ্রদত্ত দুগ্ধপান করিবার সময়ে বৃষ্টি হইতেছিল, তাই তিনি দুগ্ধপাত্র ভূমিতে রাখিয়া এক হস্তদ্বারা মস্তক আবৃত করিলেন, অন্য হস্তদ্বারা দুগ্ধপাত্র ঢাকিয়া রাখিলেন। দৈববাণী হইল,—“তোর এখনও ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় নাই। তোর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইবে।” দৈবাদেশ শুনিয়া তিনি ম্রিয়মান হইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ও বিষণ্ণতা দৃষ্টে তৃতীয় আসনের সন্ন্যাসী দুঃখিত হইলেন,—তাঁহার মায়ার সঞ্চার হইল। অমনি পুনরায় দৈববাণী হইল,—“তোমার এখনও মায়াপাশ কাটে নাই, তুমি উহার অগ্রজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে।” তাঁহারা তিন জনেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যথাকালে মুক্ত হইবেন। বলাবাহুল্য তৃতীয় আসনস্থ সন্ন্যাসীই আমাদের দ্বিজ রামপ্রসাদ।

জয়নারায়ণ দেশে আসিয়া যথাসময়ে মির্জ্জা হোসেনালীর হস্তে সন্ন্যাসী প্রদত্ত বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণকে বিবাহ করাইয়া কিছু জায়গীর প্রদান করতঃ হোসেনালী সংসার ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। রামপ্রসাদ এই জয়নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইকারণে জয়নারায়ণ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত কন্যা বিবাহ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

২। একদা রামপ্রসাদের আমডাইল খাইবার সাধ হওয়ায় পিসীমাকে বলিলেন; “পিসী মা! মা যে আম-ডাইল খাইতে চায়।”

পিসীমা বলিলেন, “অকালে—অসময়ে আম কোথায় পাইব, আমসীর ডাইল পাক করিগে।”

পিসীমা পাকের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, এই আম কয়েকটী নাও, ঠাকুর স্নান করিতে গেলেন; আমাকে দিয়া পাঠাইলেন এবং আম-ডাইল রাঁধিতে বলিয়া দিলেন।”

অন্নব্যঞ্জন নিবেদনকালে রামপ্রসাদ বলিলেন, “পিসীমা! এ যে আম-ডাইল, আম কোথায় পেলে?”

“কেন?—তুই যে একটী মেয়েকে দিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিস্” এই বলিয়া প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলেন। রামপ্রসাদ মহামায়ার কৃপা বুঝিতে পারিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

৩। একদা কোনও তস্কর অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া কালীবাড়ীর নিকট দিয়া গমন করিতেছিল; সে রামপ্রসাদের ভাববিবশকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া জঙ্গল পার্শ্বে দ্রব্যাদি রাখিয়া গান শুনিতে লাগিল। চোর গানে মোহিত হইয়া গেল। সহসা রাত্রি প্রভাত দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে অপহৃত দ্রব্যাদি ফেলিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে যাহার বাড়ীতে চুরি

হইয়াছিল সে কালীবাড়ীতে তাহার দ্রব্যাদি পাওয়ায় রামপ্রসাদকেই চোর বলিয়া ধৃত করিল। রামপ্রসাদ বিচারালয়ে নীত হইলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া স্বরচিত একটী গান করিলেন। গানের গভীর ভাবোচ্ছ্বাসে বিচারক বিচলিত ও বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি রামপ্রসাদকে সসম্মানে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

৪। একদা রামপ্রসাদ বাজারে যাইতে ছিলেন; কয়েকজনের অনুরোধে পথিমধ্যে বসিয়া তিনি গান আরম্ভ করিলেন। একটীর পর একটী করিয়া গান চলিতে লাগিল। রামপ্রসাদ ঘর—বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, বাজার-বেসাতি সব ভুলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার চৈতন্ত হইল। তখন বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিলেন না, সকলে কি খাইবে ভাবিতে ভাবিতে রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী আহারের উদ্যোগ করিতে করিতে বলিলেন, "আজিকার বাজারের দ্রব্যাদি উত্তম"। রামপ্রসাদ লজ্জায় মরিয়া গেলেন, হেঁটমুখে আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুনরায় বলিলেন, সন্ধ্যা হইলে আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময় একটা মেয়ে আসিয়া বাজার-সদায় দিয়ে ব'লে গেল, ঠাকুরের আসিতে একটু বিলম্ব হইবে।

রামপ্রসাদ "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা মায়ের অপার করুণায় দ্রব হইয়া গেলেন।

এইসকল ও পূর্ব্ব প্রকাশিত আখ্যায়িকাগুলি এদেশের অধিকাংশ লোক জ্ঞাত আছেন। যাহাহউক আমাদের প্রতিপাদ্য দ্বিজ রামপ্রসাদ যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও কবিওয়ালা রামপ্রসাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব এবং তাঁহার সাধনাক্ষেত্র চীনীশপুর সম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বৈধভাব জন্মিতেই পারে না। দলিল—দস্তাবেজ, গান, জনশ্রুতি, কিম্বদন্তীও ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক ছিলেন; তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া সাধনা করিতেন। বৈশাখীর অমাবস্যা তিথিতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও চীনীশপুর কালীবাড়ীতে বৈশাখমাসে অত্যাধিক লোক সমাগম এবং অমাবস্যার দিন বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। চীনক্রমে সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া দেবীর নাম চীনেশ্বরী এবং গ্রামের নাম চীনীশপুর হইয়াছে। তাঁহার শেষজীবন সঙ্গীতেই অতিবাহিত হইত, সঙ্গীতেই তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল। তাঁহার সঙ্গীতেই উপাসনা— সঙ্গীতেই সিদ্ধি।

দ্বিজ রামপ্রসাদের জন্ম সময় নির্ণয় করা সুকঠিন। দলিল—দস্তাবেজ ও নাটোর রাজবংশের ইতিহাস দৃষ্টে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ ১১৫৪ সালের পূর্ব্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২০৪ সালের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীচন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী।

———:০:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

উৎসব। বর্ত্তমান মাসের ২৬ শে শুক্রবার অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন অত্র শান্তি-আশ্রমের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে ঐদিন পূজা, পাঠ ও অহোরাত্র ৺নাম সংকীর্ত্তন হইবে। আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক এবং ভক্তমণ্ডলীকে উৎসবে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পূর্ব্বক নিমন্ত্রন করিতেছি। স্থানীয় সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বাণী-ষ্টুডিও। ঢাকা—২২৬নং নবাবপুর রোডে পেইন্টার ও ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত কালীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বাণী-ষ্টুডিও স্থাপিত। কালীবাবু কলিকতা আর্টস্কুলে শিক্ষালাভ করতঃ ঢাকায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বহস্তের কয়েকখানা সাধু-মহাপুরুষের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। চিত্রাঙ্কনে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ফটো তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত; তৈলচিত্র ও অন্যান্য চিত্র অঙ্কনে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক। কালীবাবু নিজেও বেশ উদার ও অমায়িক লোক। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত চিত্রকার্য্য ইনিই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ঢাকা সহরে চিত্রবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা ইহারই খ্যাতি সমধিক। পরমারাধ্য শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ৩, তিন রকম ফটো তাঁহার নিকট পাওয়া যায়।

সেবক-সম্প্রদায়। শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের সুপারিণ্টেডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী বোধানন্দ সরস্বতী মহারাজ ভিক্ষায় বাহির হইয়া দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, কাটিহার প্রভৃতি স্থান ভ্রমনকরতঃ মালদহ গিয়াছেন। তাঁহারা রাজসাহি ও মুর্শিদাবাদ হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সতী-নারী। কলিকাতা—শ্যামপুকুরষ্ট্রীটে ১৯শে ফাল্গুণ একজন ভদ্রলোক পক্ষাঘাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন। বাড়ীর লোক যখন শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মৃতব্যক্তির স্ত্রী বৈধব্য যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ছাদে গমন করতঃ আপনার পরিধেয় বস্ত্রে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। প্রথমতঃ এই ঘটনা কেহ জানিতে পারেন নাই, পরিশেষে সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে ছাদে গিয়া দেখেন যে, সতীর ভস্মাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। এই সতী রমণীর ৩৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

জন্মোৎসব। গত ৯ই চৈত্র মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ—মায়াপুরে তাঁহার জন্ম মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মনোহরসাহি কীর্ত্তন ও ভুরি ভোজনই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ঐ দিন অন্যান্য স্থানে ও আমাদের এখানেও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

—————:0:—————

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পরিশিষ্ট।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কখনও সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিতেন না; যখন তাঁহার মনে যে ভাবোদয় হইত, তখনই সেই ভাবের গান গাহিতেন। তাঁহার গীতাবলী হৃদয়গ্রাহিণী বলিয়া ভক্ত ও তদানন্তীন গুণগ্রাহী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করায় নানাদিগ্‌দেশে বহুল প্রচার হইয়াছে। রামপ্রসাদের দেশপর্য্যটন প্রচারের অন্যতম কারণ। দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনীতে আমরা যাহা প্রকাশ করিয়াছি, রামপ্রসাদী-সঙ্গীত হইতে এখন তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সঙ্গীতের সকল অংশ উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বাড়িয়া যাইবে, তাই আমরা কেবল প্রমাণের উপযোগী অংশ বাছিয়া উদ্ধৃত করিব। বিশেষতঃ সে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্যক্তি অবগত আছেন, তথাপি সাধারণের বিশ্বাসের জন্য আমরা সঙ্গীতের নম্বর দিব, সন্দেহ হইলে পাঠকগণ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত "সাধক-সঙ্গীত" পুস্তকের রামপ্রসাদী সঙ্গীতগুলির নম্বরের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

গীত নং ২৬৬

শিশুকালে পিতা ম'ল মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি ভাসালে সায়রের জলে গো।

"রাজ্য নিল পরে" এই কথাটা কবিরঞ্জনে খাটে না বলিয়া অনেকে রাজ্য অর্থে পদরাজ্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদে স্বাভাবিক অর্থই সুসঙ্গতি হয়। রামপ্রসাদ

বাল্যকালে পিতৃহীন হ'ন এবং কনিষ্ঠ গোপালের রাজ্যপ্রাপ্তিতে নিজে বঞ্চিত হইয়া এই গান গাহিয়া ছিলেন।

গীত নং২১০, মা কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, আমার এম্নি দশা,
শাকে অন্ন মিলে কই॥

কারে দিলি ধন জন, মা হস্তী অশ্ব রথ চয়।
তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি তোর কেউ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায় মনে করি তেম্নি হই।
আমি কি দিয়েছি মা তোর পাকা ক্ষেতে মই।

ধনহীন রামপ্রসাদ এই গানটীতে তাঁহার মনের ভাব প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। এর পর আর একটী গানে দেখুন ইহাতে আর লুকান ভাব নাই, আবেগে মনোগত ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

গীত নং২১৬, মরি গো এই মনোদুখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ ব'লব কাকে॥
একি অসম্ভব কথা শুনে কিবা ব'লবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখলি যাকে পরম সুখে
আমি কি গো এত অপরাধী লুন মিলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে নিয়ে পাছাড় মারলে আমার বুকে।
মায়ের মত কাজ ক'রেছ ঘোষিবে জগতের লোকে॥

'পেটের ভুকে' এবং 'লুন মেলে না', 'আমার শাকে' ইত্যাদি বাক্য নিতান্ত দারিদ্রতার পরিচায়ক। কবিরঞ্জনের জীবনীকার লিখিয়াছেন, তিনি কোন জমিদার সরকার হইতে ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন এবং কৃষ্ণনগরাধিপতি দেড়শত বিঘা নিষ্কর জমি দিয়াছিলেন। অথচ একটী কন্যা ও বৃদ্ধা-মাতা ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার সংসারে ছিল না। তবে সেকালের দিনে তাঁহার শাকে লুন মিলিত না, ইহা অসম্ভব কথা নহে কি? "আমি অন্ন বিনে দিনেক দুদিন উপবাসী রই" বলিয়া সঙ্গীতে আক্ষেপ করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনে ইহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। অন্য অংশ সেন-রামপ্রসাদে আদৌ সামঞ্জস্য হয় না। কনিষ্ঠ গোপালের রাজ্য-প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়াই দ্বিজ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন; "সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখ্লি যাকে পরম সুখে।" রাণী ভবাণীর পোষ্যগ্রহণ-ব্যাপার স্মরণ করিলেই অন্য অংশের অর্থ বুঝিতে পারিবেন। এক সহোদর—একত্রে নিমন্ত্রনে গেলেন, অথচ গোপাল বিশাল নাটোর-রাজ্যের অধিপতি হইলেন, তিনি যে দরিদ্র তাহাই থাকিলেন। তাই মনোদুঃখে এই সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন। অনেক গানেই তাঁহার এ জ্বালা বাহির হইয়াছে।

গীত নং১১৮
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন দারাসুতের বেগার খেটে মর॥

এখানে দারাসুত পাওয়া গেল। আর একটী গানের কোনও অংশে পাওয়া গিয়াছে, ম'রল বেটা, ভাঙ্‌ল লেঠা, রামপ্রসাদ তো কালীর বেটা।"

গীত নং২০৩
দিয়েছিলি একটা বৃত্তি দিয়েও তা হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে মা হ'য়ে তার মাথা খালি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মা এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা লাভে মূলে ডুবাইলি॥

এখানেও ছেলে পাওয়া যায়। কবি-

রঞ্জনের পুত্র ছিল, এ কথা কোন জীবন-চরিত-লেখক প্রকাশ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—দ্বিজ রামপ্রসাদের একটী পুত্র সন্তান ছিল। ঐ পুত্র ও রোগজীর্ণা গর্ভবতী স্ত্রী একই সময়ে মারা যান। তাই তিনি গাহিয়াছেন;—"ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা ডুবাইলি লাভে মূলে।" কি সুন্দর ও সঙ্গত অর্থ। যাহারা কবিরঞ্জনকে এই গানের রচয়িতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। এর পরই রামপ্রসাদের বৈরাগ্যের বিকাশ। তাই গাহিয়াছেন,-"ভাই বন্ধু থেকো-নারে রামপ্রসাদের আশায়।"

গীত নং৯৯

নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বলে চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধুসঙ্গে মনোরঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই গাহিয়া ছিলেন;—

গীত নং৪১

ছিলেম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা ব'লে তোর কোলে যাব না॥

কবিওয়ালা বা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ গৃহী ছিলেন, সুতরাং এই গানটী তাঁহাদের উপর প্রযুজ্য হইতে পারে না। আমাদের দ্বিজ রামপ্রসাদই সন্ন্যাসী হইয়া নামের ঝোলা সার করিয়াছিলেন।

গীত নং১০৭

নয়ন থাক্‌তে দেখলি না মন কেমন তোমার কপালপোড়া।
বে'র হয়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বেড়া বাঁধিতেন এবং তদীয় কন্যা বাঁধন ফিরাইয়া দিতেন ইহা অসম্ভব কথা। সেনমহাশয় কবি, রাজার সভাপণ্ডিত ও বৃত্তিভোগী, কন্যার সহিত বেড়াবাঁধা কি তাঁহার শোভা পায়? ইহা দরিদ্র দ্বিজ রামপ্রসাদেই সম্ভব। চীনীশ-পুরে অবস্থান কালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

গীত নং৫৯

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
কত দুঃখ দেবে দেও দেখি চাই॥

দেখি চাই, নে চাই, এরূপ কথা পশ্চিমবঙ্গে আদৌ প্রচলিত নাই; ইহা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা। সুতরাং এই গানের রচয়িতা পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী অর্থাৎ আমাদের দ্বিজ রামপ্রসাদ।

গীত নং২০৯

যখন দিনে নিরাই করে শীকারী সব রয় না ঘরে।
ক্যাঠা ব'র্শা ল'য়ে করে কেউ নায়ে কেউ তরে চলে॥

এই পদের অর্থ বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত কেহই বুঝিবেন না। ইহা খাঁটি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা। সুতরাং রামপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ও ব্রাহ্মণ সন্তান।

গীত নং৯৫

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব,সে মায়ের নাম গাইব॥

গঙ্গাতীরে বসিয়া সেন রামপ্রসাদের এরূপ সঙ্গীত রচনার সার্থকতা থাকে না। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদেরই ইহা রচিত।

আর সমালোচনা করিয়া কত দেখাইব। চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া প্রসাদী-সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলেই প্রায় অধিকাংশ গানে আমাদের প্রবন্ধের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। আমরা আর সমালোচনা

করিয়া প্রবন্ধ বৃদ্ধি করিতে পারিলাম না। এতাবতা যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতেই অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত হইল যে, কবিওয়ালা ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গে একজন দ্বিজরামপ্রসাদ ছিলেন; চীনীশপুর তাঁহার সিদ্ধপীঠ এবং রামপ্রসাদী-সঙ্গীতগুলি তাঁহারই রচিত। তবে উক্ত রামপ্রসাদ দ্বয়ের মালসীগানগুলিও দ্বিজ রামপ্রসাদের গানের সহিত মিলিয়া—মিশিয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ও সাধক-চূড়ামণি ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী।

—o—

নীরবে।

নীরব কাননে নীরব ফুল,
নীরবে ফু'টে উঠিল।
নীরবে আবার শুকায়ে গেল,
নীরবে ঝরি পড়িল॥
নীরব গগনে নীরব চাঁদ,
নীরবে হে'সে উদিল।
নীরবে আবার ডুবিয়ে গেল,
নীরব জোছনা লুকাল॥
নীরব কাননে নীরব বায়ু,
নীরবে বহিয়ে গেল।
নীরব সৌরভ নীরবে লয়ে,
নীরবে ধরা মাতা'ল॥
নীরব আঁধারে নীরব আলো,
নীরবে জ্ব'লে উঠিল।
নীরব বাতাসে কাঁপিয়ে পুনঃ,
নীরবে নিভিয়ে গেল॥
নীরব আকাশে নীরব তারা,
নীরব হাসি হাসিল।
নীরবে খেলিয়ে নীরব খেলা,
নীরবে ডুবিয়ে গেল॥
নীরব দামিনী নীরব মেঘে,
নীরবে প্রকাশ হল।
নীরব প্রাণে নীরবে চমকি,
নীরবে লুকায়ে গেল॥
নীরব কুমারী নীরবে ব'সে,
নীরবে সব দেখিল।
নীরবে ত্যজিল দীর্ঘ নিশ্বাস,
নীরবে আঁখি মুছিল॥
কুমারী নয়ন মুছিল কেন?—
এসব খেলা যে জন খেলিল।
যদি তাঁর প্রতি না হল ভকতি,
এছার জীবন ধরি অকারণ,
জনমি মরণ কেন না হ'ল?

কুমারী শৈলবালা।
শান্তি-আশ্রম।

—o—

সাধারণের উপায় কি ?

বিষম কাল পড়িয়াছে,—হিন্দুসমাজের উপযুক্ত নেতার অভাব হওয়ায় সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। লোকসকল উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোক বিপথগামী; অথচ সকলেই শাস্ত্রবেত্তা, ধর্ম্মবক্তা ও উপদেষ্টা। তাহারা আপন আপন শিক্ষা-দীক্ষানুসারে যাহার যেমন সংস্কার বা ধারণা জন্মিয়াছে, সে সেইরূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছে। ইহাতে নিজে ত প্রতারিত হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জনকেও বিপথগামী করিতেছে। কেহ কেহ অবিদ্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া আত্মদর্শী ও সত্যমন্ত্রী ঋষিগণের ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আপন কৃতিত্ব জাহির করিতেছে। কেহ বা একই শাস্ত্রের কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্জিত এবং কতক মিথ্যালক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বাদ দিয়া, আপন মতলব সিদ্ধির উপযোগী অংশ বাছিয়া লইয়া ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়াছে। কেহ কেহ পুরাণ, তন্ত্রগুলি বালিকার পুতুলখেলা ভাবিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মবিৎ হইয়া বসিতেছে। কেহ বা কোন শাস্ত্রকে আধুনিক, কোন শাস্ত্রকে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের রচিত বলিয়া মুন্সিয়ানাচালে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। কেহ ব্যাকরণের তাপে পুরাণগুলি গলাইয়া তাহার খাদ বাহির করতঃ দয়াপরবশ হইয়া খাঁটি অংশ বাহির করিয়া দিতেছে,—সে তাপে ঐতিহাসিক সত্য পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতেছে। কোন দল বা নিয়ম-সংযম, বিধি-নিষেধ কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছে। কিন্তু সকলেই ধর্ম্মহীন,—বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে। ধর্ম্মের লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছে,—অথচ মুখে বড় বড় কথা, দর্শন-উপনিষদ, যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহারা ছোট কথার ধার ধারে না। তাহারা কেহ বেদান্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শূন্যবাদী, কেহ গীতোক্ত কর্ম্মযোগী, কেহ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহ তন্ত্রোক্ত কৌলচারী, কেহ উজ্জ্বলরসাস্বাদী—আর কাহারও মুখে যোগ-সমাধি।

এইত গেল শিক্ষিত নেতা ও উপদেষ্টা এবং তাহাদিগের চেলার কথা। আর যাহারা ধর্ম্মের নিম্নস্তর লইয়া আছে, তাহারা কেবল তিলকমাটী, মালা-ঝোলা, চিনি-কলা, বাহ্য শৌচাচার ও চৈতন-চুটকী লইয়া সময় কাটাইতেছে। তিনবেলা সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটা, অথচ মিথ্যা-মোকদ্দমা, মিথ্যা-সাক্ষ্য, পরনিন্দা, পরস্বাপহরণ ও পরদারগমনের নিবৃত্তি নাই। এই শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের প্রাণ ছাড়িয়া সংস্কারবশে হাড় মাস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। একটা কথায় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—হিন্দুসমাজে ব্রত ও পর্ব্ব উপলক্ষে উপবাস করিবার বিধি আছে। উপ=সমীপে+বাস —অর্থাৎ ভগবানের নিকটে বাস করাই উপবাস; তজ্জন্য পূর্ব্বদিন হইতে সংযমাদি করিয়া চিত্ত শুদ্ধ রাখিতে হয়, পরে পর্ব্বদিন দিবারাত্র সংযতভাবে ভগবদারাধনা ও ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকাই ব্যবস্থা। কিন্তু মিথ্যাকথা বলিয়া, পরনিন্দা ও কলহ করিয়া দিবারাত্র কাটাইয়া জলটুকু না খাইয়া অনাহারে থাকিতে পারিলেই

উপবাসের সার্থকতা হইল বলিয়া তাহারা মনে করে। প্রথমশ্রেণীর লোক জ্ঞান-গরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং দ্বিতীয়শ্রেণীর লোক বাঁধনের উপর বাঁধন করিয়া অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িতেছে।

আর একশ্রেণীর লোক হিন্দুসমাজে দেখা দিয়াছে, তাহারা জারজ ধর্ম্মাবলম্বী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া ইহারা অজ্ঞসমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া বসিতেছে। তাহাদের মুখে কেবল কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার ধুয়া, কেবল ধর্ম্মসভা ও বক্তৃতার উচ্চ-নিনাদ; যাহারা গীতার প্রথম শ্লোকটী অনুবাদ করিতে গিয়া সাতটী ভুল করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের সমালোচিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র পাঠকরতঃ এই শ্রেণীর লোক পণ্ডিত হইয়া হিন্দুদিগের গুরু হইতেছে। ঋষিগণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বুঝিয়া তাহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদির ভ্রম সংশোধন ও শ্লোকাঙ্গ কর্ত্তন করিয়া হিন্দুসমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে। এই শ্রেণীর লোক দ্বারা হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পপাদপ ফল ফুল পত্রাদিযুক্ত শাখা প্রশাখা শূন্য হইয়া স্থাণুবৎ শোভিত হইবার যোগাড় হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে,—তাহারা অবতার। নিজে কিম্বা ভক্তগণ দ্বারা সমাজে অবতার রূপে পরিচিত হইতেছে। ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের পর হইতে এতদ্দেশ অবতারগণে পরিপূর্ণ। প্রতি জেলাতেই দু' একটী অবতারের অভ্যুদয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইতিমধ্যে দুই একটী অবতারের কারা ও দ্বীপান্তর বাসের লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে।* তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ সরল লোকগণ দলে দলে যাইয়া অবতারের দলপুষ্ট করিতেছে। এই শ্রেণীর লোকদ্বারা হিন্দুসমাজ খণ্ড খণ্ড হইতেছে; এবং প্রকৃত সাধুচরিত্র অবতারের অন্তরালে পড়িয়া লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। অবতারের সংশয়-জাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া সাধু মহাত্মার ত্যাগ বৈরাগ্য বা জ্ঞানভক্তির আদর্শ সাধারণে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

এক্ষণে সাধারণের উপায় কি?—তাহারা কি করিবে, কোন্ পথ ধরিবে এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? তাই বলিয়াছি, বিষম কাল পড়িয়াছে। আর বিষম কাল পড়িয়াছে বলিয়াই ত ভয় হয়। বিশ্বাস করি কা'র কথায়?—যে বলিতেছে "গৃহস্থ জাগরিত হও," আবার সেই বলিতেছে "উঠিও না রাত্রি আছে," এখন কি করা কর্ত্তব্য? এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, আমাদের ঈশ্বরদত্ত যে মনুষ্যত্ব—তাহাকেই আশ্রয় করা—কেন না, তিনি আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য, প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তখন একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া—বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিলে কোনই গোলে পড়িতে হইবে না। আমাদের দেহরথে বিবেক শ্রীকৃষ্ণ, সংশয়াকুলিত বিষাদমগ্ন শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনরূপী মনকে নিয়তই গীতামৃত পান করাইতেছেন। অতএব বিবেকের শরণাগত হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, সে'ত মায়ার সম্মোহন মন্ত্রে

* পাঠক। বিক্রমপুরের কল্কি অবতারের কথা স্মরণ করুন।

মুগ্ধ হইয়া পরিচালিত হইতেছে, বিবেকর বশবর্ত্তী নহে। সুতরাং প্রথমতঃ বিবেক জাগ্রত করিবার জন্ত বিধিমত চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। আর চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলিও সর্ব্বদা পালনীয়। তাই ঋষিগণ মানবজীবনের প্রথম সোপানে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে শাস্ত্রাদি পাঠে জ্ঞানলাভ এবং আহারাদি ও শমদমাদি অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধি হইত। তাই ধর্ম্মের ভিত্তিই ব্রহ্মচর্য্য; ব্রহ্মচর্য্য অভাবেই আমাদের সমাজের এই দুরবস্থা। চিত্তশুদ্ধ না হইলে কোন ধর্ম্মেই অগ্রসর হওয়া যায় না। খৃষ্টান-মুসলমানে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবে মতভেদ, পৌরাণিক-দার্শনিকে মতভেদ; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েই মতদ্বৈধ দেখা যায় না। চরিত্র গঠনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা খৃষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনুমোদিত। চুরিকর, মিথ্যাকথা বলা ইহা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত নহে। সুতরাং আমরা প্রথমজীবনে সর্ব্বসম্মত চিত্তশুদ্ধির সাধনা আরম্ভ করিতে পারি। ইহাতে প্রতারিত হইবার ভয় নাই, এবং ইহার অভ্যাস বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। দেশকাল পাত্রভেদে সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক চিন্তার অভ্যাস করিলেই সহজেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে শরীর নীরোগ ও সুস্থ হইবে এবং বিশ্বাস ভক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে।

চিত্তশুদ্ধি হইলে যাহার যে ভাবে,—যে মতে বিশ্বাস হইবে, তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অন্তমত শ্রেষ্ঠ ও নিজের মত নিকৃষ্ট, মিথ্যা, কুসংস্কারপূর্ণ শুনিয়াও বিচলিত হইও না। নিজমত দৃঢ় করিয়া ধারণপূর্ব্বক তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য চেষ্টা করিবে। কেন না, কোন মতই—কোন সম্প্রদায়ই নিরর্থক নহে। অজ্ঞতা-প্রযুক্ত লোকসকল সাম্প্রদায়িক মতগুলির সমালোচনা করিয়া দুর্ব্বলাধিকারীর মন বিগড়াইয়া দেয়; কিন্তু কোন মতই মিথ্যা নহে, সকল মতেরই আশ্রিতজনগণ পূর্ণ সত্যে কিম্বা সত্যের একদেশে উপনীত হইবে। যখন মানবসমাজের জনগণ পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির, তখন তাহাদিগের মতে বৈষম্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মতগুলিকে পথ মাত্র জানিয়া,—কোন মতের নিন্দা না করিয়া কিম্বা সকল মতের করিম, কালী, কৃষ্ণ, খৃষ্টের খীচুঁড়ি না পাকাইয়া সতী নারীর ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। জন্মান্তরের সংস্কার এবং শিক্ষা ও রুচিভেদে অধিকারানুরূপ যে কোন একটী মত অবলম্বন করিবে। অনন্তর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া—ভাব পুষ্ট হইয়া লক্ষ্যস্থির হইলে তদনুরূপ সাধনা-প্রণালী অবলম্বন করিবে। সাধনার লক্ষ্য-বস্তু উপলব্ধি হইলেই তৎপ্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে—তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইবে। তখন সংসারের যাবতীয় বস্তুতে বিরাগ জন্মিয়া অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তের অবিচ্ছিন্না—একমুখা গতি হইবে। কাজেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হইবে। তখন আত্ম-স্বরূপ লাভে কৃতার্থ হইয়া মুক্তিপদে অবিস্থিতি করিবে।

কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে একজন মুক্তব্যক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রে তিনিই গুরু নামে অভিহিত হন।

গুরুর কৃপা না হইলে মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরু, শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার না করিলে অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভে কৃতার্থ হওয়া যায় না। সুতরাং গুরুর আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবে। যিনি আত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন তিনিই গুরু। নতুবা অন্যের নিকট যাইলে গুরুর অভাব পূর্ণ হইবে না। এরূপ গুরু না পাইলে তজ্জন্য সরলভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। অকপটভাবে সরল প্রার্থনা আমাদের পক্ষে বড়ই কার্য্যকরী। যখন যে দুর্ব্বলতা অনুভব করিবে, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও, হাতে হাতে ফল পাইবে। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন বুঝিলে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিও ভগবান্ তাহা পাঠাইয়া দিবেন। উপযুক্ত সময়ে গুরু আপনা হইতে লাভ হইয়া থাকে। গুরু পাইলে আর ভাবনা কি, সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া তদীয় আদেশ পালন করিয়া যাও, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।

তবেই দেখ, প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির এ জগতে কিছুরই অভাব হয় না। দূর হইতে হাটের উচ্চরোল শুনা যায়, কিন্তু হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর কোন গোল নাই। তদ্রূপ ধর্ম্ম জগতের বাহিরে বাদবিতণ্ডা, বিদ্বেষকোলাহল, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট কোন বিসম্বাদ নাই। মুক্তাবস্থা আমাদের স্বভাব, সুতরাং তাহা লাভ করা যাবতীয় কার্য্যাপেক্ষা সহজ। ধর্ম্মলাভ করিতে বিদ্যাবুদ্ধি, মূলধন কিম্বা বলবীর্য্যের প্রয়োজন হয় না; কেবল প্রাণ-ভরা বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। মানব মনে স্বতঃই দুটী প্রশ্নের উদয় হয়,—ভগবান্ আছেন কিম্বা নাই; যদি না থাকেন, তবে ত কথাই নাই—চার্ব্বাকের মতানুসরণ কর। আর যদি থাকেন, তবে অবশ্য কেহ দেখিয়াছেন; যে দেখিয়াছেন তাঁহার নিকট দেখিয়া লও, কিম্বা তিনি যেরূপে দেখিয়াছেন, সে উপায় জানিয়া লও, তাহা হইলে কৃতার্থ হইবে। আর যাহার ভগবানে বিশ্বাস নাই, সে কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি সংস্কারগুলি ভুলিয়া সরলভাবে—সমাহিতচিত্তে অনুসন্ধান করুক, তাহার অভাব কি?—সে চায় কি?—আমরা সুখের কাঙ্গাল,—চিরদিনের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখ প্রার্থনা করি। কিন্তু সুখ কোথায়?—ধনে জনে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কিম্বা মান যশ প্রভৃতি অনিত্য পার্থিব পদার্থে কেহ কখন সুখী হইতে পারে নাই; সুতরাং তাহাতে তোমারও সুখের সম্ভাবনা নাই। তুমি নিজেই আনন্দময়; তুমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিলেই সুখী হইবে। যে ব্যক্তি সুখ চাহেনা ভগবান্ লাভ করিতে ব্যাকুল, তাহারা উভয়েই প্রকারান্তরে এক বস্তুর ভিখারী। কেন না সুখ যে সুখ স্বরূপ ভগবান্ ব্যতীত কোথায়ও নাই, আবার ভগবান্ লাভকরিতে পারিলেই সুখলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা উভয়েই এক পথের পথিক। কিন্তু অনভিজ্ঞ স্থূলদর্শী ব্যক্তি তাহাদিগকে নাস্তিক ও ভক্ত নামে আখ্যা দিয়া জগতে দলাদলি ও হিংসা দ্বেষের সৃষ্টি করিবে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, তবু তাহাকে নাস্তিক বলিও না, কারণ সে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানে না বা বুঝিতে পারে নাই, সেরূপ ধার্ম্মিককেও

বৈষ্ণবের কৃষ্ণভক্ত বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা সকলেই প্রবাহের যাত্রি—অনন্ত ধামের যাত্রী; যদিও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইতে যাত্রা করায় নানা পথের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি সকলের গতি একই কেন্দ্রে—ভগবচ্চরণে। তবে আর হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল কর কেন? যদি সুখ চাহ সর্ব্বাবচ্ছেদে ভগবানের শরণাগত হও, তাঁহার কৃপায় অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হইয়া নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

অতএব ধর্ম্মলাভ করিতে কাহারও কোন বাধা হইতে পারে না। যে কোন একটী মতের আশ্রয়ে পরিচালিত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইতে পারিবে। একটী আলপিন্ সাহায্যে আত্মহত্যা করা যায়, কিন্তু অপরকে হত্যা করিতে হইলে যুদ্ধশিক্ষা ও ঢাল তরবারির প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ নিজে ধর্ম্ম লাভ করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না, তবে যাহারা লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাদিগকে নানা শাস্ত্র, নানা পথ, নানা মত, বিভিন্ন সাধনপ্রণালী জানিতে হয়। কিন্তু সত্য প্রত্যক্ষ না করিয়া গুরু হইবার স্পর্দ্ধা এবং শাস্ত্রালোচনা করা, বিড়ম্বনাভোগ মাত্র। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গিয়াছে। অনধিকারী হইয়া যাহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার করে, তাহারা দেশের—দশের—সমাজের ঘোর শত্রু। সত্যলাভ না করিয়া শাস্ত্রপাঠ করিতে গেলে শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ নির্ণয় ও তাহার মর্ম্ম রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত; সর্ব্বাধিকারী জনগণকে স্থান দিবার জন্য প্রবৃত্তিপথে শত শত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নিবৃত্তিপথে স্তরে স্তরে অনন্তদেশে উঠিয়া গিয়াছে। সুকুমার কুমারগণের কোমলহৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপনের জন্য বর্ণাশ্রমোচিত ব্রত নিয়ম হইতে ব্রহ্মগতপ্রাণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসকের সন্ন্যাস পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের দেহ। গুরুকৃপায় প্রকৃত জ্ঞান না হইলে শাস্ত্রপাঠ করিয়া তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক এবং ফলও এক। তবে উদ্দেশ্যপথে যাইবার পদ্ধতি বা প্রণালী বিভিন্ন হইতে পারে। শাস্ত্রসকল সত্যদর্শী ঋষিগণের রচিত, সত্য এক,—সুতরাং শাস্ত্রসকল কি পরস্পর ভিন্ন ও বিসম্বাদী হইতে পারে? কিন্তু অনধিকারী স্থূলবুদ্ধিতে শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরস্পর বিভিন্ন দেখিয়া থাকে। তাই আজ একই শাস্ত্রের পাঁচজনে আপন আপন সংস্কার ও শিক্ষানুরূপ পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া হিংসা বিদ্বেষের বহ্নিতে সমাজ দগ্ধ করিতেছে। এক অধিকারীর উপদেশ অন্য অধিকারীর নিকট,—গৃহস্থের উপদেশ সন্ন্যাসীকে, আবার সন্ন্যাসের উপদেশ ব্রহ্মচারীর নিকট ব্যক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে উন্মার্গগামী করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণ লোকসকল এই সকল শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ও উপদেশদাতা প্রচারকর্ত্তাগণের বিভিন্ন মতবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবিডুবি খাইয়া মরিতেছে। অতএব সত্যলাভ না করিয়া কখন শাস্ত্রের গোলোকধাঁধায় প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে আর এ জীবনে বাহির হইতে পারিবে না। ব্যবহারিক বুদ্ধিতে শাস্ত্রপাঠপূর্ব্বক অজ্ঞসমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া কেবল বিরাট্ তর্কজাল বিস্তারকরতঃ বৃথা কচকচি করিয়া বেড়ায়। এইরূপ পল্লবগ্রাহী

কখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; উপরন্তু আর পাঁচজনকেও বিপথে পরিচালিত করিয়া সমাজে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং সাধকগণ ভক্ত ও ভগবানের লীলা-গ্রন্থ এবং স্ব স্ব সাধনপথের সারভূত ও কার্য্য-সাধনোপযোগী শাস্ত্রাংশ মাত্র পাঠ করিবে। তৎপরে সত্যলাভ করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদিবার জন্য সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। তখন দেখিবে হিন্দুশাস্ত্র কিরূপ সুশৃঙ্খলে সজ্জিত—কত অগণিততত্ত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত। কোন শাস্ত্র মিথ্যা বা নিরর্থক নহে, কোন না কোন অধিকারীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি এমন কোন নূতন কথা কেহ বলিতে পারিবে না, যাহা বিশাল হিন্দুশাস্ত্রের কোন না কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। আমরা উপযুক্ত গুরু অভাবে উপযুক্ত শিক্ষা লাভে বঞ্চিত বলিয়া অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যবংশে জন্মিয়াও অকর্ম্মণ্য—নগণ্য হইয়াছি এবং সর্ব্বদা রোগে শোকে ও সংকল্পিত কর্ম্মনাশে হা—হুতাশ করিয়া মরি।

অতএব সত্যলাভ করিয়া যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, তিনিই হিন্দুশাস্ত্ররূপ কল্পভাণ্ডারের দ্বারী হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকারানুরূপ তত্ত্বকথার প্রচার দ্বারা সমাজে সুখ-শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে। ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণের শুষ্ককণ্ঠে ধর্ম্মের অমৃতধারা ঢালিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্র বুঝাইয়া,—ধর্ম্মের জটিল ও গুহ্যতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া—শাস্ত্রের গূঢ় ও কূটস্থানের ব্যাখ্যা করিয়া,—জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তিভেদে আচার ও সাধনার তারতম্য দেখাইয়া,—যোগ, যাগ, তপ, জপ, পূজা ও সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া—তন্ত্র ও পুরাণোক্ত দেব, দেবী, লীলাকাহিনী, মূর্ত্তিতত্ত্ব, মন্ত্র, যন্ত্র, অবতারবাদ, মতবাদ প্রভৃতির মর্ম্ম বুঝাইয়া সমন্বয় ও সামঞ্জস্যভাবে অধিকারানুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সর্ব্বসাধারণে অতি সহজে শাস্ত্রমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে শাস্ত্রকার ঋষিগণের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। সকলে তোমার উদার মতের শীতলছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। নতুবা বহুকালের বহু মহাপুরুষ পরম্পরায় প্রকাশিত শাস্ত্র-সমুদ্র গণ্ডূষে উদরসাৎ করিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইবে মাত্র। আশাকরি স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের হিতসাধক ব্যক্তিগণ এই কথা ভুলিয়া যাইও না।

পরিশেষে দেশের মহামান্য নেতাগণ এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তোমরা পথ ছাড়িয়া বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছ কেন? গৃহের ভিত্তি ছাড়িয়া আগেই ছাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ কেন? ধর্ম্ম ও সমাজ থাকিলে ত তাহার সংস্কার করিবে। এখন যে ভায়ে ভায়ে, পিতাপুত্রে, স্বামীস্ত্রীতে ভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন ধর্ম্ম, তোমরা তবে সংস্কার করিবে কি? মাথা নাই, মাথা ব্যথা হইবে কিরূপে? আগে একতার বন্ধনে সমাজ সংস্থাপন কর, তৎপরে দোষ দেখিলে সংস্কার করিও, মৃত সমাজে আঘাত করিয়া দেহের সমস্ত অঙ্গ গলিত করিও না; আগে সমাজদেহ সঞ্জীবিত কর, তৎপরে দূষিত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিও, দেখিবে ঔষধ ও পথ্যে দুই দিনেই ক্ষতস্থান

আরোগ্য হইয়া উঠিবে। আগে নিজে সংস্কৃত হও,—ধর্ম্মলাভ কর, তৎপরে সংস্কার বা ধর্ম্মপ্রচার করিও। নিজে অন্ধ হইয়া অন্ত অন্ধের পথ দেখাইতে গিয়া উভয়ে খানায় পড়ি ও'না। ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবার পূর্ব্বে অন্ত জাতির ভাবিয়া দেখা উচিৎ, সে জাতীয়ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত কি না? ভণ্ড সন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর অধঃপতনে দুঃখ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, আমি গার্হস্থ্যধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিতেছি কি না? আমরা যে আপন ভুলিয়া পরের দোষ দেখিতে শিখিয়াছি, ইহাই আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ। পরনিন্দা, পরা-লোচনা করিয়া দিন দিন আমরা অধঃপাতের চরম স্তরে নামিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং প্রথমতঃ আমরা পরের চিন্তা না করিয়া নিজকে ভাল করিবার জন্ত চেষ্টা করি, তৎপরে পরের ভাল করিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিব। বড় বড় কথার বক্তৃতা না দিয়া সর্ব্বাগ্রে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা কর। আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর। প্রকৃত শিক্ষালাভে যখন জীব, জগৎ ও ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের—

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌।"

এই সুমহান উদার ভাব—অচ্ছেদ্য প্রেমের ভাব বুঝিতে পারিবে। তখন আমিত্বের সংকীর্ণ-গণ্ডী—বিশ্বময় প্রসারিত হইবে,—জগতের স্বার্থে আত্মস্বার্থ পদদলিত হইয়া যাইবে। আমিত্বের একটী শৃঙ্খলে রাজা প্রজা, দীন দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িবে। তখনই প্রকৃত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তোমরা একতার হার গলে পরিয়া বিশ্বজয় করিতে সক্ষম হইবে। পঠিত শিক্ষায় গঠিত জীবন হইতে না পারিলে সে শিক্ষার নামে ধিক্কার পড়িবে। অতএব প্রথমতঃ শিক্ষা লাভ করিয়া তদনুসারে চরিত্র গঠন কর, তৎপরে সাধু, শাস্ত্রের কৃপায় এবং সাধনাবলম্বনে সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া জগতের হিতে জীবন উৎসর্গ করিও। কাহারও নিন্দা না করিয়া—অনর্থক সমালোচনা না করিয়া পাপীতাপী, ব্রাহ্মণচণ্ডাল, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দাও,—সকলকে সমান আদরে সত্য দেখাইয়া দাও,—সকলকে স্কন্ধে বহন করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের বন্ধুর সিঁড়িগুলি পার করিয়া দাও। কাহারও বিশ্বাস নষ্ট না করিয়া পার ত তুমি তোমার নূতন দ্রব্য তাঁহাকে দান কর। চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও—আমরা সকলেই একই পিতার সন্তান,—একই পথের যাত্রী; সকলে একই স্থানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিব। ক্রমশঃ দেখিবে জগত হইতে হিংসা-দ্বেষ বিদূরীত হইয়া প্রেমের ভ্রাতৃবন্ধনে সকলে বাধা পড়িবে। একতার পবিত্র বন্ধনে—প্রেমের সুধাসম্পৃক্ত মলয়হিল্লোলে সমাজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে অচিরে হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা ভারতগগনে উড্ডীয়মান হইবে,—আবার হিন্দুদেশের ও হিন্দুজাতির গৌরব রব দিক্ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইবে।

পাঠকগণ! ভারতের সুবর্ণযুগে দেবকল্প ঋষিগণ সাধনা-পর্ব্বতের সমাধিরূপ উন্নত শৃঙ্গে বসিয়া, জ্ঞানের দীপ্তবহ্নি প্রজ্বলিত

করিয়া যে সকল নিত্য—সত্য—আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারই সুধাময় ফল হিন্দুশাস্ত্র। সেই আর্য্য-ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে জ্ঞাত ও লোকহিতার্থে প্রচারিত অমূল্য শাস্ত্র অগ্রাহ্যপূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মমতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের কলঙ্ক রটনা করিও না। আত্ম-শক্তি, আত্ম-প্রতিভা, আত্ম-সাধনা ও যুক্তিবিচারে জলাঞ্জলী দিয়া পরানুকরণে প্রতারিত হইও না। পরের কথায় করস্থিত পরমান্ন পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টিভিক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ হইও না। আপন কানে হাত দিয়া না দেখিয়া পরের কথায় বায়সাপহৃত কুণ্ডলের অনুসন্ধানে বাহির হইও না। পরের কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া জড়ত্ব বশতঃ জড়, পৌত্তলিক ও কুসংস্কারের ধুয়া ধরিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের এবং স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিও না, রসনা কলুষিত হইবে। আত্ম-মর্য্যাদা ভুলিয়া পরপদলেহন করতঃ সমগ্র জাতির কলঙ্ক ঘোষণা করিও না। যে দেশে—যে জাতির মধ্যে জন্ম হইয়াছে, তুমি তাহার গৌরব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিও না। এ দেশের বৃক্ষলতাগণও যে তপস্বী,—এদেশের প্রতি ধূলিকণা কত মহাপুরুষের, কত অবতারের, কত যোগী ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসীর পদে লাগিয়া পবিত্র হইয়াছে। এ দেশের মাটীতে পড়িয়া গড়াইতে পারিলেও বিনা সাধনে জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। ভারতের পবিত্র বক্ষে কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়—কত মঠ মন্দির—কত ধর্ম্মশালা বিরাজ করিতেছে, ঘুরিয়া দেখিয়াছ কি? কত আশ্রম,—কত তীর্থ,—কত ত্যাগী-বৈরাগী—আছে, কোন দিন অনুসন্ধান করিয়াছ কি?—এ দেশের অশিক্ষিত বালকে পরলোক সম্বন্ধে যে অধ্যাত্ম-সংস্কার রাখে, অন্য দেশের নামজাদা শিক্ষিত ব্যক্তির তাহা লাভ করিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। এই পতিত দেশে—পতিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা আমরা সমধিক সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি। এ দেশে জন্মিয়া—বালক কাল হইতে এ দেশের সংস্কার লাভ করিয়া তুমি যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ধারণা করিতে পার না, অন্য দেশের লোক সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে থাকিয়া তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? তুমি তাহাদের কথায় ভুলিয়া—তাহাদের মতে চলিয়া আত্মগৌরব বিনষ্ট করিবে কেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি যাহা বুঝিতে পার না,—তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে সকল তত্ত্ব ধারণা হয় না, তাহা, তুমি গ্রহণ করিও না; কিন্তু অজ্ঞ হইয়া তাহার নিন্দা প্রচার করিলে বিজ্ঞ সমাজে অবজ্ঞাত হইবে মাত্র। সর্ব্বাগ্রে শৃঙ্খলাবদ্ধক্রমে জীবন গঠনপূর্ব্বক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কর; তখন অজ্ঞানের সুস্থূল যবনিকা ভেদ করিয়া দৃষ্টি প্রসারিত হইলে, বুঝিতে পারিবে এই বৈচিত্রময় সৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায়—তখন বুঝিতে পারিবে আর্য্যঋষিগণের যুগযুগান্তরের আবিষ্কৃত শাস্ত্রে কি অমূল্যরত্ন সজ্জিত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের বিশাল রত্নভাণ্ডারে ইহ-পরকালের কত অগণিত, অজ্ঞানিত, অপ্রকাশিত তত্ত্ব স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া—সাধনা করিয়া মানব জন্ম সার্থক ও পরমানন্দ উপভোগ কর! হিন্দু-ধর্ম্মের বিমল স্নিগ্ধকিরণে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত

হইয়া, ভারতের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তাহার বিজয় দুন্দুভিবাদ্যে দিগ্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত কর। আমরাও এখন বিদায় গ্রহণ করি। এস ভাই! ভায়ে ভায়ে গলা জড়াইয়া ধরিয়া এই পতিত দেশ ও পতিত জাতির মঙ্গলের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিয়া, সেই পতিতপাবন কাঙ্গালশরণ, অধমতারণ, ভয়নিবারণ, সর্ব্বমত-বাদ-সমঞ্জসা-সত্যস্বরূপ সনাতন গুরুব্রহ্মের ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষপ্রদ অতুল-রাতুল চরণের উদ্দেশে প্রণাম করি।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহং॥

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

——:0:——

সাধক-সঙ্গীত।

[২]

পথের সম্বল হারা'লাম।
সাধন-দরিদ্র হয়ে গো রুদ্রাণি—
মহানিদ্রায় নয়ন মুদিত করিলাম॥
দারা-সুত, বন্ধু-বান্ধব, রইল ধামে,
চলিলাম একা শমন-সংগ্রামে,
ত্যজে অর্থ, বিত্ত, কেবল মাত্র উমে,
ধর্ম্মাধর্ম্মে সঙ্গে লইলাম॥
শুন মা শঙ্কর-রূপসি! তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ অসি,
হারাইলাম বিষয় মত্ততায়।
বন্ধ—হ'ল কণ্ঠস্বর, তন্নাম ধনুঃশর,—
লইতে অবসর না পেলাম হায়;
এখন—কিরূপে দুরন্ত কৃতান্ত নিবারি,
নাই সৈন্য সামন্ত, হেমন্তকুমারি,
রণভূমি হ'ল শ্মশানে শঙ্করি,
গোবিন্দের প্রতি বিধি বাম॥

——:0:——

পন্থা।

সময় কাহারও অপেক্ষা রাখে না। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন অবিশ্রান্ত গতিতে আদ্যন্তহীন হইয়া বহিয়া যাইতেছে। কাহার দুঃখের অবসান হইল না, কাহার হৃদয়ের ক্ষত শুষ্ক হইল না, কাহার সুখের রাজ্যে অকস্মাৎ দুঃখের আধিপত্য হইল, ইহার কিছুমাত্র বিচার না করিয়া কাল অব্যাহতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। হর্ম্ম্যমালাসুশোভিত মহানগরীকে শ্মশানে পরিণত করিয়া, প্রেত পিশাচের নিত্য ক্রীড়াভূমি ভীষণ শ্মশানভূমে শান্তির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছত্রপতি মহারাজকে কাঙ্গাল সাজাইয়া, নিঃসহায় পর মুখাপেক্ষী দরিদ্রের ভাগ্যে রাজার ঐশ্বর্য্য ন্যস্ত করিয়া, অনন্তদিমুখী অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে। জগতের চক্ষুর সম্মুখে এই কালের ভীষণ ক্রিয়াশীল ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, মানবের মন কোটী বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার চিন্তা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এই চিরপুরাতন বৈচিত্র্যময়তত্ত্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া চিরদিন নূতন হইতে নূতনতর রূপে প্রতিভাত হইতেছে এবং জীবদৃষ্টির অন্তরালে এক বিরাট শক্তির অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়া জীবকে ত্রস্ত ও স্তম্ভিত করিতেছে। যাঁহারা ভাগ্যবান্, যাঁহারা সত্যস্বার্থের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে এই মহাকালপ্রবাহের অভ্যন্তরে এক বিরাট শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তাঁহারই লীলা-নর্ত্তনীভূত হইয়া জীব শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি ও জননমরণরূপ বিকারের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া থাকেন—সময় কাহারও অপেক্ষা রাখে না; তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন—ভূঁইফোঁড় যেমন অদৃশ্যবীজ হইতে উদ্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া পরিণামে মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়; আমরাও তেমনি এক অদৃশ্য রাজ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, কাল মৃত্যুরূপ করাল করবালের আঘাতে যথেচ্ছসময়ে এই অস্তিত্ব বিনষ্ট করিতে পারে। সাংসারিক নিত্যকার ঘটনাবলীর মধ্যে মানব ইহার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই জ্ঞানরূপ জ্যোতিকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনালোচনারূপ ভস্মে আচ্ছাদিত রাখিয়া, এই নিত্যব্যাপার হইতে বলপূর্ব্বক আপনার চক্ষু অপসৃত করিয়া, মানব তাহার অমূল্য জীবন ক্রীড়াকৌতুকের প্রবলস্রোতে ভাসাইয়া দেয়, একবারও মনোমধ্যে ইহার চিন্তার উদ্রেক করিবার ইচ্ছা করে না।

মোহগ্রস্ত জীব এই ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থান করিয়া থাকিলেও কালপ্রবাহের এমন এক অভাবনীয় ও বিস্ময়োৎপাদক দুঃসময়রূপ আবর্ত্ত উপস্থিত হয়, যেদিন জীব আকাশক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় এই চির পুরাতন ও চির নূতন সত্যের বিরাট চিত্রপটের সম্মুখে পতিত হইয়া আপনার অহমিকার অসত্যতা উপলব্ধি করে এবং উন্মত্তের ন্যায় উদ্ভ্রান্তচিত্তে সেই বিরাট শক্তির চরণ নিম্নে কৃপার ভিখারী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়। নানা প্রকার আমোদপ্রমোদে জীবন কর্ত্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ এমন দুঃসময় আসিয়া পড়ে, যেদিন

মানব কালের বৈচিত্র্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে, জীবনের ক্ষণবিধ্বংসী প্রকৃতি ও বিষয়ের অসত্যতা তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া প্রকটিত হয়। জন্ম জন্ম অসত্যবিষয় ভোগ করিতে করিতে স্থায়ীভাবে যেদিন এই অসত্যতার জ্ঞান বিকাশিত হয়, মানুষ সেদিন পার্থিব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষার্থ মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। এই মুক্তিরই নামান্তর আনন্দময় শান্তি এবং ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। কিন্তু অহো কি আশ্চর্য্য! এই শান্তি ও আনন্দের প্রার্থী হইয়া মানব একদিকে যেমন বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ ও অনাসক্ত হইতেছে, অপরদিকে আবার এই শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার জন্যই মানব বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, স্ত্রীপুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে আপনার বক্ষে মিশাইবার প্রয়াস করিতেছে, জগতের সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য আপনার করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং যথেচ্ছ আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিয়া বিলাস-সম্ভোগের পূর্ণসজ্জার মধ্যে আপনাকে সংস্থিত করিতে ব্যগ্র হইতেছে। একই উদ্দেশ্যে একজন সংসারী,—একজন সন্ন্যাসী; একজন যোগী,—একজন ভোগী; একজন কর্ম্মী,—একজন উদাসী এবং একজন স্বার্থপর,—একজন পরার্থপর। জ্ঞানীর চক্ষে কেহ কাহাপেক্ষা হীন নহে—উচ্চও নহে; একই বস্তুর প্রত্যাশায়,—একমাত্র অশান্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির প্রবল পিপাসায়,—একমাত্র চিরস্থায়ী আনন্দের আকাঙ্ক্ষায়, সকল সময়ে সকল জীব ব্যগ্র হইয়া অভীষ্টপথে চলিয়াছে; বিবর্ত্তন-চক্রের এক এক গোলকে অবস্থিত হইয়া এক একজন এক এক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং অনন্তভাবশীল মানবের অনন্ত-ব্যষ্টি-গত সাধনভাব লইয়া সমষ্টি-জগতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

জগতে যদি দুঃখের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে জীব মাত্রই আনন্দরসে মগ্ন থাকিয়া এক জাতি ও এক সম্প্রদায়ে পরিণত হইত। দুঃখের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তির প্রবল চেষ্টা ও নানা বিভিন্ন প্রকারের উপায় জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ সকল উপায় বা সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীব নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জগতে বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই দুঃখনিবৃত্তির সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া জীব বহুবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তত্তৎকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী-ফলভোগী হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ চক্রাবর্ত্তনে ঘূর্ণমান রহিয়াছে। দুঃখের অবসান কিছুতেই হইতেছে না, কেবল দুঃখের পর নূতন দুঃখ জীবকে আক্রান্ত করিতেছে, ইন্দ্রিয়ের শতমুখী প্রবণতায়—আকুল আকাঙ্ক্ষায় জীব উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, জগৎ মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিয়া কেবল দানবত্ব ও পশুত্ব অর্জ্জন করিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর কতশত মহাত্মা এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সকল দেশের সকল জাতির জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ হইতে ঘৃতান্নভোজী ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত মঙ্গলময়বাণী সাধনার প্রকৃত পন্থা প্রচার করিয়াছে এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যেও ভাগ্যবান্

ও পুণ্যবান্ মহাত্মাগণ আনন্দামৃত পান করিয়া জীবন কৃতার্থ করিতেছেন। পৃথিবীর অন্য জাতির পূর্ব্বে একমাত্র ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন যে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বব্যাপী অনন্তস্বরূপ একজন আছেন, তিনি ব্রহ্ম; তাঁহারই বিরাট-শক্তি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়া, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার তাঁহাকে মোহগ্রস্থ করিয়া, তাঁহাকেই ঘটপটাদিরূপে প্রতিভাত করাইয়া জাগতিক সৃষ্টিবৈচিত্র্য উৎপন্ন করিয়াছে এবং একমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে। দুঃখনিবৃত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাঁহাদের প্রাণের মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল—আমি কে? কোথা হইতে আমি আসিয়াছি? কোথায় আমার পরিণাম পর্য্যবসিত হইবে? এই রক্তমাংসাস্থিদেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? কোন্ বস্তু লাভ করিবার জন্ত আমার হৃদয় সর্ব্বদাই আকুল,—কোন্ অদৃশ্যশক্তি আমাকে সকল সময়ে রক্ষা করিতেছে,—কাহার অলৌকিক শক্তি জীবনের প্রতিপদে—প্রতি-মুহূর্ত্তে আমার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতেছে,—কে আমাকে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পাতিত করিতেছে,—কোথা হইতে আবার শান্তিধারায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছে,—কেনইবা এই জীবনের অন্তে মৃত্যুর বিধান রহিয়াছে—আর মৃত্যুর সহিত আমার অস্তিত্ব সম্ভব কি অসম্ভব—এবং যাঁহারা সমস্ত জগৎ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই প্রশ্নের মিমাংসা করিয়াছেন, সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণের সন্তান, ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ মোহগ্রস্থ হইয়া ভুলিয়াও একবার আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইতেছে না। বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছে,—প্রতিদিন আপনার শক্তিহীনতা ও কর্ম্মচেষ্টার বিফলতা অনুভব করিতেছে;—প্রতিক্ষণ প্রাণের ভিতর হইতে শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিতেছে,—প্রতিক্ষণ তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া প্রবলের ভীষণ শক্তি তোমাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতেছে;—প্রতিক্ষণ তুমি সুখের আশায় উৎফুল্ল হইতেছ,—প্রতিক্ষণ তুমি নিরাশ হইয়া ভগ্নহৃদয় ও উদাস হইতেছে;—তথাপি একবার তোমার আত্মচিন্তার উদ্রেক হইতেছে না। প্রতিদিন দেখিতেছ—যাহা ভাব নাই তাহা হইতেছে,—যাহা ভাবিয়াছ তাহা ব্যর্থ হইতেছে; যাহা কর নাই তাহা করিতেছ,—যাহা করিতেছ তাহা শেষ হইতেছে; যাহা ছিলে না—তাহা হইতেছ, যাহা হইতেছ তাহা চলিয়া যাইতেছে;—প্রতিদিন প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি পতিত হইতেছ,—প্রতিক্ষণ অস্থিরতার অশান্তি তোমাকে দগ্ধ করিতেছে, তথাপি একবার তুমি মনে করিতেছ না তুমি কে, কিসে এত অধীন হইয়া রহিয়াছ—কিসে তুমি স্বাধীন হইবে এবং কিসে তোমার দুঃখের অন্ত হইবে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ শৈশব পার হইয়াই আত্মচিন্তায় আকুল হইয়া গুরু সমীপে প্রথম প্রশ্ন করিত—কোঽহং—আমি কে—আজ তাঁহাদের বংশধরগণ ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াও একবার আত্মতত্ত্বের সন্ধান লইতেছে না। গণ্ডারের কঠিন চর্ম্মভেদ করিয়া অতীব তীক্ষ্ণবাণও যেমন রক্তমোক্ষণ করিতে অসমর্থ হয়, বর্ত্তমান অশান্তি ও নিরানন্দের ভীষণ তাড়নাও তেমনি সত্য স্বার্থের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা

উদ্বোধন করিতে অসমর্থ হইতেছে। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লুব্ধ হইয়া নানা পথে ভ্রমন করিয়াও তুমি সুখশান্তিলাভের প্রকৃত পন্থা প্রাপ্ত হইতে পার নাই, কিন্তু যেই শুভক্ষণে প্রাণে প্রাণে তোমার আত্মজ্ঞানলাভের প্রবল উত্তেজনা জাগিয়া উঠিবে, সেই দিন তুমি প্রকৃত পন্থায় প্রথম পদার্পণ করিবে এবং গুরু-কৃপালব্ধ সাধন সম্বল করিয়া একদিন দুঃখাতীত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া মন্দিরের প্রাণহীন পাষাণ মূর্ত্তির নিকটে প্রহরে প্রহরে মস্তক নত করিয়া ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছ, কিন্তু সেই অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরের আনন্দময় স্বরূপ তোমার আমিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তাঁহারই বিরাটশক্তি সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী মহামায়া তোমাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তাঁহা হইতে পৃথক্-জ্ঞানীভূত করিয়া রাখিয়াছে—আর্য্য-ঋষি-গণের এই অমূল্য তত্ত্বোপদেশ যতদিন না তুমি আপনার নায়কস্বরূপে গ্রহণ করিবে,—যতদিন না তুমি সেই মহাশক্তির কৃপাভিখারী হইবে, ততদিন তোমার দুঃখের অবসান নাই,—শান্তির প্রত্যাশা নাই। একবার আপনার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া মহামায়ার শরণাপন্ন হও, তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া জননীর প্রতি বালকের ন্যায় নির্ভরসম্বল হও, প্রাণহীন পাষাণ মূর্ত্তি সজীবতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে,—সাংসারিক সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া হৃদয় তোমার প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইবে। হায়, হায়! হিন্দুসমাজ এমন দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্বের প্রকৃত পিপাসা অন্তর্হিত হইয়া কেবল হামবড়ার প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহার গৌরব স্বীকার করে না, কেহ কাহার প্রাধান্য অনুভব করে না, যে যাহার কর্ম্মহীন জীবন লইয়া বৃথা বাগাড়ম্বরে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছে। অধিকার ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একদিকে এক সম্প্রদায় যেমন জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া সাম্যস্থাপনে সচেষ্ট, আবার অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া অন্য হইতে পৃথক্ থাকিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্। হিন্দুসমাজ এই দুই ভিন্নমুখী শক্তির মধ্যস্থলে পড়িয়া কর্ম্মহীন জ্ঞানচর্চ্চার উত্তেজনায় যথেচ্ছ আহার বিহারে মগ্ন হইয়া অধঃপতিত হইতেছে। জাতীয় অবনতির মূলীভূত কারণ ব্রাহ্মণ জাতির উপরে নিক্ষেপ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কেবল অজস্র কটুবাক্য-প্রয়োগে কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, হীনতেজ ব্রাহ্মণ ঘৃণারপাত্র হইয়াও আপনার গৌরব ও মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিতেছে না। সাধনার প্রকৃত পন্থা বর্জ্জন করিয়া যে যাহার দ্বিজত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সমাজ অন্তঃসার বিস্মৃত হইয়া কেবল বহিরা-বরণে আবৃত এবং কপটাচারী হইয়া উঠিতেছে। আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুদ্রপরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া এক সম্প্রদায় জপ, তপ, দেবারাধনা প্রভৃতি অবহেলা করিয়া কর্ত্তব্যের একপ্রান্তস্থ কর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং অন্য সম্প্রদায় আপনার প্রবৃত্ত্যনুযায়ী-মার্গের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল তামসিকতায় মগ্ন হইয়া জড়ত্বকে সাত্ত্বিকতার আখ্যা প্রদান করিতেছে। হিন্দুসমাজ সহস্র সংস্কারকের সহস্র চেষ্টায় তরঙ্গায়িত হইয়া বিধ্বস্ত হইতেছে, ব্যষ্টিগত

প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করিয়া জীব আবিষ্টের মত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে; কিন্তু যে অন্তর্নিহিত দুঃখনিবৃত্তির প্রবল উত্তেজনা তাহাকে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত করিতেছে তাহার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে না। নিজকে ভুলিয়া জগতকে ধরিতে চায়, জগতকে ভুলিয়া নিজকে রাখিতে চায়, জীব মুহুর্মুহুঃ এইরূপ দোলায়মান; কিন্তু যে দুঃখনিবৃত্তির আকুল পিপাসা তাহাকে এবম্প্রকার স্পন্দিত করিতেছে, তাহার সাধন-রহস্যের ক্রমিক পন্থা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ আপনাকে অল্পের অপ্রশস্ত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ দেখিয়া আকুলকণ্ঠে চিৎকার করিয়াছেন—ইহা নহে, ইহা নহে—তাঁহাদের সন্তানগণ আজ ক্ষুদ্রতায় বদ্ধ হইয়া বিরাট আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে; জাতিভেদ, একান্নভুক্তপরিবার ও বিধবার পুরুষান্তর নিষেধ, ইহাদের ত্রিতাপ, বৈদিশিক অধিকার বর্জ্জন ইহাদের মুক্তি এবং চিরমঙ্গল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদ ইহাদের কর্ম্ম। হায়, হায়! প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কেহ বুঝিতেছে না, জীব-জগৎ-সাধনতত্ত্ব কেহ লক্ষ্য করিতেছে না, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী ক্রমিক পন্থা কেহ অবলম্বন করিতেছে না। আর্য্যঋষিগণের অমূল্য উপদেশ উপেক্ষিত হইতেছে, জীব বৃথা অহঙ্কারে বৃথা আস্ফালন করিয়া অনলমুখী পতঙ্গের মত দুঃখে নিপতিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা একবার সমাহিতচিত্তে চিন্তা করিলে প্রাণ অধীর হইয়া যায়, তাই আজ প্রাণের প্রাণ হইতে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—এই ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ঘোর অত্যাচার ও দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হইয়া আমি অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্য জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছি, কিসে আমার দুঃখের অন্ত হইবে কেহই কি বলিবে না? আমার এই আকুল ক্রন্দনের পশ্চাতে, পথভ্রান্ত পথিকের প্রতি আকাশবাণীর মত, আর্য্যঋষিগণের অভ্রান্ত তত্ত্বোপদেশ আমাকে আশ্বস্ত করিতেছে, তাহাই আমার জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহাই আমার দগ্ধহৃদয়ের শীতল ভেষজ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীযোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

———0———

উপদেশ-সংগ্রহ।

৫। যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ তখন হয় 'মন্ত্রের সাধন' না হয় 'শরীর পতন' এ দু'টার একটা করিতেই হইবে।

৬। সৈন্যগণের তালে তালে পদক্ষেপন অনেকেই দেখিয়াছেন, একজনের পা বেতালে পড়িলে অন্যেরও পদস্খলন হওয়া অবশ্যম্ভাবী; সেইরূপ কোন সম্প্রদায়ের একজন সভ্যের পদস্খলন (অর্থাৎ নিয়ম লঙ্ঘন) হইলে আদর্শ মলিন হইয়া যায়; কিন্তু একজন আদর্শ হইতে পারিলে অন্যকে অবশ্যই তাহার অনুকরণ

করিতে হইবে।

৭। সোণা যতই আগুণে পুড়ান যায় ততই তাহার খাদ বাহির হইয়া যায়। মনুষ্যের অবস্থা তদ্রূপ, যতই শোকে-দুঃখে, আপদে-বিপদে, রোগে-তাপে পুড়িতে থাকে ততই তাহার মলিনতা কাটিয়া যায়।

৮। যত আপদ-বিপদ, ঝড়-তুফান বহিয়া যাক্ না কেন, আপন লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না।

৯। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রত, পর্ব্বাদি উপলক্ষে নিয়ম সংযমপূর্ব্বক উপবাস করিবার বিধি আছে, ইহার অর্থ এই নয় যে অহোরাত্র মধ্যে জলটুকুও পান না করিয়া তাস, পাশা, দবা খেলিয়া বা পরনিন্দা, পরকুৎসা করিয়া কিম্বা নাটক নভেল পড়িয়া সময় কর্ত্তন করা; ইহার অর্থ এইযে উপ=সমীপে+বাস=ভগবান্ সমীপে বাস অর্থাৎ নিয়ম সংযম পূর্ব্বক ভগবদা-রাধণা ও ধ্যান ধারণা করিয়া সময় কর্ত্তন করা।

১০। ব্রহ্মের ত্রিবিধ বিকাশ—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি।

১১। নিজে ভাল হইবার ইচ্ছা না করিলে অন্যে কিছুতেই ভাল করিতে পারিবে না।

১২। সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা বিফল যায় না, একদিন না একদিন অবশ্যই তাহার ফল পাওয়া যাইবে।

১৩। সাধু মহাপুরুষ জ্বলন্ত অগ্নি, আর বিষয়াসক্ত শিষ্য ভিজা কাঠ।

১৪। সদ্গুরু ইঞ্জিন, সাধক গাড়ী ও জনসাধারণ যাত্রীবৎ।

১৫। স্বাধীন অর্থ=স্ব+অধীন অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় যাহার বশ তিনিই স্বাধীন।

১৬। যাহার গুরু বাক্যে শ্রদ্ধাভক্তি আছে সেই গুরুকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে।

১৭। যোগমায়া=মহামায়া+মায়া+অবিদ্যা।

মহামায়া=সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিনী শক্তি।

মায়া=যদ্বারা জীব জগৎ মোহিত আছে।

অবিদ্যা=প্রত্যেকের ভিতর যে ব্যষ্টি মায়া। অবিদ্যার সমষ্টিই মায়া।

১৮। কোন কোন ছেলে এমন আব্‌দারে হয় যে কোন জিনিসের ষোল আনা নাপাইয়া সে কিছুতেই সুখী হয় না, ভগবান্‌ও তদ্রূপ, ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব না পাইলে তিনি ভক্তাধীন হন না, যে সর্ব্বস্ব তাহাকে দিতে পারিয়াছে ভগবান্ তাহারই।

১৯। ভাবের নকল হয় না, ভাব আপনা হইতেই স্ফুরিত হয়, ভাবকে দমন করা যায় না।

২০। যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে কোন দিন ধর্ম্মের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হয় না।

২১। কার্য্যক্ষেত্রেই শক্তির বিকাশ—কায়-মনোবাক্যে কার্য্য করিলে আপনিই শক্তির বিকাশ হয়; শক্তি মুখে নয়—শক্তি মনে।

২২। জাগরণ যেমন স্বপ্নাবস্থা নিবারণের একমাত্র উপায়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

২৩। পরাভক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।

২৪। অভ্যাসকে বশে রাখিবে কিন্তু অভ্যাসের বশীভূত হইও না।

২৫। বৈষম্যই সৃষ্টির মাধুর্য্য এবং স্বাভাবিক; ইহাকে ভাঙ্গিয়া এক করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র ও মানবের সাধ্যাতীত।

২৬। সমস্ত কাজেই ভগবানের উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করিও, সর্ব্বদা মনে রাখিও তুমি চাকর মাত্র, তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, দেখিবে আপনিই কাজ গুছাইয়া আসিতেছে; কিন্তু সাবধান তোমার কর্ত্তব্যে যেন ক্রটী না হয়।

২৭। মানুষের কাছে বিচারপ্রার্থী হইও না, বিচারের মালীক ভগবান্; বিচারের প্রার্থনা করিবার দরকার নাই, আবশ্যক হইলে তিনিই প্রতিবিধান করিবেন।

২৮। যে তোমার গুরু, ইষ্টদেব, কি ধর্ম্মকে নিন্দা করে, সে তোমার ঈর্ষার না হইয়া সমধিক দয়ার পাত্র; কেন না সে তত্ত্ব বুঝে না, বুঝিলে কখনও নিন্দা করিত না; সে অজ্ঞান, অবোধ বলিয়াই দয়ার পাত্র।

২৯। কর্ত্তব্য সম্পাদনে কাহারও মুখের দিকে তাকাইও না, তাহা হইলে পতিত হইবে।

৩০। নিজকে দীনহীন করিতে না পারিলে দীননাথের দয়া হয় না, কেন না তিনি দীনের নাথ,—ধনীর নন।

(ক্রমশঃ।)

——0——

জড়ভরত-উপাখ্যান।

পরম ভাগবত ভরত ভগবানের ইচ্ছায় ধরণীর পালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহারই আদেশক্রমে বিশ্বরূপের দুহিতা পঞ্চজনীকে বিবাহ করিলেন। যেরূপ অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম-ভূতগণের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পঞ্চজনীর গর্ভে সর্ব্বপ্রকারে ভরত-সদৃশ পঞ্চ পুত্র জন্মিল। তাহাদিগের নাম সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু। পূর্ব্বে এই বর্ষের নাম 'অজনাভ' ছিল, পরে ভরত হইতেই ভারতবর্ষ বিখ্যাত হইল। সর্ব্বজ্ঞ মহীপতি ভরত রাজধর্ম্ম পরিগ্রহণপূর্ব্বক বাৎসল্যভাবে প্রজাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন, এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞময় ও ক্রতুময় যজ্ঞ করিলেন। যে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুযাগে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল, সেই সকলকেই কখন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কখন বা অঙ্গহীন করিয়া যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিলেন। তিনি চাতুর্হোত্র দ্বারাও তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। বাসুদেব পরমব্রহ্ম এবং পরমদেবতা। কারণ তিনি সর্ব্বদেবতার প্রকাশক যে মন্ত্র, তাহার অর্থভূত ইন্দ্রাদি দেবতার নিয়ন্তা, সুতরাং সকলেরই কর্ত্তা। অতএব অঙ্গক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইলে পর, যখন নানাবিধ যাগ আরম্ভ হইত এবং যখন ঋত্বিকেরা আহুতি দিবার নিমিত্ত হবিঃ গ্রহণ করিতেন, তখন যজমানরূপী রাজা, যাগ সকলের যে অপূর্ব্ব ফল

তাহা ভগবান্ বাসুদেবেই বর্ত্তমান আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া যজ্ঞভাগভোজী সূর্য্যাদি দেবতাদিগকে ঐ বাসুদেবের অংশ বলিয়াই ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাদৃশ ভাবনা-রূপ কৌশলদ্বারা তাহার রাগাদি দগ্ধ হইল, এবং এইরূপ নানাবিধ বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে তাহার চিত্তও বিশুদ্ধ হইল। তখন যে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রকাশমান রহিয়াছেন এবং যিনি পরব্রহ্ম, যিনি মহাপুরুষের আকার ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গে শ্রীবৎস কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ ও গদা প্রভৃতি চিহ্ন সকল বিদ্যমান আছে এবং যিনি নারদাদির হৃদয় মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণকরতঃ শোভা পাইতেছেন, সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিল এবং দিন দিন উহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মহারাজ ভরত, সহস্র অযুত বৎসর তাঁহার রাজ্যভোগের সীমা, ইহা নিশ্চয় জানিয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি অবলম্বনকরতঃ ততকাল পৈতৃক সম্পত্তি ভোগকরিলেন এবং অবশেষে আপন পুত্রদিগের মধ্যে ঐ সম্পত্তি যথাযথ বিভাগকরতঃ ভোগ বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরিক্ষেত্রে যাত্রাকরিলেন। হরি বাৎসল্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভক্তজনের বাসনাস্বরূপ রূপ ধারণকরতঃ ঐ ক্ষেত্রের সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। আর সরিদ্বরা গণ্ডকী উর্দ্ধ এবং অধোভাগে ঐ আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ পবিত্র করিতেছেন। রাজা ভরত ঐ আশ্রমে একাকী অবস্থিতি করিয়া ফল-মূলাদি আহারকরতঃ বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী ও বারিদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগকরতঃ নির্জ্জনে বসতি করায় দিন দিন তদীয় শমগুণের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তিনি পরম শান্তি লাভ করিলেন। ভগবানে তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, ঐ প্রকারে নিরন্তর আরাধনা করায় তাহা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাঁহার হৃদয় তাহাতেই দ্রবীভূত হইল। তদীয় অন্তঃকরণ মধ্যে যে হর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জনিত গাত্রে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং উৎকণ্ঠা নিবন্ধন চক্ষুহইতে প্রেমবারিও বিগলিত হইতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার দৃষ্টিরুদ্ধ হইয়াগেল। এই রূপে আনন্দ স্বরূপ পুরুষের রক্তবর্ণ চরণারবিন্দ নিরন্তর ধ্যান করাতে যে ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহার গম্ভীর হৃদয়-সরোবর পরমোৎকৃষ্ট আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল; বুদ্ধি সেই সরোবরে নিমগ্ন রহিল, তখন তিনি "আমি ভগবানের সেবা করিতেছি" ইহা আর অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবানের ব্রত ধারণ করিয়া রাজা ভরত মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে লাগিলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করাতে তাঁহার কুটিল জটাজাল সতত আর্দ্র থাকিত, সুতরাং উহা ক্রমে কপিশবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে আরও শোভাবৃদ্ধি হইল।

মহারাজ ভরত, একদিন সূর্য্য-প্রকাশক বেদমন্ত্রদ্বারা ভগবান্ হিরণ্ময় পুরুষের স্তব করিয়া কহিলেন, "সূর্য্যদেবের স্বরূপীভূত এই তেজঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ফলপ্রদ, কারণ পূর্ব্বে ইহা দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এক্ষণেও এই বিশ্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে গ্রাস করিতে

চেষ্টা করিতেছে। আর ইহাই জীবকে জ্ঞানশক্তি প্রদানকরতঃ পালন করে এবং বুদ্ধিকে চালনা করে। আমি এই তেজেরই শরণ লইলাম।

ভরত একদিন স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনকরতঃ প্রণব জপ করিতে করিতে তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র জল সমীপে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে এক হরিণী পিপাসাতুরা হইয়া একাকিনী সেই জলাশয়ের সন্নিকটে আগমনকরতঃ যেমন জলপান করিতে আরম্ভ করিল, অমনি অনতিদূরে এক সিংহ ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া লোকের হৃৎকম্প উৎপাদন করিল; হরিণীসকল স্বভাবতঃই চঞ্চল এবং তাহাদিগের নয়ন চকিত, তাহাতে আবার সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় সেই হরিণীর হৃদয় সমধিক ত্রাসিত হইল এবং দৃষ্টি আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতএব পিপাসা শান্তি হইতে না হইতেই সে হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া নদীপার হইল। ঐ হরিণী গর্ভবতী ছিল, সুতরাং নদী উল্লঙ্ঘন সময়ে বেগ এবং আত্যন্তিক ভয়হেতু তাহার গর্ভ ভ্রষ্ট হইয়া নদীরস্রোতে পতিত হইল। গর্ভস্রাব, উল্লঙ্ঘন-জন্য ক্লেশ এবং ভয়ে কাতর ও স্বগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া যেমন এক গিরিগুহায় পতিত হইল, মৃগী অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজর্ষি ভরত দেখিলেন, মৃগ শাবকটী স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; বান্ধবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহার মাতাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে তাঁহার মনে দয়ার আবির্ভাব হইল এবং তিনি উঁহাকে স্রোত হইতে উত্তোলন করিয়া আপনার আশ্রমে আনয়ন করিলেন। আপন আশ্রমে রাখিয়া উঁহাকে "আমার" বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অহরহঃ উঁহাকেই লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তাঁহার স্নানাদি নিয়ম, অহিংসাদি আচরণ ও ঈশ্বর-সেবা প্রভৃতি কার্য্যসকল রহিত হইয়া গেল এবং কিছুদিন পরে একেবারেই সমুদয় সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি মনোমধ্যে ভাবনা করিলেন, আহা! এই নিরাশ্রয় মৃগশাবক কাল-গতিতে স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় আমারই আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং আমাকেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সহচর বোধ করিতেছে। আমা-ভিন্ন এ আর অন্যকে জানে না। আমার প্রতিই ইহার একান্ত বিশ্বাস আছে। অতএব ইহাতে আমার স্বার্থহানি হইবে, এরূপ বিবেচনা না করিয়া অবশ্যই ইহাকে লালন, পালন, তোষণ ও পোষণ করা আমার কর্ত্তব্য। কারণ শরণাগত জনের অনাদর করিলে যে পাপ হয়, তাহা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। নিরাশ্রয়ের বন্ধু, উপশমশীল সাধুরাও এরূপ কার্য্যে স্বার্থত্যাগ করেন।

মহারাজ, এইরূপ আসক্ত হওয়াতে, তাহার হৃদয় মৃগশাবকের প্রতি স্নেহে পরিপূর্ণ হইল। তজ্জন্য তিনি কখন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন না। উপবেশন, শয়ন, ভ্রমন, স্নান ও আহারাদি সকল সময়েই তাহাকে নিকটে রাখিতেন। যখন কুশ, কুসুম, সমিধ, পত্র, ফল ও জল আহরণ করিবার নিমিত্ত বনমধ্যে গমন করিতেন, তখন পাছে বৃক ও কুক্কুরাদি হিংস্র জন্তু সকল তাহাকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করে, এই ভয়ে মৃগশাবককে

সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। রাজা এইরূপে কখন ক্রোড়ে কখন বক্ষস্থলে করিয়া লালন পালন করতঃ পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। আরব্ধ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইতে না হইতেই মধ্যে মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া হরিণ শাবককে দেখিতেন। যদি তাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলেই তাহার চিন্তা পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত। তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতেন, সর্ব্বস্থানেই তোমার মঙ্গল হউক। কিন্তু যদি উঁহাকে দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে একবারে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। যেরূপ ধন নষ্ট হইলে কৃপণ ব্যক্তি কাতর হইয়া পড়ে, সেইরূপ হরিণ শিশুর বিরহে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তজ্জন্য দারুণ সন্তাপে তাপিত হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইতেন, "অসহায়, আমি অতি অভদ্র ও হত-ভাগ্য, আমি অতি শঠ ও ব্যাধের ন্যায় নিষ্ঠুর! মৃত হরিণীর নিরাশ্রয় শাবকের চিত্ত অতি বিশুদ্ধ, তজ্জন্যই সে আমাতে বিশ্বাস করিয়াছে। সে কি, সুজনের ন্যায় আমার দোষ সকল গণনা না করিয়া আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে? আহা! আমি কি তাহাকে আর দেখিতে পাইব যে, সে দেবতা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া নূতন তৃণ ভক্ষণকরতঃ এই আশ্রমের উপবনে বিচরণ করিতেছে। এমন কি ঘটিবে যে, বৃক, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসকল তাহাকে এখনও ভক্ষণ করে নাই! যাহার উদয়ে যাবতীয় লোকের মঙ্গল হয়, সেই বেদমূর্ত্তি ভগবান্ সূর্য্যদেব ঐ অস্তা-চলে গমন করিতেছেন, কিন্তু হরিণী আমার নিকট যাহাকে ন্যাস স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে, সে অদ্যাপি প্রত্যাগমন করিতেছে না! আহা! সেই হরিণ রাজকুমার প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক বিবিধ মনোহর দর্শনীয় ক্রীড়াদ্বারা আত্মীয়জনের সন্তোষ উৎপাদন-করতঃ এই অকৃতপুণ্য মন্দভাগ্যকে কি সুখী করিবে? কারণ ক্রীড়ার সময় আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিয়া থাকিতাম, তখন সে প্রেমভরে সচকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকরতঃ জল-বিন্দুর ন্যায় কোমল শৃঙ্গাগ্র দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিত! আর যখন সে চর্ব্বণাদি দ্বারা যজ্ঞসম্পৃক্ত কুশ দূষিত করিত, তখন আমি তাহাকে তিরস্কার করিতাম, তাহাতে সে সাতিশয় ভীত হইয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ করিত এবং ঋষিকুমারের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিত! অহো! এই ভাগ্যবতী ধরিত্রী বিনীত কৃষ্ণসার তনয়ের সূক্ষ্ম সুন্দর ও কোমল ক্ষুর চিহ্ন দ্বারা মৃগবিরহ-কাতর আমাকে সেই মৃগেরই পদবী প্রদর্শন করিয়া দিতেছেন এবং তদ্দ্বারা ভূষিত হইয়া আপনাকেও স্বর্গ ও মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞভূমি করিতেছেন। জানিনা, ইনি কি তপস্যা করিয়াছিলেন! নিরাশ্রয় মৃগবালক আশ্রম হইতে বিপথে গমন করিতেছিল দর্শন করিয়া বুঝি দীনবৎসল শ্রীভগবান্ চন্দ্র দয়া করিয়াই তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। মৃগী তনয়, আমার একান্ত অনুগত, আমি তাহাকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করি, সেইহেতু তাহার বিরহ-জ্বর রূপ দাবাগ্নির শিখায় আমার হৃদয়রূপ-স্থলপদ্ম দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে নিশানাথ বুঝি আমার প্রতি অনুরাগ করতঃ অমৃতময় কিরণকে অধিকতর শান্ত ও সুশীতল করিয়া, মুখ-বারির ন্যায়, গাত্রে প্রক্ষেপকরতঃ আমার

তাপ শান্তি করিতেছেন।”

যোগ-তাপস ভরত এইরূপ অলৌকিক চিন্তা-দ্বারা ব্যাকুল হইয়া যোগ সাধন হইতে বিরত হইলেন এবং মৃগশাবকের ন্যায় তিনিও আপন কর্ম্মদোষে এই প্রকার ভ্রষ্ট হইলেন; তাহা-না হইলে সুদুস্ত্যজ্য ঔরসপুত্রদিগকে মোক্ষ-মার্গের সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকবোধে পরিত্যাগ করিয়া হীনজাতি হরিণ শিশুতে তাঁহার এরূপ আসক্তি জন্মিবে কেন? যাহাহউক এরূপ বিঘ্ন দ্বারা যোগানুষ্ঠান নষ্ট হইলে পর রাজর্ষি ভরত আত্মচিন্তা হইতে নিবৃত হইয়া মৃগশাবকে-রই লালন পালনে ব্যাপৃত ছিলেন, ইত্য-বসরে যেরূপ সর্প মুষিকের গর্ত্তে প্রবেশ করে সেইরূপ ভীমবেগ দুরতিক্রমনীয় মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন মৃগ-শিশু পুত্রের ন্যায় তাহার পার্শ্বে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজর্ষির চিত্ত তখনও সেই মৃগশিশুতেই আকৃষ্ট ছিল, অত-এব তিনি তাহাকে দেখিতে দেখিতেই দেহ-ত্যাগ করিলেন এবং মৃগত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বের সাধনবশতঃ তাঁহার যে প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বলে তিনি জাতিস্মর হইলেন। অতএব আপনার মৃগত্ব লাভের কারণ স্মরণ করতঃ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন “হায় কি কষ্ট! আমি ধীর জনের পন্থা হই[illegible]ষ্ট হইলাম! কারণ আমি সংসার পরিত্যাগ করতঃ নির্জ্জন পুণ্যা-শ্রমে অবস্থিতি করিয়া ধীর হইয়াছিলাম এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবর গুণগান-শ্রবণ, নাম-সংকীর্ত্তন ও তাহাকে চিন্তাকরতঃ সময় অতিবাহিত করিয়া মনকে তাঁহাতেই নিবিষ্ট ও সম্যকরূপে সুস্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু অবশেষে মন তাহা-হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অতিদূরে মৃগশাবকের অনুগমন করিল।”

মৃগত্বপ্রাপ্ত ভরতের মনে মনে এইরূপ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া জননী মৃগীকে পরিত্যাগ করতঃ কালঞ্জর পর্ব্বত হইতে ভগবৎক্ষেত্র পুলহাশ্রমে যাত্রা করিলেন। ঐ আশ্রম শালবৃক্ষে সুশোভিত এবং শান্তপ্রকৃতি মুনিগণের প্রিয় স্থান ছিল। সেইস্থানে পাছে আবার সঙ্গদোষ ঘটে, এইভয়ে রাজর্ষি ভীত হইয়া শুষ্ক পত্রাদি ভক্ষণকরতঃ একাকী অবস্থিতি করিয়া, কবে মৃগত্বপ্রাপ্তির কারণ বিনষ্ট হইবে, সেই সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন সেই কাল উপস্থিত হইল, তখন তত্রত্য তীর্থজলে দেহার্দ্ধ নিমগ্ন করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেন।

কিছুদিনপরে অঙ্গিরস গোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোনব্যক্তি শম, দম, বেদাধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মসম্পত্তি ও আনন্দসম্পন্ন ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নয়টী সন্তান জন্মিল। ঐ নয় সহোদর শাস্ত্রজ্ঞান, শীলতা, আচার, রূপ, গুণ ও ঔদার্য্যে পিতার সমান হইলেন। ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা ভার্য্যার গর্ভে যমজ পুত্র-কন্যা জন্মিল। কিংবদন্তী আছে, পরম ভাগ-বত, রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ-ভরত মৃগশরীর পরিত্যাগ করতঃ চরমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বিপ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

জড়ভরত-উপাখ্যান।

(জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ভরত ভগবানের অনুগ্রহে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-সকল বিস্মৃত হন নাই, অতএব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পাছে স্বজনগণের সঙ্গহেতু পুনর্ব্বার আত্মচিন্তার ব্যাঘাত ঘটে', এই ভয়ে, যে ভগবানের কীর্ত্তিশ্রবণ, গুণকীর্ত্তন এবং যাঁহাকে স্মরণ করিলে কর্ম্মজন্য বন্ধন দূরীভূত হয়, মনোমধ্যে তাহার চরণযুগল ধ্যান করিতেন, কিন্তু লোকের সমক্ষে আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ, বধিরের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় পুত্রস্নেহে বদ্ধ ছিল, অতএব তিনি শাস্ত্র-ব্যবস্থানুসারে ঐ জড় পুত্রের ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার সম্পাদন করিতে মানস করিয়া তাঁহার উপনয়ন দিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে শৌচ, আচমন প্রভৃতি অভ্যাস করাইতে লাগিলেন, কারণ পিতার নিকটেই পুত্র অবশ্য উপদিষ্ট হইবে। কিন্তু পিতা যাহাতে শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করেন, এই ভাবিয়া পুত্র নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা ভবিষ্যতে তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইতে অভিলাষ করিয়া বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে তাঁহাকে প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত ত্রিপাদ গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিন চারি মাস মধ্যেও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সন্তান আপনার স্বরূপ, অতএব অনুরাগবশতঃ ব্রাহ্মণের চিত্ত সন্তানেই অভিনিবিষ্ট ছিল। আর সন্তানকে শিক্ষা দান-করা দ্বিজ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেন। সুতরাং নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচারীর যে শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম এবং গুরু ও অনল শুশ্রূষাদি যে কার্য্য তাহা

যথেষ্ট আগ্রহপূর্ব্বক সন্তানকে শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আগ্রহই বিফল হইল এবং পুত্র পণ্ডিত হইবে বলিয়া তাঁহার যে আশা ছিল, তাহাও ফলবতী হইল না। যাহাহউক, দ্বিজ এইরূপে কাল-যাপন করিতেছেন, এ দিকে মৃত্যু আগমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী আপন কন্যা-পুত্রকে সপত্নীহস্তে সমর্পণ করিয়া সহমৃতা হইলেন। ভরতের ভ্রাতৃগণ বেদবিদ্যাই জানিতেন, আত্মবিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা ভরতের প্রভাব জানিতে পারেন নাই, অতএব পিতা পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহারা ভরতকে বুদ্ধিহীন ভাবিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য হইলেও তদ্বিষয়ে উদাসীন হইলেন।

নীচ প্রকৃতি মানবগণ মধ্যে যে, যখন ভরতকে দেখিত, সেই উন্মত্ত, জড়, বধির বা মূক বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিত, তিনি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই প্রত্যুত্তর দিতেন। কেহ কর্ম্ম করাইলে তাহারই ইচ্ছায় কর্ম্ম করিতেন। বিষ্টি (বেগার) বৃত্তি বা যাচ্ঞা দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন অথবা যদৃচ্ছাক্রমে কোথাও হইতে যৎকিঞ্চিৎ কদর্য্য খাদ্য প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহাই আহার করিতেন, কিন্তু তাহাতে যে ইন্দ্রিয়ের প্রীতি জন্মিবে, ইহা একবারও মনে করিতেন না। কারণ তিনি আনন্দময় আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ ও স্বয়ম্ভু বলিয়া জানিতেন এবং মান অপমান জন্য সুখ দুঃখ বোধ করিতেন না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বাত, কি বর্ষা, সকল কালেই অনাবৃত অঙ্গে, বৃষের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও অঙ্গ বলিষ্ঠ ছিল। ভূমিশয়ন এবং স্নানাদি অঙ্গ মার্জ্জন-রহিত-হেতু তাঁহার গাত্রে যে মলা জন্মিয়াছিল, তদ্দ্বারা মলিন মণির ন্যায় তাঁহার তেজঃ-পুঞ্জ প্রকাশ পাইত না। কটিদেশে একখণ্ড কদর্য্য চীরবস্ত্রমাত্র বেষ্টন ছিল। যাহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিত না, তাহারা তাঁহার যজ্ঞ-সূত্র অতি মলিন দেখিয়া তাঁহাকে কখন সদ্‌-ব্রাহ্মণ কখন বা পতিত বলিয়া বোধ করিত। যখন তিনি পরের কর্ম্ম করিয়া বেতন দ্বারা ভোজ্য আহরণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারাই তাঁহাকে ক্ষেত্রকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। তিনি তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু ক্ষেত্রকর্ম্ম কিছুই বুঝিতেন না। ভ্রাতৃগণ তণ্ডুলকণা, খই, তুষ, কীট-দষ্ট কলাই—ও দগ্ধ অন্ন প্রভৃতি যাহা কিছু প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই, অমৃতের ন্যায় আহার করিতেন।

কিছুকাল পরে এক চৌর রাজপুত্র প্রার্থী হইয়া ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দিতে উদ্‌-যোগ করিয়াছিল; দৈবক্রমে ঐ নরপশু বন্ধন-মুক্ত হইয়া পলায়ন করে। উহার রক্ষকেরা উহাকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু একে নিশীথ কাল, তাহাতে আবার নিবিড় অন্ধকার, পশুটীকে দেখিতে পাইল না; ভ্রমন করিতে করিতে অকস্মাৎ উক্ত ক্ষেত্রে (যেখানে ভরত কর্ম্ম করিতে-ছিলেন) উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অঙ্গিরস-গোত্রজদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র মৃগ ও বরাহাদি পশু সকল হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিতে বীরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। অনন্তর বিশেষরূপে দর্শন করিয়া তাহারা

জানিতে পারিল যে, ইনিও বলিদানের উপযুক্ত একটী নরপশু; ইহাঁর দ্বারাই স্বামীর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভরতকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করতঃ সানন্দে চণ্ডিকা-মন্দিরে লইয়া গেল। অনন্তর চৌরগণ আপনাদিগের বিধানানুসারে ভরতকে স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল এবং মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা বেশভূষা করাইয়া ভোজন করাইল। অবশেষে ধূপ, দীপ, পুষ্প, নূতন পত্র, দূর্ব্বাঙ্কুর ও ফলাদি উপহার দ্বারা হিংসা-বিধিবিহিত পূজা সমাপনকরতঃ মৃদঙ্গ এবং প্রণবের বাদ্যসহ উচ্চৈঃস্বরে গীত ও স্তুতি-পাঠ করিয়া নরপশুকে ভদ্রকালীর পুরোভাগে উপবেশন করাইল। যে ব্যক্তি চৌররাজের পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে ঐ নর-পশুর শোণিতরূপ মদ্যে ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত এক ভীষণ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিল।

সর্ব্ব ভূতের বন্ধু সুতরাং অবিরোধী, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মর্ষিনন্দনের বধ, লৌকিক হত্যা-বিধিরও অননুমত। কিন্তু চৌরগণের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন ছিল এবং ধনমদে মত্ত হওয়ায় তাহাদিগের চিত্ত দূষিত হইয়াছিল; সুতরাং ভগবানের অংশযুক্ত ব্রাহ্মণকুলকে অবজ্ঞাকরতঃ স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল এবং হিংসাই তাহাদিগের আনন্দের বিষয় ছিল। এই সকল কারণেই তাহারা এইরূপ নিদারুণ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে ভদ্রকালীর দেহ ব্রহ্মতেজ দ্বারা সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল। অতএব দেবী সহসা প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। আত্যন্তিক রোষাবেশজন্য বেগে তাঁহার ভ্রুকুটী শাখা চালিত, কুটিল দংষ্ট্রা বহির্গত এবং রক্তবর্ণ নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার বদন দেখিতে অতি ভীষণ হইল। তিনি যেন এই জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত অট্টহাস-সম্বলিত ভীমনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতিবেগে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই পাপীষ্ঠ দুষ্ট দস্যুগণের মস্তক তাহাদিগেরই সেই অসি দ্বারা ছেদন করিলেন। সেই সকল ছিন্নস্কন্ধ হইতে যে শোণিত ধারারূপ উষ্ণ মদ্য নির্গত হইতে লাগিল, দেবী আপন সহচরদিগের সহিত তাহা পানকরতঃ মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং মস্তক লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। মহৎ ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার-রূপ অপরাধ করিলে তাহা অত্যাচারকর্ত্তার আপনার প্রতিই সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া থাকে। যে সকল ভগবদ্ভক্ত পরমহংসেরা দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় গ্রন্থি ছেদন করিয়াছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বভূতের মিত্র ও আত্মা, যাঁহারা কাহারও অপকার চেষ্টা করেন না, যাহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ভদ্রকালী প্রভৃতি নানারূপ ধারণকরতঃ অপ্রমত্ত কালরূপ চক্র দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা ভগবানের সর্ব্বভয়নাশক পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা যে আপনাদিগের শিরশ্ছেদন কাল উপস্থিত হইলে, ভরতের ন্যায়, সুস্থিরচিত্তে অবস্থিত করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

অনন্তর একদিন সিন্ধু-সৌবির-দেশাধিপতি রাজা রহূগণ শিবাকরোহণে গমন করিতে করিতে ইক্ষুমতি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার বাহকেরা অপর একটী

বাহকের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরতকে দেখিতে পাইল এবং মনে করিল,—দৈব আপনিই তাঁহাকে তাহাদের সমীপে আনিয়া দিলেন। যাহাহউক, বাহকেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ হৃষ্ট-পুষ্ট ও দৃঢ়াঙ্গ দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিল,—এই পুরুষটা গো এবং গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহনকরিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ বিবেচনাকরতঃ তাঁহাকে লইয়া গেল এবং ইতিপূর্ব্বে বলদ্বারা যে আর কয়েকটা বাহক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিয়া দিল। ভরত তাদৃশ কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র না হইয়াও শিবিকাবহন করিয়া চলিলেন। পাছে প্রাণীহিংসা হয়, এইভয়ে যতদূর পর্য্যন্ত বাণ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, ভরত সম্মুখভাগে ততদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পাদক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার গতি অন্যান্য বাহকদিগের সহিত সমান হইল না। কাজেই শিবিকা এরূপ বিষম হইয়া চলিতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে রাজা রহূগণ বাহকদিগকে কহিলেন, "বাহকগণ! সকলে সমান হইয়া চল্, শিবিকা এরূপ বিষমভাবে বহন করিতেছিস্ কেন?" বাহকেরা প্রভুর এই প্রকার তিরস্কার বাক্য শ্রবণকরতঃ দণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া নিবেদন করিল, "নরনাথ! ইহাতে আমাদিগের অনবধানতা কিছুমাত্র নাই। আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ভালরূপেই চলিতেছি; কিন্তু এইব্যক্তি এইমাত্র নিযুক্ত হইয়াও দ্রুতগমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব আমরা ইহার সহিত একত্র চলিতে পারিতেছি না।"

দলের মধ্যে একজনের দোষ থাকিলে তাহাতে নিশ্চয়ই দলস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই দূষিত করে। রাজা রহূগণ দীনবাহকদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সাধুজনের সেবা করিতেন, কিন্তু স্বভাবের বশীভূত হওয়ায় তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। আর তৎকালে ভরতের ব্রহ্মতেজও অস্পষ্ট ছিল, অতএব রাজা ক্রোধপূর্ব্বক ভস্মাচ্ছাদিত পাবক-তুল্য মলিন ব্রাহ্মণকে সম্বোধনকরতঃ উপহাস করিয়া কহিলেন,—"কি কষ্ট! ভাই তুমি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছ! আহা একাকীই অনেকদূর বহন করিয়া আসিলে! তোমার দেহটী ত বড় স্থূল নহে! অঙ্গগুলিও দৃঢ় নহে, জরায় যে আক্রান্ত হইয়াছে! কই,—না এই সকল বাহকেরা ত তোমার সঙ্গে আসে নাই।"

রাজা রহূগণ এই প্রকার নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি করিলেন, কিন্তু ভরত বুঝিতে পারিলেন যে তিনি চরমে যে ব্রাহ্মণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ভূত-প্রপঞ্চ মাত্র এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ ও পাপ পুণ্য এবং অন্তঃকরণাদি সমস্তই মায়াদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তাহার প্রতীতি ছিল। অতএব তিনি সেই নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ। এইহেতু রাজা রহূগণের পূর্ব্বোক্ত উপহাস-বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। শিবিকা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অসমান দেখিয়া রাজা রহূগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,— "ওরে! তুই কি জীবন্মৃত? আমি তোর স্বামী, তুই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া আমার অপমান করিতেছিস্? তুই বড় অসাবধান, দাঁড়া যেরূপ যম দণ্ডহস্তে করিয়া লোকদিগকে

শাসন করেন, সেইরূপ তোর শাস্তি করিব। তাহাহইলে এখনই সাবধান হইবি।

আপনাকে পণ্ডিত ও রাজা ভাবিয়া রহুগণের অহঙ্কার ছিল। সেই অহঙ্কার রজ এবং তমোগুণের সহযোগে বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর যোগেশ্বরেরা কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ভূপতি তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই তিনি ভগবানের মনোমত আবাস স্বরূপ ভরতকে শেষোক্ত প্রকার কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ ভরত ব্রহ্মের স্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বভূতের মিত্র ও আত্মা ছিলেন। অতএব তাহার অহঙ্কারাদি কিছুই ছিল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে কহিলেন, বীর! তুমি উপহাস করিয়া আমাকে যাহা কহিলে সে সকলই সত্য, কিন্তু তাহা উপহাসের বিষয় নহে, কারণ যদি সত্যই ভার বলিয়া থাকিত, অথচ দেহকে তাহা বহন করিতে হইত, আর তাহা আমারই দেহের মধ্যে থাকিত এবং যদি গমনকর্ত্তার গন্তব্যপথও থাকিত, তাহা হইলে তোমার বাক্য বলা যাইতে পারিত। মহারাজ! পণ্ডিতেরা চৈতন্যকে স্থূল বলেন না, ভূতগণের সমষ্টি রূপ দেহকেই স্থূল বলা যায়। স্থূল, কৃশ, ব্যাধি আধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহংবুদ্ধিজন্য গর্ব্ব এবং শোক এসকল দেহাভিমানের বিষয়। আমার দেহাভিমান নাই, অতএব উক্ত বিষয় সকলের একটীও আমার নাই। রাজন্! কেবল আমিই জীবন্মৃত নহি, ভৌতিক পদার্থ মাত্রেই জীবন্মৃত, অর্থাৎ যাহার আদি ও অন্ত আছে সেই সকল বস্তুই জীবন্মৃত। হে রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার ভৃত্য বটে এবং তুমিও আমার প্রভু, কিন্তু কিছুদিন পরে যদি তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও এবং আমি রাজা হই তাহা হইলে আবার ঐ ভাবের বিপরীত হইয়া উঠে। অতএব কে স্বামী কে ভৃত্য তাহার কোন স্থিরতা নাই। যদি তাহা নিশ্চয় থাকিত তাহা হইলে "আদেশ" ও "কার্য্য" এই দু'য়ের ব্যবহার উচিত মত হইতে পারিত। কেবল নাম-মাত্র প্রভু আর ভৃত্য, ইহার স্থিরতা কিছুই নাই। যাহাহউক, যদি প্রভু বলিয়া তোমার অভিমান হইয়া থাকে; আজ্ঞাকর কি করিব। বীর! আমি উন্মত্ত ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করি বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমি ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া আছি, অতএব দণ্ড বা শিক্ষাদান করিয়া কি হইবে? যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া তুমি আমাকে যথার্থই জড় এবং উন্মত্ত বোধ কর; তাহা হইলেও আমাকে দণ্ড করা পিষ্টপেষণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

শমগুণবিশিষ্ট মুনিবর ভরত দেহে নিজ আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় করিতেছিলেন। তিনি পূর্ব্বেরমতই রাজার শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। রাজা রহুগণ ব্রাহ্মণের অহঙ্কারশূন্য নানা যোগগ্রন্থ-সম্মত-বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং "আমি রাজা" এই অভিমান পরিত্যাগকরতঃ ব্রাহ্মণের পদমূলে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি কে? প্রচ্ছন্ন বেশে ভ্রমন করিতেছেন কেন? দেখিতেছি আপনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়ায়াছেন, আপনি কি ব্রাহ্মণ?

না ঋষিদিগের মধ্যে কোন অবধূত? আপনি কাহার সন্তান, আপনার নিবাস কোথায়? আমাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে আসিয়াছেন কি? আপনি কি কপিল ঋষি? ইন্দ্রের বজ্র, ত্রিলোচনের শূল অথবা যমের দণ্ডকেও আমি ভয় করি না, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, এবং কুবেরের অস্ত্রও আমার ভয়ের বিষয় নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অবমাননাকে আমি সাতিশয় ভয় করি। অতএব আপনি আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করুন। আপনি স্বীয় বিজ্ঞানরূপ প্রভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যদিও নির্লেপ ও জড়ের ন্যায় ভ্রমন করিতেছেন বটে, কিন্তু আপনার অনন্ত মহিমা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। কারণ আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, আমাদিগের মনও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ! সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানশক্তি দ্বারা কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়াছি,—আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণের চূড়ামণি স্বরূপ যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি যে, সংসারে মুক্তির উপায় কি? বোধ হইতেছে, আপনিই সেই কপিলদেব, লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত স্বীয় চিহ্ন গোপন রাখিয়া ভ্রমন করিতেছেন। মূঢ়গতি মানুষদিগের বুদ্ধি সংসারে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অহো! তাহারা আপনাদিগের গতি কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে? সাধো! আমি জানি যে, কর্ম্ম করিলে শ্রম হয়। তাহাতেই অনুমান করিতেছি যে, ভারবহন করিয়া আপনার শ্রান্তি হইয়াছে। আপনি বলিলেন,—এই দেহ প্রপঞ্চ কেবল নামমাত্র, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কারণ সেই প্রপঞ্চের কার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেখুন ঘট না হইলে জল আনয়ন করা যাইতে পারে না। প্রথমে অগ্নুত্তাপে অগ্নির স্থালী উষ্ণ হয়, পরে তদভ্যন্তরস্থ দুগ্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠে; শেষে দুগ্ধের তাপে অভ্যন্তরস্থ তণ্ডুল অন্নে পরিণত হয়। এইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়াতে, উপাধি অনুসারে জীবেরও সংসার হইয়া থাকে। স্বামী ও ভৃত্যভাব অনিশ্চিত বটে, তথাপি তিনি যতদিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ততদিন তাহাকে অবশ্যই প্রজাপালন করিতে হয়, কাজে কাজেই ভিন্ন ভাব হইয়া উঠে। আর, যে ব্যক্তি অচ্যুতের সেবক, তাহার পক্ষে পিষ্টপেষণ কদাপি সম্ভব নহে, কারণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালনকরতঃ তিনি অচ্যুতের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে বরং তাহার পুণ্যই হইয়া থাকে। অতএব যদিও আমি জড়ের দণ্ড করিয়া বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে না পারি, তথাপি অসাবধানের দণ্ডকরতঃ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অবশ্যই পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিব।

প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি রাজমদে মত্ত হইয়া সাধুর অবমাননা করিয়াছি। অতএব হে দীনবন্ধো! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমি সাধুর অবহেলনরূপ পাতক হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহা করুন। আপনি বিশ্বের বন্ধু, সুতরাং সকলকেই সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। দেহকে আত্মা বলিয়া আপনার অভিমান নাই, অতএব আপনার ক্রোধোদ্রেকেরও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তি সাক্ষাৎ-শূলপাণির ন্যায় ক্ষমতাশালী হইলেও মহতের অবমাননারূপ স্বীয় কর্ম্মদোষে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। (ক্রমশঃ।)

—:0:—

সে।

তার সুনীল চরণে
যুগল নূপুর,
মরি ! কি সুষমা তায়,

তার ক্ষীণ কটি হ'তে
পীতবাস খানি,
নামিয়া লুটিছে পায়,

তার অগুরু লিপ্ত
হৃদয় উপরে,
বনফুল হার শোভে,

তার ভুবন মোহন
বদন কমলে,
জোটে অলি মধুলোভে।

তার ইন্দীবর-প্রায়
নয়ন যুগল
কি শোভা বিকাশে, মরি !

তার চাঁচর কুন্তল
শ্রবণ চুমিয়া
পড়িছে অংসোপরি।

তার শিরে শিখি-পাখা
আধ বামে হেলা,
করেতে মোহন বাঁশী.

তার বামেতে কিশোরী
আলো করি ধরা—
অধরে মধুর হাসি।

তারে বারেকের তরে
চাহিয়া দেখিতে
নয়ন ফিরানু আমি,

মোর মিটিল না সাধ
দেখিয়া দেখিয়া
তাহারে, দিবস যামি,

তারে হৃদয়ের মাঝে
বসায়ে যতনে,
দেখিতে বাসনা করে,

সে কি নিঠুর হইবে ?
ভাঙ্গা হৃদে মম
আসিবে না চিরতরে ?

———0———

প্রেমে-সমাধি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নদীয়া,—পুণ্যভূমি, রত্নপ্রসবিনী নদীয়া, প্রেমের রাজ্য—ভাবের রাজ্য নদীয়া। যে নদীয়ার ভাবকল্পতরুমূলে দুই ভাবের দুইটী ফল পড়িয়াছিল, এ সেই নদীয়া। যে স্থান চৈতন্যদেবের প্রেমস্পর্শে প্রেমময় হইয়া রহিয়াছে, এ সেই স্থান। পাঠক, অবনত-মস্তকে এ স্থানকে প্রণাম কর, চৈতন্যদেবের পদরজঃ এখানে রহিয়াছে। যাহা জগতের কোন স্থান পায় নাই,—যাহা জগতের কোন জাতি পায় নাই, সেই প্রেম,—সেই নদীয়া—

সেই চৈতন্যদেব তোমরা পাইয়াছ। ধন্য তোমরা, আর ধন্য তোমাদের সোণার বঙ্গভূমি।

সেই নদীয়ার পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে হরিপ্রাণের জন্ম। হরিপ্রাণ আচারশীল ব্রাহ্মণ। বিংশ-শতাব্দীর ব্রাহ্মণ নামধারী বলিয়া কেহ ইহাকে মনে করিবেন না; তখনকার লোক অসত্যকে বড় ভয় করিত; জীবনপণ করিয়াও সত্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিল। মুখে ও নামে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া শূদ্রের ন্যায় আচরণ করাও সত্যের গোপন ভাবিয়া, তাঁহারা বেদোক্ত আচারব্যবহারে ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতেন। তবে, কেহ শাস্ত্রের ভয়ে রাখিতেন, আর কেহ বা প্রাণের টানে রাখিতেন। হরিপ্রাণকে জনসাধারণ হরুঠাকুর বলিয়া ডাকিত; এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভক্তি করিত। হরিপ্রাণের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণধন। সে কৃষ্ণনগর কলেজে বি, এ, পড়িত। ইংরেজীর আদর তখন বড় বেশী ছিল গ্রামে দুই একজন ইংরেজীনবিশ লোক থাকিলে তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বড়ই সম্মান করিত। হরিপ্রাণ তাই তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কৃষ্ণনগরে ইংরেজী পড়াইতেছেন।

হরুঠাকুর শাক্ত, শিষ্যসেবকও কম ছিল না। সংসার সুখেই চলিয়া যাইত, টাকা পয়সার কখনও অভাব হইত না। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে; গায়ে এখনও যথেষ্ট বল আছে। প্রতিদিনই প্রাতঃস্নান করেন; সন্ধ্যাহ্নিকেই প্রায় এক প্রহর বেলা হয়; তারপর বিষয়কর্ম্ম করেন। দয়ার শরীর, দরিদ্র কিছু চাহিয়া বিমুখ হইত না; যথাসাধ্য দান করিতেন।

ঘরে লোক জন বড় কম। সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র,—সেও বিদেশে থাকে। এক পুত্রবধূ, আর স্ত্রী। বধূর নাম মহামায়া আর স্ত্রীর নাম দুর্গাবতী।

আজ বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী; মহামায়া ভোরে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিয়াছে। বাড়ী হইতে গঙ্গা বড় বেশী দূরে নহে, তাই স্নানকরিতে একাই গঙ্গায় চলিয়াছে। আপন মনে ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কি এক চিন্তায় আজ তাহার প্রাণ পূর্ণ,—কি এক আবেশে আজ তাহার শরীর অবশ,—অঙ্গ শিথিল,—হৃদয় আত্মহারা। চলিতে চলিতে কতবার পদস্খলন হইয়াছে, তবুও ভাবনার বিশ্রাম নাই,—চিন্তার শান্তি নাই। কেবলই চিন্তা,—প্রাণ চিন্তায় তন্ময় হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বেশ বুঝাযায় যেন তাহাতে আর সে নাই, সে যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে;—যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে। কেন যেন তাহার মনে হইতেছে, সে শিবশক্তি।—তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা করিতেছে। বর্ত্তমান স্বামী পূর্ব্বজন্মে যেন তাহার ভক্ত ছিল। ভক্তের কঠোর সাধনায় তাহার আসন টলিয়াছিল; সে আসিয়া বর দিতে চাহিলে, তাহার বর্ত্তমান স্বামী যেন তাহাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিল। সে সেই বর দিতে অক্ষম হইয়া বলিয়াছিল "এ জন্মে হইবে না, পরজন্মে আমায় তুমি পত্নীরূপে পাইবে"। তাই সে এজন্মে মহামায়া নাম ধরিয়া কৃষ্ণধনের সেবা করিয়া গেল।—

আবার মনে হইল,—আজই তাহার জীব-

নের শেষ; আজই তাহাকে এ মরধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিতে হইবে। এ স্বামীর সেবা শেষ হইয়াছে; আবার সেই স্বামীকে,—সেই জগতের স্বামীকে সেবা করিতে হইবে। তিনি আজ তাহাকে ডাকিয়াছেন,—তাই আজ তাহাকে যাইতে হইবে।

নদীয়ার পাদমূল বিধৌতকরিয়া গঙ্গা কুলু-কুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামের স্বর্গীয়সৌন্দর্য্য নদীর সৌন্দর্য্যে মিলিত হইয়া ভূতলে যেন দ্বিতীয় স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রামবাসীর পবিত্রতা, প্রাণের কোমলতা, সরলতা ও হৃদয়ের মাধুরী যেন গঙ্গার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে, সেই ছল ছল কল কল সঙ্গীতে, সেই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া খেলিয়া খেলিয়া এক অভূত-পূর্ব্ব নূতন ভাবের রচনা করিয়াছে। সে ভাব, সে সৌন্দর্য্য, আর কোথাও যেন হয় না, এক নদীয়ার প্রেম-গঙ্গাতেই যেন তাহা ছিল।

আজ মহামায়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গঙ্গার সেই প্রেমভঙ্গী নয়নগোচর করিতেছে। আজ যেন গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম,— ছল-ছল উচ্ছল সঙ্গীতে প্রেম,—তর তর স্রোতে প্রেম বহিয়া চলিয়াছে। তীরভূমির 'তমাল তালী নীলাবনরাজিতে প্রেম,—গুল্মলতা, পুষ্প পাতায় প্রেম,— গঙ্গাবক্ষে সৌরকররাশির অদ্ভূত নর্ত্তনে প্রেম,— জ্যোতিরুদ্ভাসিত ক্ষীণ রজতরেখায় প্রেম,—সকল স্থানেই প্রেম,— কেবলই প্রেম,—কেবলই প্রেমের লীলাখেলা। আর মহামায়া সংসার ভুলিয়া,—অসার আমিত্ব ভুলিয়া,—প্রেমাসক্ত হইয়া গঙ্গাতীরে ধ্যান-নিমিলিত নেত্রে উপবিষ্টা। বেলা বাড়িয়া গেল, হরিপ্রাণের চিন্তা হইল, বৌ গিয়াছে গঙ্গার ঘাটে। অনেকক্ষণ হইল, কৈ সে তো আর ফিরিল না।

হরুঠাকুরের পাড়াপ্রতিবাসিরাও এ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত গঙ্গারঘাটে ছুটিয়া গেল।

কি দেখিল?—দেখিল সেই সোণার প্রতিমা, রূপে গঙ্গার ঘাট আলো করিয়া, সমস্ত দেহভার শিথিল করিয়া দিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিয়াছে। চঞ্চল চিকুরদাম মৃদু সমীরণভরে হেলিয়া দুলিয়া গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিতেছে। আর গঙ্গা যেন সেই দেবীমূর্ত্তির পাদমূল চুম্বনেচ্ছায় উধাও ধাবিত হইয়া চরণতল বারিসিক্ত করিতেছে। পদ্মকোরকের মত দক্ষিণ করতল অবশ হইয়া গঙ্গাবক্ষে হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ণেন্দুনিভ আনন স্বর্গীয় জ্যোতি ছড়াইয়া দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া রহিয়াছে। চক্ষু নিমিলিত, মুখখানা হাস্যপরিপূর্ণ।

এ দৃশ্য যে দেখিল সেই মজিল;— সেই দ্রুত নগরে গিয়া ঘরে ঘরে সংবাদ দিল, তোরা দেখে যা আজ আমাদের প্রেমের ঘাটে প্রেমময়ী মা বসিয়া। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল; কিন্তু সে ধ্যান আর ভঙ্গ হইল না; সে নয়ন আর উন্মীলিত হইল না। সকলে আহার নিদ্রা ত্যাগকরিয়া মায়ের সে অপূর্ব্ব রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। সে দর্শনের যেন আর শেষ নাই,—কেবলই দর্শনলালসা; নয়ন দেখিয়া আর তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, এবার নীরব অধরে কথা ফুটিল।—

অমৃত মধুর সে স্বর,- দেব দুর্লভ সে কণ্ঠ,- সেই কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল।

"আমি যাই,— আমার ডাক পড়িয়াছে; ঐ যে কৈলাস শিখর—ঐ যে মেঘের পরপারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ যে,—ঐ যে আমার দেবতা,—আমার আরাধ্যদেবতা,—ঐ যে আমায় ডাকিতেছেন। তবে আর আমি থাকি কি করিয়া, আমার বিধাতা আমায় ডাকিলে কোথায় আমার আবাস গৃহ; তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহাকে লইয়া থাকিব ?

"তোমরা কৃষ্ণধনকে বলিও,—সে আমায় চিনিতে পারিল না। যে নিজকে চিনিতে পারে নাই সে পরকে চিনিবে কি করিয়া। যে নিজকে চিনিতে পারিয়াছে সে সকলকেই চিনিতে পারে। আমার আশীর্ব্বাদে সে তাহাকে চিনিতে পারিবে। তখন বোধহয় আমাকেও চিনিবে। পূর্ব্বজন্মের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি তাহার সেবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাহার সেবা শেষ হইয়াছে, তাই আজ আমি তাহাকে ছাড়িয়া চলিলাম।—আর সে পরলোক বিশ্বাস করে না, তাহার প্রতিকার আমি শীঘ্রই করিব। তাহাকে বলিও আমার দ্বারাই তাহার সকল হইবে।—তাহার কোনও চিন্তা নাই। আমি যাহার, তাহার ভয় কি, তাহার চিন্তা কি ?

"আর,—আমার শ্রাদ্ধশান্তি তাহাকে করিতে বলিও, সে যেন সে কার্য্যে দ্বিধা না করে।

"আর দেরী নাই, আবার ঐ ভৈরবভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে,—আবার আমায় ডাকিতেছে,—এই আমি আসিতেছি প্রভু, একটু দাঁড়াও,—এই আমি আসিতেছি। তবে আমি যাই,—আমি যাই—আমি যাই।'—বলিতে বলিতেই সেই অলস দেহভার গঙ্গায় ঢলিয়া পড়িল। গঙ্গার অদ্ভুত তরঙ্গভঙ্গে ঘূর্ণি খাইয়া কোথায় অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

এতক্ষণ হরিপ্রাণ স্থিরকর্ণে মায়ের কথা শুনিতেছিল, প্রতিমা নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—মা, আমার মা, তুই আমার গৃহে ছিলি, তুই আমার গৃহ ধন্য করিয়াছিলি; কৈ মা, তুই আমায় ছাড়িয়া কোথায় গেলি;—এইতো তুই ছিলি, এইতো তুই কথা বলিলি; কোথায় গেলি;—আমার পাপের ফলে তুই আমার কৃষ্ণধনকে ছাড়িয়া গেলি। সে বাড়ী আসিলে আমি তাহাকে কি ধন দিয়া প্রবোধ দিব ? তোর মত ধন আর যে আমার নাই। তোর মত মাণিক,—তোর মত স্বর্ণখনি আর যে আমার ঘর আলো করে নাই। মাগো, মা, ওমা, বড় আশা করিয়া তোকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছিলাম;—আমার সে আশা অপূর্ণ রাখিলি। আমি শূন্য-হৃদয়ে, তোরে ছাড়িয়া কারে লইয়া ঘরে যাব ?—আমি ঘরে যাব না;—আর আমি ঘরে যাব না। আমি এই পবিত্র গঙ্গায় এ পাপদেহের বিসর্জ্জন করিব।

এই বলিয়া বৃদ্ধ হরিপ্রাণ আকুল হইয়া গঙ্গার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সঙ্গের প্রতিবাসী বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অমনি ধরিয়া ফেলিল। নানাবিধ প্রবোধ দিয়া তাঁহার চিত্ত কতকটা স্থির করিল।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কাঁদিয়াছে,—সকলেই কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিয়াছে। নদীয়াবাসী আজ সোণার সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সোণার কমলিনীকে গঙ্গাসলিলে ডুবাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীপীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—o—

সাধক-সঙ্গীত।

[৩]

তারা তুমি কি সেই কালী কপালিনী।
অসিধরা করালিনী;—কোথা সে কজ্জোল-
রুচি উজ্জ্বল বরণ যাতে কান্দো কান্দো হ'ত কাদম্বিনী॥
ছিলে নীলাঞ্জন সমা শ্যামাঙ্গী কাল কামিনী,
হ'লে কলধৌত জলধৌত সৌদামিনী,
কই লোল রসনা বিশাল দন্ত;
কটিতটে কই আর বাজে কিঙ্কিনী;—
কোথা গেল নরকর, মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর,
বল নর-নরক সঙ্কোচ নিবারিণী॥
ছিলে চতুর্ভূজা কালভুজঙ্গ-উত্তরীধরা,
দশভূজারূপে হ'লো আলো আজ সমস্ত ধরা,
সুখী হলেম বস্ত্রপরা দেখে,
আগে ত ছিলি মা উলঙ্গিনী,
আর কি দানব রণে বহে না রুধিরনদ,
আর কি কালিন্দী-জলে ফুটে না মা কোকনদ,
প্রত্যালীঢ়া ছিলে শবোপরে;—
হ'লে কেশরী অসুরে ত্রিভঙ্গিনী॥
শব শিশু হে'লে—দুলে, খেলে কই আর শ্রুতিমূলে,
হ'লে হেমাব্জ মকর কুণ্ডলিনী;
কটাক্ষে লুকালে কোথা, বিকটাকৃতি সে জটা,

ঘনঘটা জিনি হঠা হ'ল যে চিকুর ছটা,
ত্যজিলে মা চণ্ডমুণ্ডধরা বিদারিলে মহিষে জননী ;—
গরল ঢালিতে পূর্ব্বে বিরল হাসির প্রভাবে,
আজ কেন তরল সুধা ছড়াও মা সরল ভাবে,
কোথা গেল শোণিত পানের ক্ষুধা;
বল গো শুধাংশু শেখরিণী,—
ত্যজে রণ-শঙ্কটের ভূষণ, শঙ্করি, আজ কর্‌লে ধারণ,
(শঙ্খ আদি) অসংখ্য রতন মুক্তা মণি;
পাষাণ-নন্দিনী তুমি থাকিতে শ্মশান ধামে,
দক্ষিণে ডাকিনী তোমার যোগিনী নাচিত বামে,
ধরিত খর্পর অসিলতা তাদের—শীলতা ছিল না কাত্যায়ণী॥
কি মায়ার প্রভাবে তাদের লুকাল বিকট কায়া,
হ'ল যে মুরতি মনোহারিণী রতির ছায়া,
শ্রীবিদ্যা রূপিনী, শ্বেত-শোণিত-সরোজ-কর্ণিকা নিবাসিনী;
কি কুহক মন্ত্রে বল, একটী ধরিল কমল,
অন্যটী হইল বীনাপাণি ;
মণ্ডিত সিন্দুরে ও কে বালক বসে ইন্দুরে,
কণক—সিন্দুরে মথি ও কেবা কাঁন্দায় ইন্দুরে,
ভুবন সুন্দর বালক দু'টী রূপে আলো করিছে মেদিনী;—
যা কালী সা তারা বেদাগমে এই করে ঘোষণা,
প্রত্যক্ষ করিলাম আজ পরোক্ষে যা ছিল শোনা,
পুনর্ব্বার পূর্ণইন্দুমুখী হ'লে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী;
গোবিন্দের চিরধন ও রাঙ্গাচরণ,
দেখে কে মা ঘৃণা করে মৃণালিনী॥

———0———

জীবন্মুক্ত-অবস্থা।*

যাঁহার হৃদয়ে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের এক সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে—যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-গঙ্গা, জ্ঞানসমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তিনিই জগতে জীবন্মুক্ত। তাই জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণাদর্শ শুকদেবকে "শুকোমুক্তঃ" বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানী, নির্লিপ্ত গৃহস্থ এবং পরমহংস সন্ন্যাসিগণ জীবন্মুক্ত; এক কথায় ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই মুক্ত। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞের মুক্তি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ বলিলে আধুনিক সমাজের লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; তাহারা ব্রহ্মবিৎ অর্থে স্বেচ্ছাচারী, সমাজদ্রোহী, দেব-গুরু-নিন্দাকারী, বেদবিরোধী নাস্তিককে বুঝিয়া থাকে। যে দেশে শিবস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে মুক্তির দ্বারা উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, সে দেশের লোক ব্রহ্মবিৎ সম্বন্ধে কেন এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইল, তাহা-অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াই বলিতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার নিকট যে ব্রহ্ম হইতে কীট পর্য্যন্ত সমান আদরে গৃহীত হয়। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল, পুরুষ-নারী, পাপী-পুণ্যবান্, জড়-চৈতন্য, অণু-পরমাণু, বৃক্ষ-শিলা, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়; সুতরাং একটি অণুও যে তাঁহার নিকট আত্মবৎ প্রীতির বস্তু এবং ভগবানের ন্যায় ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ লোক ইষ্ট-দেবতা ব্যতীত অন্যবস্তুতে তুষ্ট হইতে পারে না, আর ব্রহ্মবিদের নিকট সকল বস্তুই ইষ্টদেবতার স্বরূপ। শাক্ত বলে শক্তি ভিন্ন গতি নাই, বৈষ্ণব আবার কালীর নাম শুনিলে কর্ণ-মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকট কালী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমান আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকে শালগ্রামশিলাকে নারায়ণ মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকট সকল শিলাই নারায়ণ, সাধারণ লোক তুলসীবৃক্ষকে পবিত্র মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী বৃক্ষমাত্রকেই তুলসীর ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করেন; সাধারণ লোকে গঙ্গাকে পুণ্য-নদী মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মবিদের নিকট সকল নদীই গঙ্গাসদৃশ। সুতরাং যাহারা নারায়ণশিলাকে লাথি মারিয়া কিম্বা রমজান্ চাচার পাচিত পক্ষীবিশেষের মাংস ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহারা কিরূপ ব্রহ্মবিৎ তাহা ব্যাস-বশিষ্ঠ-জৈমিনি-পতঞ্জলীর বংশাবতংস হিন্দুগণের বুঝিবার শক্তি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তদীয় স্থাপিত মঠে শিব, বিষ্ণু, শক্তি প্রভৃতির মূর্ত্তিস্থাপন এবং ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে গঙ্গা, মনসার পর্য্যন্ত স্তোত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীকে কি নাস্তিকতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন?—হায় রে সকলই কালের প্রভাব। সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই এইরূপ সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞান বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, কিম্বা প্রেম-

---

*গত বর্ষের প্রকাশিত "মুক্তিস্বরূপ লক্ষণ ও তত্ত্বাভোপায়" প্রবন্ধের শেষাংশ নূতন বর্ষে নূতন নামে বাহির করা হইল।

সঃ আঃ—দঃ।

ভক্তির অমৃতধারায় ভাসিয়া যাইয়া ইষ্টচরণে লীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ—তিনিই জীবন্মুক্ত। মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটী বিষয় যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যথাঃ—

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিতঃ।
বালভাবস্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥
জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

যে জ্ঞানে জীব নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রা বিবর্জ্জিত হয়, এবং বালকের ন্যায় স্বভাব-বিশিষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। সুতরাং সংযম বা স্বেচ্ছাচার ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ নহে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও মুক্ত;—কাজেই জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হন। তাই শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে যে,—

বর্ত্তমানেঽপি দেহোঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্ত্তিনি।
অহন্তা মমতাঽভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।

যিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্যায় অনুগমনকারী এই দেহে অহংত্ব ও মমত্বভাব-শূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত।

গুণদোষ বিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥

গুণদোষ স্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণ-বিশিষ্ট এবং জগতে নিখিল বস্তুতে সমদর্শিতা জীবন্মুক্তের চিহ্ন।

ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণা ভেদঃ কদাপি ব্রহ্ম সর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত-লক্ষণঃ।

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ কোন প্রকারে বিদিত নহেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

ইষ্টানিষ্টার্থ—সংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥

ইষ্ট বিষয় বা অনিষ্ট বিষয় সম্যক্ প্রাপ্ত হইলেও সমদর্শিতা দ্বারা আপনাতে ইষ্ট বিষয়ে বা অনিষ্ট বিষয়ে বিকৃত ভাব না হওয়াই জীবন্মুক্তের চিহ্ন। সুধিগণ পরমাত্মা জীবাত্মার শোধিত একভাব প্রাপ্তিকাবিকল্পরহিত চিন্মাত্রবৃত্তিকেই প্রজ্ঞা বলিয়া থাকেন। ঐ প্রজ্ঞা সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মে-স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। দুঃখকষ্টে যাঁহার মন বিষাদিত না হয়, আর সুখভোগেও যাঁহার স্পৃহা না থাকে, এবং অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে।* যিনি ব্রহ্মে বিলীনচিত্ততাহেতু নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় হইয়া নিত্যানন্দ সুখানুভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এইরূপ যাঁহার প্রজ্ঞা নিশ্চল ও যাঁহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি স্বপ্নের ন্যায় প্রপঞ্চ বিস্মৃতপ্রায়, তিনিই জীবন্মুক্ত। যথা :—

যস্যস্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥

প্রেমভক্তির অসমোর্দ্ধ-রসমাধুর্য্যে যাঁহার চিত্ত ইষ্টদেবতার চরণে চিরকালের জন্য সংলগ্ন হইয়াছে; যিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রাণের ঠাকুরের প্রেমরসার্ণবে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এবং এই জীবই ইষ্টদেবতার স্বরূপ, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন; এরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিকে

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জীবন্মুক্ত কহা যায় । সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর, তাঁহাকে যিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত । *

প্রকৃত ব্রহ্মগত-প্রাণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি যে স্থানে বাস করেন, তথায় রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্যু-দুঃখ-দারিদ্রতা এ সকল কিছুই নাই। সাধুগণ কর্ত্তৃক পূজ্য হইলে কিম্বা অসাধুগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলেও উভয় অবস্থাতেই তাঁহার চিত্ত সমভাবে থাকে। তাঁহাদ্বারা লোক সকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, তিনিও কাহারও কর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন হন না। তাই তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রহ্মলোকবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্ ও সুস্থ, দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্য্যবান্ এবং ভিখারী অবস্থাতেই রাজচক্রবর্ত্তী। বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মর্ত্ত্য-জীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি করেন যে, সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁহার সে উচ্চতার পরিমাণ নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা করে, এবং বিবিধপ্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে আর অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না। শান্তিরূপ খড়্গ যাঁহার হস্তে আছে, দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহার কি করিবে?—তিনি স্বীয় করস্থ শান্তিরূপ মহা খড়্গ দ্বারা তাঁহাদিগের সকল আক্রমণকেই ব্যর্থ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তাঁহার মহত্ব অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন। যথাঃ—

তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে ।

বেদান্ত রত্নাবলী ।

বাস্তবিক যে জীবন্মুক্ত পুরুষ অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করেন না, এবং অতিমাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয়বাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হন্তার অমঙ্গল হউক, এরূপ ইচ্ছাও করেন না, ত্রিলোকে তদপেক্ষা আর পূজ্য কে?—তাঁহার এই মহদ্ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বাহ্যিকভাব দৃষ্টে লোকে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি আত্মবৎ, অব্যক্ত চিহ্ন এবং বাহ্য-বিষয়াসক্তি-বর্জ্জিত হন, তিনি দিব্য-রথরূপ এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ করেন। তাঁহাদিগের চিন্তাহীন, দীনতা-প্রকাশশূন্য, ভিক্ষান্ন আহার, নদীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবার্য্যরূপে অবস্থিতি, নির্ভয়হেতু শ্মশান বা কাননে নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোষণাদিশূন্য দিগ্রূপ-বসন, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদান্তরূপ মার্গে গতিবিধি এবং পরব্রহ্মেই রমণ হয়। আবার—

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালকবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥

বিবেক চূড়ামণি, ৫৪২।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কখন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান, কখন বল্কল বা

* জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

চর্ম্মাম্বর ধারণ, কখন বা জ্ঞানাম্বর গ্রহণ করিয়া, কখন উন্মত্তবৎ, কখন বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায় ধরা ভ্রমন করেন।

কচিন্মূঢ় বিদ্বান্ কচিদপি মহারাজবিভবঃ
কচিদ্ভ্রান্ত সৌম্যঃ কচিদজগরাচার-কলিতঃ।
কচিৎ পাত্রীভূতঃ কচিদবমতঃ কাপ্যবিদিত—
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততঃ—পরমানন্দ সুখিতঃ॥
বিবেক চূড়ামণি, ৫৪৩।

নিত্য পরমানন্দে আনন্দিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কোন স্থানে মূর্খের ন্যায়, কোন স্থানে পণ্ডিতের ন্যায়, কোন স্থানে বা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী, কোন স্থানে ভ্রান্তবৎ, কোন স্থানে প্রশান্ত, কোন স্থানে অজগর ধর্ম্মাবলম্বী, কোন স্থানে দান পাত্রবৎ, কোন স্থানে অবমানিত, কোন স্থানে বা অপরিচিত, এই ভাবে ভ্রমন করেন। কাজেই অল্পবুদ্ধি লোক সকল তাঁহাদিগকে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া আপন শিক্ষার তুলনায় মতামত প্রকাশ করে। কেহ বা সাধুর সৌভাগ্যসম্মানে ঈর্ষান্বিত হইয়া মহাপুরুষদিগের অযথা কুৎসা প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাদৃশ মহাত্মার কৃপা দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়। যথা :—

বিচারেণ পরিজ্ঞাত স্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মাবিষ্ণিন্দ্র শঙ্করাঃ॥
যোগবাশিষ্ট।

ব্রহ্মবিচার দ্বারা নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মার প্রকাশ যাঁহার সম্বন্ধে হয়, তদ্রূপ আত্মবিৎ জীবন্মুক্তের দয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেন।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই বিদেহ-কৈবল্য অর্থাৎ দেহান্তে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুব্যক্তি মৃত্যুবাসরে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ আত্মস্বরূপে লীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন, ভক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ দেহান্তে ঈশ্বরলোকে বাস করেন, তৎপরে কল্পান্তে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সূক্ষ্ম ও কারণদেহ বিনষ্ট হওয়ায় রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও তিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন,—তাই তিনি জীবন্মুক্ত। সুতরাং তাঁহার স্থূলদেহ-নাশে অন্য কোন প্রকার দেহ না থাকায় উৎক্রান্তি হয় না, একবারে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনুষ্যের দেহত্যাগ যে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি জীবদ্দশাতেই লাভ হয়,—দেহধারী হইয়াও তিনি নির্ব্বাণসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্তি ঘটিলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, সুখ, দুঃখ, শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ, হিংসা, দ্বেষ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে, তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে।

সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ—আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘজীবনেও আনন্দ প্রকাশ করেন না, অর্থাৎ—তিনি আসন্নমৃত্যু ও দীর্ঘজীবন এতদুভয়কে সমভাবে দেখেন। তিনি মরণভয় তুচ্ছ করিয়া প্রেমে মাতোয়ারা—বিহ্বল হইয়া গদগদস্বরে প্রাণে-

খরের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি কালকে কলা দেখাইয়া রামপ্রসাদের সুরে গাহিয়া থাকেন—'আমি তোর আসামী নই রে শমন, মিছা কেন কর তাড়না।

আবার "মুখাগে তোর যমরাজাকে আমার মত নিয়েছে ক'টা।" বলিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া তিনি যমদূতকে তাড়াইয়া দেন। বস্তুতঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইষ্টদেবতার চরণে বিক্রয় করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে তাঁহার সে প্রেম ও আনন্দ অনন্তকাল ব্যাপী, কস্মিন্‌কালে কোন জগতে ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিনি যাঁহার সহবাসের আনন্দ ও যে প্রেম সম্ভোগ করিতেছেন, দেহান্তে তিনি তাঁহার নিকটে থাকিবেন এবং সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং মৃত্যু তখন আর তাঁহার নিকট প্রকৃত মৃত্যুরূপে অগ্রসর হয় না, অর্থাৎ—উহা তাঁহারপক্ষে আর তখন ইহ-পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। ইহাকেই সাধকের অমরজীবন, অনন্তজীবন বা সত্যজীবন লাভ করা বলে। এইরূপে সত্যজীবন লাভ করাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। আবার ইহলোকে যিনি জীবন্মুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

—:0:—

মনের মানুষ।

ম ন যাহারে চিন্তয় সদায়।
নে হারি যাঁরে আশ না পূরয়।
র সনা যাঁহার নাম জপয়।
মা নস মন্দিরে যাঁহার ঠাঁই।
নু কায়ে যাহারে দেখিতে আশ।
ষ ড়্‌রিপু যাঁর চরণে দাস।
আকুল পরাণ যাঁহারে চায়।
মনের মানুষ সেই ত হয়॥

—0—

উপদেশ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩১। সাধু মহাজনের প্রতি অত্যাচাররূপ অপরাধ করিলে তাহা অত্যাচার কর্ত্তার নিজের উপরই সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া থাকে।

৩২। যদি অমর হইতে চাও,—যদি জীবত্বে শিবত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে জীয়ন্তে মরা হও।

৩৩। যখন এ মাটীর দেহ মাটিতেই মিশিবে তবে আর এত গরব কেন?—মাটিতে মিশিবার আগেই সকল বিষয়ে কেন মাটী হইয়া যাও না?

৩৪। শোক-দুঃখে-মিশ্রিত, আপদ-বিপদে জড়িত, জনন-মরণে-গঠিত-জগতে সুখের

প্রত্যাশা করিও না, এখানে সুখের আশা করিলে কেবল লাঞ্ছনা বিড়ম্বনাই সার হইবে। তবুও যদি সুখ চাও—শান্তি চাও ক্ষুদ্র মানব তোমরা, বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিও,—অতীতকে অনন্তের অতীতগর্ভে বিলীন হইতে দাও—আর ভবিষ্যতের কথা মুখে আনা দূরে থাকুক কল্পনাও স্থান দিও না।

৩৫। সাংসারিক সংঘর্ষণ ব্যতীত কর্ম্মফল ছিন্ন হয় না।

৩৬। হিন্দুর বিবাহ ভোগবিলাসের জন্য নহে; সংসারিক কর্ম্মফলের অনিবার্য্য ক্রিয়া মাত্র।

৩৭। যদি হিন্দুর আদর্শ সংসারী হইতে চাও, তবে ভোগসুখে মাতিয়া দাম্পত্য-জীবনের অপব্যবহার করিও না, সন্ন্যাসী অপেক্ষাও কঠোরভাবে জীবন যাপনকরতঃ পশু জীবন নয়—অমূল্য মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।

৩৮। পথের দুরত্ব দেখিয়া বসিয়া পড়িলে কখনও গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারিবে না, পশ্চাদ্দিকে না তাকাইয়া শুধু 'এগিয়ে যাও', নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিবে।

৩৯। কামনা-বাসনামূলক কার্য্যে সুখ কিম্বা দুঃখ চিত্তভাব বিকৃত করিয়া দেয়; তাই মূলে কামনাবাসনা রাখিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।

৪০। অভাবই জীবের একমাত্র অশান্তি ও নিরানন্দের কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের কোন অভাব নাই; অজ্ঞানতাই অনন্ত প্রকার অভাবের সৃষ্টিকর্ত্তা।

৪১। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই পূর্ণের অংশ, কাজেই অপূর্ণ; সুতরাং অপূর্ণ বস্তু লাভ করিয়া কাহারও পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে না; এমন কি বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব লাভ করিয়াও কেহ পরাশান্তির অধিকারী হইতে পারে না; কারণ বিষ্ণুত্ব, শিবত্বও যে সৃষ্ট।

৪২। যখন জীব আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া বুঝিতে পারিবে যে দ্বাদশ সূর্য পৃথিবী দগ্ধ করুক—উনপঞ্চাশৎ বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হউক—সপ্ত সমুদ্র পৃথিবী গ্রাস করুক—কিছুতেই তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—সে অচল-অটল; তখনই সে পূর্ণ শান্তির অধিকারী হইবে।

৪৩। যার অভাব যত কম, তার তত শান্তি

৪৪। সংসারের কাজ করিতে করিতেও ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকা যায়।

৪৫। যদি সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইতে চাও, অলস বা জড়ের মত দিন কাটাইও না, অলসতা তমোগুণের প্রাবল্য বাড়াইয়া দেয়।

৪৬। সত্য ও সরলতাই ধার্ম্মিকের ভূষণ, প্রাণান্তেও তাহা ত্যাগ করিও না।

৪৭। গুরুর আদেশ বা উপদেশ পালন না করিলে গুরুকেই অপমানিত করা হয়।

৪৮। যে রমণী একটী সন্তানের প্রকৃত জননী হইতে না পারে—জগজ্জননী হইয়া নারী জীবন সফল করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪৯। ধন থাকিলে মন হয় না।

৫০। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া—সত্য আশ্রয় করিয়া জীবন কাটাইয়া দাও, গায়ে আচড়টাও লাগিবে না।

—০—

তীর্থ-যাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

দ্বারকাপুরী।

অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা,
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।
এতাসু পৃথিবী মধ্যে ন গম্যতে কদাচন।
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যো পরিস্থিতা॥

ভগবানের লীলাক্ষেত্র সুদূর সৌরাষ্ট্র ও গুর্জ্জরস্থিত পুণ্যময়, ও পবিত্র প্রভাসতীর্থ ও দ্বারকাধাম দর্শনমানসে, আমি সস্ত্রীক অন্যান্য দশজন সঙ্গীসহ, গত ১৩১৮সনের ২১শে ফাল্গুণ সোমবার বেলা ৩টার সময় বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া, সন্ধ্যাকালে ধানবাদ্বিগ্রাম-নিবাসী আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

২২শে মঙ্গলবার—অদ্য ভোর বেলা ৫টার সময় রমণীবাবুর বাটী হইতে জাহাজ ঘাটাভিমুখে রওয়ানা হইয়া বেলা ৭টার সময় তথায় পহুছিলাম; সেইখানে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে প্রত্যেকে কিঞ্চিৎ জলযোগকরতঃ বেলা ৮টার সময় প্রত্যেকে ৮/১০আনা হিসাবে ভাড়া দিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম; এবং সন্ধ্যা ৭॥টার সময় গোয়ালন্দ পহুছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলাম।

২৩শে বুধবার—বেলা ১১টার মধ্যে স্নানাহার সমাপনান্তে, প্রত্যেকে ১।৮/ আনা হারে টিকেট করতঃ, বেলা ১২টার সময় নৈহাটী অভিমুখে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যা ৮টার সময় তথায় উপস্থিত হইলাম; এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় রাত্রি যাপন করিলাম।

২৪শে বৃহস্পতিবার—বেলা ২½টায় সময় নৈহাটী হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম, গঙ্গার পরপারস্থিত ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পহুছিবার অল্পক্ষণপরেই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাত্রীর গাড়ী পহুছিল; আমরা সেই গাড়ীতে আরোহণকরতঃ বর্দ্ধমানাভিমুখে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ১১টার সময় বর্দ্ধমান পহুছিলাম; তথায় প্রত্যেকে একআনা হিসাবে ভাড়া দিয়া বাজারে রাত্রি যাপন করিলাম। নৈহাটী হইতে বর্দ্ধমানের ভাড়া ॥/১৫ আনা।

২৫শে শুক্রবার— অদ্য ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে প্রত্যেকে কিঞ্চিৎ জলযোগকরতঃ, বেলা ১০টার সময় গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বেলা ২½টার সময় আসানসোল পহুছিলাম। বর্দ্ধমান হইতে আসান-সোল পর্য্যন্ত প্রত্যেককে ৮/১০ আনা হারে গাড়ী ভাড়া দিতে হইয়াছিল। এখানে যাত্রীদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কেন না এখানে কোন বাজার কি পান্থশালা নাই। রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে কয়েকখানা ছোট ছোট দোকান আছে। আমরা একখানা চালার নীচে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। রাত্রি ১০টার সময় ৫॥/১৫ আনা হারে টিকেট করতঃ জব্বলপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম, সমস্ত রাত্রি গাড়ীতেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

২৬শে শনিবার—অদ্য সারাদিন আমাদিগকে গাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে হইল, কাজেই

ফলমূল দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইলাম; রাত্রে ১০½ টার সময় নাইনি ষ্টেশনে অবতরণকরতঃ; ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

২৭শে রবিবার—অদ্য ভোরে আমরা বোম্বে-মেলে আরোহণকরতঃ ক্রমান্বয়ে বেওয়া সাহেবের রাজ্য, চিত্রকুট পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বেলা ৪টা ১০ মিনিটের সময় জব্বলপুর উপনীত হইলাম। ষ্টেশনের অনতিদূরেই রাজা গোকুলদাসের বিখ্যাত ধর্ম্মশালা; আমরা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলাম যে প্রায় সমস্ত হলই(Hall) তদ্দেশীয় যাত্রীতে পূর্ণ; হলের দুইটী মাত্র কুঠরী আছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশবাসী যাত্রিগণ তাহা ব্যবহার করিতে অনধিকারী; কাজেই বাধ্য হইয়া, একটী খড়ের ঘরে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইল। সেইঘরে মশকের উপদ্রব এত বেশী যে আমরা ঘুটের আগুন জ্বালাইয়া কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইলাম।

২৮শে সোমবার—আমরা, প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনকরতঃ, সহর দেখিতে বাহির হইলাম; ইহা মধ্যভারতের (Central India) একটী সুন্দর সহর; এখানে চীফ কমিশনরের সদর কাছারী, ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার, সুপারইন্টেণ্ডেন্ট, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আফিস, ডাকঘর, টেলিগ্রাম অফিস ও অন্যান্য বড় বড় আফিস এবং কারখানা (Factory) আছে। এখানে কানপুরের কোন কোম্পানীর ও বরুণ কোম্পানীর মাটীর বাসনের কারখানা (Pottery works) আছে; তথায় সুন্দর সুন্দর মাটীর বাসন প্রস্তুত হয়। সহরে আমাদের আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যাদি খরিদ করিবার সময় দেখিলাম, এখানে জিনিষাদির কোন নির্দ্দিষ্ট ওজন নাই, কোন দ্রব্যের ২৭ তোলায়, কোন দ্রব্যের ৪০ তোলায়, কাহারও বা ৮০ তোলায় সের হয়। এ সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা না থাকিলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পাঠকগণের অবগতার্থে ইহা উল্লেখ করিলাম। ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকুরী ব্যপদেশে বহু ভদ্র বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেছেন। সহর পরিভ্রমনকরতঃ আমরা যথাসময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম এবং তথায় সেই রাত্রি বিশ্রাম করিলাম।

২৯শে—মঙ্গলবার,—অদ্য প্রাতে ৯টার মধ্যে আহারাদি সমাপনকরতঃ ১০½টার সময় ভূপালের গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রে ১২½টার সময় ভূপাল ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম; এবং তথায় ষ্টেশনের মহাফেজখানায় রাত্রির বাকী অংশটুকু কাটাইলাম।

৩০শে—বুধবার—প্রাতে নিত্যক্রিয়া সমাধান্তে সহর ও বেগম সাহেবার বাড়ী দেখিবার মানসে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ।০ আনায় ভাড়া করিয়া রওয়ানা হইলাম; ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় দুইমাইল দূরে অবস্থিত। আমরা সহরে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই এক প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে পাইলাম; ঐ দীঘি হইতে কল দ্বারা সমগ্র সহরে জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরেই বেগম সাহেবার বাড়ী দেখিতে পাইলাম; প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিদিক উচ্চ দেয়ালে ঘেরা; সদর দরজায় সঙ্গীনধারী একজন সিপাহী পাহারা দিতেছে; তাহাকে অনুরোধ করায় সে যতদূর সম্ভব,

আমাদিগকে বাড়ীর বাহির অংশ দেখাইল। তাহার কাছে জানিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান সময়ে বেগম সাহেবা না কি পুত্র পরিজন সহ প্লেগের ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া, আহামাদাবাদ সহরে বাস করিতেছেন। তৎপর সহরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলিও যথাসম্ভব দেখিয়া, আমরা ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; তথায় স্নানাহারাদি সমাধাপূর্ব্বক প্রত্যেকে ১।৶ আনা হিসাবে ভাড়া দিয়া উজ্জয়িনীর টিকেট গ্রহণকরতঃ গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা ১২½টার সময় ভূপাল হইতে গাড়ী ছাড়িয়া রাত্র ৮টার সময় উজ্জয়িনী পহুছিল। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র স্থানীয় কয়েকজন পাণ্ডার হাতে পড়িয়া আমরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলাম; এমনসময় একজন হিন্দু পুলিশ আসিয়া গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন; এবং শ্রীযুত রামনাথ সিদ্ধেশ্বর ব্যাস, পাণ্ডা মহাশয়ের অনুগমন করিতে বলিলেন। অধিকন্তু আমাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার প্রতি এবং যাহাতে আমাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য পাণ্ডা মহাশয়কে সাবধান করিয়া দিলেন। ষ্টেশনের নিকটেই পাণ্ডা মহাশয়ের বাসা; অতি অল্পক্ষণমধ্যেই আমরা তাঁহার বাসায় পহুছিলাম। বাসাটী অতি সুন্দর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বাসায় জলের কল আছে। এমন সুন্দর বাসাটী পাইয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। বলিতে কি, ঐ ভদ্রলোকের (পুলিশ) ব্যবহারে আমরা প্রকৃতপক্ষেই পাণ্ডা মহাশয়ের বাড়ীতে সুখস্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে রাত্রি কাটাইয়াছিলাম।

১লা চৈত্র বৃহস্পতিবার—সহরও তদন্তর্গত দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিবার মানসে, প্রাতে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইলাম। সহরে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইলাম, নাতি-প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বই অট্টালিকাদ্বারা শোভিত; ইহাদের অধিকাংশই দ্বিতল। প্রত্যেকেরই দ্বিতলে একটী করিয়া বারাণ্ডা; দেয়াল নানারূপ সুন্দর চিত্রিত ছবি দ্বারা পূর্ণ; ইহাতে অট্টালিকার সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহরের বাড়ী, ঘর, দরজা ইত্যাদি পূর্ব্বকালীয় অনুকরণে নির্ম্মিত। মোগল-রাজত্বের শেষভাগে, মারহাট্টা ও সিন্ধিয়ার রাজত্বকালে এই সহর প্রস্তুত হইয়াছে। অশোক, কুমারগুপ্ত, রাজা বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের সময়ের উজ্জয়িনী বহুদিন পূর্ব্বে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাজারে নানাদেশীয় লোক বাস করে, তন্মধ্যে মারহাট্টী, গুজরাটী ও মালব দেশীয় লোকই অধিক। গুজরাটী ও মালবী রমণিগণ প্রায়ই গৌরাঙ্গী ও সুন্দরী। ইহা-দের বেশভূষাও অনুরূপ। গোলাপী বা পীত রঙ্গের ওড়না, রঙ্গিন কোট এবং রঙ্গিন কোচান বসনে ইহারা গাত্রাবরণ করিয়া থাকে। ইহারা কপালে একটী করিয়া সিন্দুরের টিপ দিয়া থাকে। গুজরাটী ও মারহাট্টী রমণিদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠনপ্রথা নাই; কেবল মালবী মহিলাদিগের মুখে সূক্ষ্ম রঙ্গিন ওড়নার আবরণ থাকে। ইহাদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা না থাকায় মহিলারা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে পথে ঘাটে বিচরণ করিয়া থাকে। আমরা সহরের দর্শনীয় স্থানগুলি যথাসম্ভব দেখিয়া মহাকালের কোটাল নাগচণ্ডেশ্বর, দত্তাত্রেয়, সহস্র-ধনু কেশ্বর, সরস্বতী, চামুণ্ডা, বিপুলাকার চিন্তামণি,

গজানন, জবরেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শনকরতঃ রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা দর্শন করিতে গেলাম। গুহার সম্মুখস্থিত দালানে একটী বেদীর উপর রাজা ভর্ত্তৃহরির পাদুকা স্থাপিত আছে; তাহার নিত্যপূজার জন্ম পশ্চিম দেশীয় একজন সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। আমরা বেদীর নিকট কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া গুহার দিকে অগ্রসর হইলাম, গুহার ভিতর অন্ধকার যেন জমাট বাধিয়া আছে; আমাদের সঙ্গে আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া দাড়াইয়া আছি, এমন সময় প্রদীপ হস্তে একজন লোক তদ্দেশীয় কয়েক জন যাত্রীকে গুহা দেখাইতে উপস্থিত হইল; আমরা ঐ সঙ্গে গুহা দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঐ লোকটী বলিল যে বিশেষরূপ দর্শনী না দিলে গুহা কাহাকে দেখান নিষেধ। অগত্যা সেবায়েত মহাশয়কে অনুরোধ করায় তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, "প্রত্যেকে এক টাকা হিসাবে দর্শনী দিলে দেখিতে পার, নতুবা নয়।" কথায় কথায় সেবায়েত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল।

উজ্জয়িনীর পূর্ব্বদিকস্থ উচ্চ ভূখণ্ডে মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি আছে। বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর দক্ষিনাংশকে খাস উজ্জয়িনী বলে; ইহার কিছু উত্তরে সিপ্রানদীর তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উজ্জয়িনীর লোকে এই অংশকে অবন্তী বলে। এইস্থানে গোমতীগঙ্গা, কৃষ্ণ-গুরু গাধিসান্দিপনী মুনির আশ্রম, কৃষ্ণবলরামের অঙ্কপাত আশ্রম, মঙ্গলের জন্মস্থান, সিদ্ধঘাট, কালিকা দেবী, কালভৈরব, ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্যের শক্তি সাধনাস্থান প্রভৃতি বহু তীর্থ স্থান আছে। ঐ দিকে পথের উভয় পার্শ্বে জনমানবশূন্য জঙ্গল ও ভগ্ন মন্দিরাদির ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে ধ্বংশস্তূপের নিকট রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা অবস্থিত। ইহার তিন দিকে জঙ্গল ও পশ্চিম দিকে সিপ্রানদী প্রবাহিত হইতেছে। বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা ভর্ত্তৃহরি পত্নীর ব্যভিচারে ব্যথিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করতঃ, এই গুহা মধ্যে যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। গুহার চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত, দক্ষিনদিক দিয়া প্রাচীর মধ্যস্থ আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে হয়। আঙ্গিনাস্থিত মন্দির দুইটীর মধ্যে পশ্চিম দিকের মন্দিরটী ক্ষুদ্রতরও আধুনিক; আর উত্তরদিকেরটী বৃহত্তর ও প্রাচীন। দক্ষিন দিকের দ্বার দিয়া বৃহৎ মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের মেঝের উপর একখানি প্রস্তরখণ্ড গুহামুখ আবদ্ধ করিয়া আছে। এই প্রস্তর খণ্ড সরাইলে নীচে নামিবার সিঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আলো সাহায্যে সুরঙ্গ পথে অবতরণ করিলে পূর্ব্বমুখে বিস্তৃত সরাসর টানা লম্বা বারান্দার মত গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। সারি সারি স্তম্ভ শ্রেণী গুহার ছাদ মস্তকে ধারণকরতঃ দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভ গাত্রে খোদিত ও চিত্রিত বিস্তর মনুষ্যমূর্ত্তি আছে; বর্ত্তমানে উহাদের ভগ্নাবস্থা। এইরূপ পর পর তিনটী রাস্তা পাতালে নামিয়াছে। গুহা কয়েকটী কক্ষ দ্বারা বিভক্ত। দুইটী কক্ষ দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাত ও প্রশস্তে আন্দাজ চারি হাত হইবে। কক্ষের বারাণ্ডা পূর্ব্ব হইতে দক্ষিনদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিনদিকের বারাণ্ডা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটা দ্বার আছে; ঐ দ্বার দিয়া আর একটা সুরঙ্গ পথে যাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ঐ পথ বন্ধ আছে। পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম পূর্ব্বে ঐ সুরঙ্গ দিয়া বারানসী এবং হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাতায়াত করা যাইত। কেহ কেহ বলেন ঐ গুহা বিক্রমাদিত্যের পিতা গন্ধর্ব্বসেনের মন্ত্রনাগৃহ ছিল। ভর্ত্তৃহরি ইহার নির্ম্মাতা নহেন; এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন মাত্র। গুহার একটী কক্ষ মধ্যে ধ্যাননিরত একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বিদ্যমান। উহা রাজা ভর্ত্তৃহরি ও তাহার মহিষী পিঙ্গলার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পাণ্ডা প্রকাশ করিল। যখন উজ্জয়িনী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ গুহা অন্যান্য অট্টালিকার সহিত ভগ্ন ও মৃত্তিকাস্তূপে আচ্ছাদিত হয়। এইক্ষণে স্থানীয় লোকে উপার্জ্জনের জন্য মেরামত করিয়া লইয়াছে।

২রা চৈত্র শুক্রবার—প্রাতে সিপ্রাগঙ্গার রামঘাটে অবগাহন করিবার জন্য পাণ্ডার সঙ্গে বহির্গত হইলাম। শাস্ত্রপুরাণে পুণ্যময়ী উজ্জয়িনীর ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শতমুখে ঘোষিত হইয়াছে। পুরাণে এই পরম পবিত্র ক্ষেত্র মহাকালবন নামে অভিহিত আছে। স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে বর্ণনা এইরূপঃ—

কেদারং পুষ্করাঞ্চৈব তথা কারাবরোহনম্।
তথা পুণ্যতমং দেবি মহাকালবনং শুভম্॥
যত্রাস্তে শ্রীমহাকালঃ পাপেন্ধন হুতাশনঃ।
ক্ষেত্রং যোজন পর্য্যন্তং ব্রহ্মহত্যাদি নাশনম্।
ভুক্তিদং মুক্তিদং ক্ষেত্রং কলিকল্মষ নাশনম্।
প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং দেবি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি॥

স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আদ্যাশক্তি মহামায়াকে মহাকালবনের মাহাত্ম্য বলিতেছেন—"এই ক্ষেত্র কলির পাপ নাশ করে; এই ক্ষেত্রের সান্নিধ্যে যোজন পর্য্যন্ত ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ হয়। এই ক্ষেত্রে সর্ব্ব পাপহর শ্রীমহাকাল অধিষ্ঠিত আছেন; প্রলয়েও ইহার বিনাশ নাই।"

অবন্তীখণ্ডের স্থানান্তরে মহাকালবনের এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা,—মহাকালবন যোজন পর্য্যন্ত মুক্তাদামবিলম্বী, সুবর্ণ তোরণে চতুর্দ্দিক শোভিত; এবং অসংখ্য দ্বার মণিমাণিক্যে মণ্ডিত। ঐ বনের পূর্ব্বদ্বারে পিঙ্গলেশ নামে বালসূর্য্য, দক্ষিণে মহাযোগী কারাবরোহনেশ্বর, পশ্চিমে বিশ্বেশ, উত্তরে উত্তরেশ্বর অবস্থিত। মহাকালবনকে অবন্তীখণ্ডে শ্মশান, ক্ষেত্র, উষর, পীঠ ও বন বলা হইয়াছে। এই স্থান ভূতগণের হিতকর বলিয়া উষর, মাতৃগণের স্থান বলিয়া পীঠ এবং নৈমিষারণ্য, দণ্ডকারণ্য ও বৃন্দাবনের ন্যায় মহাকালের অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া মহাকালবন নামে উক্ত হইয়াছে। মহাকালবন ব্যতীত অন্য কোন তীর্থে একাধারে এই পাঁচটী গুণ নাই। মহাকালবন বারানসী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ। অবন্তীখণ্ডে উক্ত আছে যথা;—

কুরুক্ষেত্রাঃ দশগুণা পুণ্যা বারানসী মতা।
তস্যা দশ গুণং ব্যাস মহাকাল বনোত্তমম্॥

কল্পে কল্পে মহাকালবনের নামের পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম কল্পে স্বর্ণশৃঙ্গী, দ্বিতীয় কল্পে কুশস্থলী, তৃতীয় কল্পে অবন্তীকা, চতুর্থ কল্পে অমরাবতী' পঞ্চমে চুড়ামণি, ষষ্ঠে পদ্মাবতী এবং সপ্তমে উজ্জয়িনী নামে খ্যাত; অবন্তীখণ্ডে এরূপ উক্ত আছে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:০:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ—গত ২৮শে বৈশাখ শুক্রবার অত্র শান্তি-আশ্রমের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে যথারিতী সম্পন্ন হইয়াছে। রংপুর, মুর্শিদাবাদ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগত ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি।

সদনুষ্ঠান—টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)—মহেড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম-সীতাকুণ্ডের ভগ্ন মন্দির সংস্কার করাইয়া দিয়া হিন্দু-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাধারণ কথায় বলে "ধন থাকিলে মন হয় না, রাজেন্দ্র বাবু তাহার বিরুদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবন লাভকরতঃ দশের—দেশের—সমাজের কল্যান সাধন করুন, ভগবৎ সমীপে ইহাই প্রার্থনা করি।

উদারতা—ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলী খাঁন পনি সাহেবের ধলাপাড়া মসজিদ-সংস্কার জন্ত ৬৫০৲ টাকা এবং রতনগঞ্জের হিন্দু শ্মশানঘাট পাকা করিবার জন্ত ২৫০৲টাকা দানে, সাম্প্রদায়িক-ভেদবুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাইয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। দেশের হিন্দু মুসলমান সকলেরই তাঁহার সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

সুসংবাদ—যোরহাট ষ্টেট রেলওয়ের সুযোগ্য ম্যানেজার মিঃ এন্, ও, পিটার, কেইসর-হিন্দ, (Mr. N. O. Peter Kaisar-Hind) মহোদয়ের যত্নে রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ শান্তি-আশ্রমের অনতিদূরে "শান্তি-আশ্রম" নামে একটী Pick-up Station খুলিবার অনুমতি প্রদানকরতঃ সর্ব্ব সাধারণের উক্ত আশ্রমে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্ত আমরা সুযোগ্য ম্যানেজার মহোদয় ও রেলওয়েকর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আদেশ শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে আমরা এরূপ আশ্বাস পাইয়াছি।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

তীর্থ যাত্রীর-দৈনন্দিন লিপি।

দ্বারকাপুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আমরা যে ঘাটে উপনীত হইলাম তাহার নাম রামঘাট; এই ঘাটটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘাটটী উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ইষ্টক দিয়া বান্ধান। সিপ্রানদী আয়তনে যদিও খুব ছোট, তথাপি ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর; পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সিপ্রানদী কুল কুল নাদে বহিয়া যাইতেছে। নদীতট ও গর্ভ পাষাণময়; নদীতে কর্দ্দমের লেশ মাত্র নাই। জল অতি স্বচ্ছ; সিপ্রার নির্ম্মল জলে পুজার অংসখ্য ফুল ও বিল্বপত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সিপ্রার পূর্ব্বকুলে অসংখ্য ঘাট আছে। দশাশ্বমেধঘাট, পিশাচমোচনঘাট, মঙ্গলঘাট, দত্তাত্রেয়ঘাট প্রভৃতি আরও অনেক ঘাট আছে। কত শত তীর্থযাত্রী, সাধু, সন্ন্যাসী স্নানার্থে ঘাটে সমবেত হইয়াছেন। কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ স্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ বা স্নানান্তে আপন আপন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন; সে পবিত্র, রমণীয় দৃশ্য দেখিলে স্বতঃই মনপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, ভক্ত আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়—এ পবিত্র দৃশ্য ভক্তেরহৃদয়ে অতীতের পুণ্য-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়; সত্যই যেন মনে হয়—মহর্ষি সান্দীপনির পুণ্যাশ্রম বেদধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঋষি বশিষ্ঠ

ও দেবী অরুন্ধতীর বিবাহ যজ্ঞাবশিষ্ট শান্তিজল হইতে সিপ্রানদীর উৎপত্তি। আমরাও সেই পুণ্যসলিলা সিপ্রানদীতে যথাবিধি অবগাহনকরতঃ জীবন ধন্য মনে করিলাম। অসংখ্য কূর্ম্ম ও মৎস্য প্রভৃতি জলচরগণ স্নানার্থিদিগের আশে পাশে নির্ভয়ে বিচরণকরতঃ পুণ্যতোয়া সিপ্রার মাহাত্ম্য যেন আরও বাড়াইয়া দিতেছে। রামঘাটেই পিশাচ-মোচন তীর্থ, ঘাটের উপর পিশাচ-মোচন মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহার অতি নিকটেই দক্ষিনদিকে সামান্য ভূখণ্ড দ্বারা সিপ্রার জলধারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে। এই স্থানকে নীলগঙ্গাসঙ্গম বলে। এখানে সঙ্গমেশ্বর মহাদেব আছেন, এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিমোচন হয়। আমরা তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি সমাপনান্তে পাণ্ডাজীর সঙ্গে মহাকাল মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে মহাকালেশ্বরের দেওয়ান অগস্ত্যেশ্বরের লিঙ্গ দর্শনান্তে তথায় যথাবিধি পূজা দেওয়া হইল। অগস্ত্যেশ্বর-লিঙ্গ-সংলগ্ন একটী পিত্তলের যোগীমূর্ত্তি আছে। ইহার নিকটে উচ্চ ভূখণ্ডোপরে প্রসিদ্ধ পীঠস্থান হরসিদ্ধামাতার মন্দির অবস্থিত; শীতলাদেবীর মত মায়ের মূর্ত্তি! মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে চতুর্দ্দশ নরবলি দিয়াছিলেন। মায়ের মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গনে প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটি সুন্দর আলোকস্তম্ভ বিদ্যমান; দীপান্বিতার দিনে উহাতে আলো দেওয়া হয়। মন্দিরের সম্মুখে হরসিদ্ধাকুণ্ড নামে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় আছে, ইহার অপর নাম রুদ্র-সাগর। উজ্জয়িনীতে এরূপ আরও অনেকগুলি পবিত্র কুণ্ড আছে। অবন্তী-খণ্ডে রুদ্র-সাগর সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, যথা:—

"স্নাত্বা সরসি রুদ্রস্য দৃষ্টা কোটীশ্বরং শিবং।
নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেন্মহাকালং সনাতনং॥

অর্থাৎ রুদ্র-সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক কোটীশ্বর মহাদেব দর্শনকরতঃ সনাতন মহাকালকে দর্শন করিবে। রুদ্র-সাগরে কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি নানা জাতীয় জলজ কুসুম ফুটিয়া সাগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে! রুদ্র-সাগরে জলজ-ঘাসের উপর দিয়া একটী পথ আছে, ঐ পথে অতি সন্তর্পণে যাইতে হয়।

(মহাকাল)

আমরা সেই পথে রুদ্রসাগর পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, মহাকাল মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম; আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে হর হর বম্ বম্ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। মহাভারতে বনপর্ব্বে মহাকাল সম্বন্ধে লিখিত আছে যে:—

"মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটীতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধ ফলং লভেৎ॥
মহাভারত, বনপর্ব্ব।

অল্পে অল্পে মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম—বিশাল মন্দির, মন্দির-শীর্ষে সুবর্ণ কলস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশকরতঃ চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে বেষ্টিত একটী জলাশয় দেখিতে পাইলাম; উহার জল রক্তবর্ণ পানা দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ জলাশয়ের নাম কোটীশ্বর কুণ্ড। এই কুণ্ড একটী মহাতীর্থ; এতৎসম্বন্ধে অবন্তীখণ্ডে

বর্ণিত আছে যে শক্তিধর ষড়ানন তারকাসুরকে নিধনকরতঃ হস্তস্থিত শক্তি এত বেগের সহিত সিপ্রাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে শক্তি-অস্ত্র পাতাল ভেদ করিল এবং সেই রন্ধ্রপথে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গা উত্থিতা হইয়া একটী প্রকাণ্ড কুণ্ডের সৃষ্টি করিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কুণ্ডে কোটীতীর্থেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাই এই তীর্থের নাম কোটীতীর্থ।

আমরা কুণ্ডবারি মস্তকে স্পর্শ করাইয়া মন্দিরে প্রবেশকরতঃ কোটীশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। লিঙ্গ-মূর্ত্তির পশ্চাতে অবন্তীকা দেবী এবং পার্শ্বে রাম, লক্ষ্মণ ও তাঁহার সীতাদেবীর শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজিত, রামসীতার দক্ষিণ পার্শ্বে এক কোণে পঞ্চমুখ মহাদেব, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুদ্রাক্ষ বেষ্টিত ও সিংহাসন রুদ্রাক্ষ নির্ম্মিত। আমরা, যথারীতি কোটীশ্বর মহাদেবের পূজা সমাপনান্তে, মহাকাল দর্শন মানসে, মন্দিরের দক্ষিণদিকে সুরঙ্গপথে সোপান বহিয়া পাতাল মন্দিরে প্রবেশ করিলাম; কেন না মুসলমান আক্রমণকারীর অত্যাচারের সময় হইতে মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গ ভূগর্ভে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহাকালের বিভবৈশ্বর্য্য প্রভাসের সোমনাথ হইতে কম ছিল না। বিখ্যাত মুসলমান ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যে মহাকাল মন্দিরের স্তম্ভসকল সুবর্ণ নির্ম্মিত ও মণিমুক্তা খচিত। ইহার দেবার্চ্চনা বা গর্ভগৃহে একটী মাত্র আলো প্রজ্জলিত করিলে সেই আলোক কক্ষ ও প্রাচীরস্থিত বহুমূল্য প্রস্তরে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র মন্দিরটী উজ্জল আলোকমালায় উদ্ভাসিত করিত। দীল্লির পাঠান-সুলতান আলতামাস ১২৩৫ সালে উজ্জয়িনী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন; সেই সময়ে মহাকাল মন্দিরও লুণ্ঠিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মন্দির-শীর্ষের সুবর্ণ কলসীটী মাত্র বিদ্যমান আছে। অতি পুরাকাল হইতে এই মহাকালের পূজা চলিয়া আসিতেছে; ত্রেতায় পরশুরাম, দ্বাপরে বলদেব তীর্থস্নান উপলক্ষে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। কলিতে পুণ্যশ্লোক রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকালের নিত্য-পূজা ও সেবা করিতেন। এখন উঁহার পূজা ও আরতি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সিন্ধিয়া, হোলকার, গায়োকার প্রভৃতি হিন্দু-নরপতিগণ মহাকালের সেবার্থে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন, এতদ্ব্যতীত যাত্রীদিগের প্রদত্ত অর্থও আছে। আরতির পূর্ব্বে পাণ্ডা ও পুরোহিতগণ মহাকালের পঞ্চমুখী মুকুটোপরি ছত্র চামরাদি ধারণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রাঙ্গনস্থিত কোটীশ্বর কুণ্ডে গমন করেন এবং তথায় মুকুটকে যথাবিধি স্নান করাইয়া মহাকালের শিরোদেশে পরাইয়া দেন, এই সময়ে মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গ কৌষেয় বসন পরিধান করেন ও মণিমাণিক্যে বিভূষিত হন; তৎপর যথাবিধি আরতি হইয়া থাকে, আরতিকালে হর হর বম্ বম্ শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিত হয়।

কেদারেশ্বর হর্ষকালী।

মহাকাল-মন্দিরের কিছু দক্ষিণে কেদারেশ্বর মন্দির। ইহা মহাকালের ন্যায় বিশাল নহে; কিন্তু ইহাও বহু প্রাচীন। ঋষিগণ সিপ্রাবারি হইতে কেদারেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেদারেশ্বরের মন্দির হইতে কিছু রেদূ হর্ষ-

দ্বীপ বিদ্যমান আছে। একখণ্ড উচ্চ ভূখণ্ডের উপর একটী বহু প্রাচীন কালীমন্দির আছে, পূর্ব্বে ঐ ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে জলাশয় ছিল এখন তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মন্দির মধ্যে করালবদনা লোলরসনা পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা। মহারাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সিংহদ্বার।

মহাকাল মন্দিরের কিছুদূরে একস্থানে একটী অতি প্রাচীন বিশাল উচ্চ ও প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহদ্বার দর্শন করিলাম। সিংহ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে তিন তিনটী বিপুলকায় স্তম্ভ-শোভিত নবহৎখানা শোভা পাইতেছে। আর উপরের খিলান হইতে বৃহদাকার ঘণ্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে। সিংহদ্বারের অঙ্গ সিন্দুর ও চন্দনলিপ্ত; পাদমূল পত্র পুষ্প বিল্বদলে সজ্জিত। যে আসিতেছেন তিনিই সিংহদ্বারের গাত্র চন্দন ও সিন্দুরে অনুলিপ্ত এবং পত্রপুষ্পে পূজা করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া যাইতেছেন; আমরাও তদ্রূপ করিলাম। ইহা রাজা বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ ও স্মৃতি-চিহ্ন; সুতরাং হিন্দুমাত্রেই ইহাকে অতি আদর ও পবিত্র চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। তাই সকলে সাগ্রহে তাহার পূজা করিয়া আসিতেছে। এই দ্বারই বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রবেশদ্বার ছিল এবং নবরত্ন পণ্ডিত-গণ এই দ্বার দিয়া রাজসভায় গমনাগমন করিতেন। উজ্জয়িনীর দক্ষিণপূর্ব্বে যোগ-সিদ্ধ নামে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, কথিত আছে, তথায় রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন প্রোথিত ছিল।

অঙ্কপাত।

অতঃপরে মহর্ষি সান্দীপনি কাশী পরিত্যাগ-করতঃ সিপ্রাতীরে পবিত্র বনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন আর সে আশ্রম নাই বটে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার পীঠস্থান বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। ইহার নিকটে গোমতী-গঙ্গা অবস্থিত; ইহা পাষাণ-নির্ম্মিত সোপানাবলী-শোভিত একটী পবিত্রকুণ্ড। ইহা ব্যতীত বিষ্ণুগঙ্গা, দামোদরগঙ্গা প্রভৃতি আরও কয়েকটী কুণ্ড বিদ্যমান আছে। সান্দীপনি আশ্রমের অতি নিকটেই অঙ্কপাত আশ্রম; এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে প্রথম অঙ্ক শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অঙ্কপাত আশ্রম। পঞ্চজন নামক মহাদৈত্য মহর্ষি সান্দীপনির পুত্রকে হরণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; রামকৃষ্ণ পঞ্চজনকে নিহত করিয়া তাহার শঙ্খ লইয়া আইসেন, তদবধি শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য হইয়াছিল। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ সান্দীপনির মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দিবার কালে মহর্ষি সান্দী-পনিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে মহাকালপুরে কুশস্থলীতে আদাদেব পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপ, গোবিন্দ, শঙ্খদ্বার ও কেশব এই মূর্ত্তি দর্শন করিলে আর নরকগামী হইতে হয় না। এখন অঙ্কপাত আশ্রমে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি ব্যতীত উপরোক্ত পঞ্চমূর্ত্তির অন্য কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এ মূর্ত্তিও প্রাচীন নহে; কেননা, হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মল্লহর রাও ঐ বিশ্বরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া

তাহাতে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও হোলকার রাজার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে বিশ্বরূপ দেবের পূজা ও ভোগাদি হইয়া থাকে, এই আশ্রমে আরও দুইটী মন্দির আছে। এ দুইটী মন্দির রঙ্গরাও আপ্‌পা নামক কোন মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত দ্বারা নির্ম্মিত। রামের মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি বিদ্যমান এবং কৃষ্ণের মন্দিরে কৃষ্ণের মূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরে এবং রাধার মূর্ত্তি শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত।

বিক্রমাদিত্য-আখ্যান।

উজ্জয়িনীতে তাম্রসেন রাজার রাজত্ব-কালে শবরমতী ও মহী-নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত গুর্জ্জরমণ্ডলে এক তপোবনে তাম্র-লিপ্ত নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার সহিত তাম্রসেন রাজার বিবাহ হয়। তাঁহার ছয়টী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে; কন্যার নাম মদনরেখা; কন্যাটী পরমা সুন্দরী। তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপে গর্দ্দভবেশে জয়ন্ত নামীয় এক গন্ধর্ব সিপ্রা তীরে বাস করিতেন। তিনি দিবাভাগে গর্দ্দভ ও রজনীযোগে নিজদেহ প্রাপ্ত হইতেন; ঐ গন্ধর্ব্বের অপর নাম গন্ধর্ব্বসেন ছিল; তিনি ব্রহ্মার পুত্র। একদা দেবশর্ম্মা ও হরিশর্ম্মা নামীয় দুই রাজানুচর সিপ্রাতীরে শুনিতে পাইলেন যে এক গর্দ্দভ মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতেছে; এবং সে রাজকন্যা মদনরেখাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তাহারা রাজাকে এই অদ্ভুত সংবাদ প্রদান করিলে রাজা গর্দ্দভের নিকট গমনকরতঃ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ গর্দ্দভ গন্ধর্ব্বসেন নামক এক গন্ধর্ব্ব, শাপবশে গর্দ্দভ আকার ধারণ করিয়াছে। রাজা তাহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইলে কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় গন্ধর্ব্ব-সেন রাজাজ্ঞায় এক রাত্রির মধ্যে উজ্জয়িনী-নগর পিতলের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিলেন। রাজাও আপন কন্যা মদনরেখাকে গন্ধর্ব্বসেন হস্তে অর্পণ করিলেন। বিবাহের কিছুদিন গত হইলে, একদা রাত্রিকালে রাজ-মহিষী দেখিতে পাইলেন, যে গন্ধর্ব্বসেন গর্দ্দভের খোলস পরিত্যাগকরতঃ সুন্দর পুরুষবেশে মদনরেখার কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। রাজমহিষী তৎক্ষণাৎ সেই খোলসটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরদিন গন্ধর্ব্বসেন মদনরেখাকে বলিলেন "আমার শাপান্ত হই-য়াছে; আমি গন্ধর্ব্বলোকে চলিলাম, তিনি আরও বলিলেন যে তোমার গর্ভে সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্ত একটী পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র বিক্রমা-দিত্য নামে জগদ্বিখ্যাত হইবে। আর তোমার সখীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরি নামে আর একটী পুত্র জন্মিবে। আবার এরূপও কিম্ব-দন্তী আছে যে রাজা স্বয়ংই গর্দ্দভের চর্ম্ম পুড়াইয়া ছিলেন। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্তিকাবৃষ্টি করতঃ উজ্জয়িনীনগর জনপ্রাণীসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করেন। মদনরেখা গন্ধর্ব্বসেন প্রমুখাৎ এ বৃত্তান্ত অবগত থাকায় উজ্জয়িনীনগর ধ্বংসের পূর্ব্বেই পুত্রসহ অন্যত্র পলায়নকরতঃ প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নি-পুরাণে মদনরেখার পিতার নাম সদাশ্বসেন ও ভবিষ্যপুরাণে বসুধা লিখিত আছে।

নিম্নে পাঠকগণের অবগত্যর্থে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইল।

"Ujjain is the terminus of

the Bhopal Ujjain Railway and the junction between the broad and metresystems worked by the Bombay, Borada and Central India Railway. It is a town in Gwalior state on the bank of the River Sipra; and is the head-quarter of Malwa Division.

Ujjain was in ancient times the famous capital of Malwa, one of the seven sacred cities of the Hindus and the spot which marked the first meridian. of Hindu Geographers. The Kingdom of Malwa with its capital fell into the hands of the Mahomedan Kings of Delhi in the time of Ala-uddin (1295-1317) The Mahomedan Kingdom lasted till 1531, when it was absorbed into the Guzrat by Bahadur Shah. In 1571 this part of India was conquered by Akbar and re-annexed to the Empire of Delhi. In 1792 Ujjain was captured by Holkar, but subsequently fell into the hands of Scindia, whose capital it was till 1810, when Dowlat Rao. Scindia removed his residence to Gwalior.

The ruins of the old city destroyed by earthquake are still visible to the east of the new city.

The modern city of Ujjain is surrounded by a stonewall with round towers. The principal bazar is a spacious street with houses of two stories. Near the southern part of the city is the observatory erected by Joy Singha, Maharajah of Jaypur. The chief trade of the place consists in the export of opium and the import of European goods (principally fabrics). A cotton press has been erected by the state and close by is a ginning and weaving Mill.

The palace of the Maharajah of Gwalior is about 2 miles from the station.

There are waiting and refreshment rooms at the station, there is also a sarai and a dak-bunglow close to it.

Ujjain is 220 miles from Bombay by the Bombay, Baroda and central India Railway, third class fare is Rs. 2-5-0.

আমরা অবন্তীকায় ত্রিরাত্র বাসকরতঃ প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলাম। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

উপেক্ষিত উপহার।

১

জলধির দেওয়া বারি যত্নে জলধর,
বর্ষি' তারে পুনরায় করে গো অর্পণ;-
যতনে অমনি সিন্ধু রাখে হৃদোপর,
ভক্তদত্ত উপহার করিয়া গ্রহণ।

২

কিন্তু একি!—তাঁরি দান তাঁহারি চরণে,
দিনু সযতনে আমি ভক্তিমুগ্ধ-চিতে;
নিল না সে তাহা; হায়! কি হেতু কে জানে,—
তুচ্ছ উপহার; তাই?—সন্দেহ কি ইথে!

৩

নাহি জানি তুচ্ছ কিম্বা মহামূল্যবান্।
দিয়েছিলে তুমি নাথ! ডাকি অভাগারে,
রেখেছিল যতনে সে সামগ্রী মহান্,
লুকাইয়ে আপনার হৃদয় মাঝারে।

৪

তোমারি পূজায় নাথ! ভক্তি পূতমনে,
দিয়েছিল পুনরায় সঁপিয়া তোমারে;-
(দীন সে, কি দিবে আর বল, তাহা বিনে)
ঠেলিলে চরণে যদি কি করিতে পারে?

শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ।

———0———

পন্থা।

(অপরাংশ)

পৃথিবীর আদি হইতে আরম্ভ করিয়া জীব দুঃখের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং এই দুঃখনিবৃত্তির জন্য কত যন্ত্র-মন্ত্র-ঔষধাদি আবিষ্কার করিয়া ও কত বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া সহস্র চেষ্টায় ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যর্থ হইয়া ভারতের মননশীল মহর্ষিগণ ইহার সত্যসন্ধান অবগত হইয়া প্রচার করিয়াছেন—বিশ্বজননী প্রকৃতির মোহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ সম্ভব, তদ্ভিন্ন সকল চেষ্টাশূন্যমার্গে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় নিষ্ফল।

ব্রহ্মচৈতন্যসংযুক্ত প্রকৃতি এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্ত্রী ও সম্রাট। কল্পান্তের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্বের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং কল্পশেষে মহাপ্রলয়কালে প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তি সংহৃত হইয়া একমাত্র অব্যক্ত ও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম রহিবেন—আর্য্য-ঋষিগণ যোগসিদ্ধ হইয়া এই তত্ত্ব সম্যকপ্রকারে অবগত হইয়াছিলেন;—অব্যক্তের ব্যক্ততারূপ ক্রিয়াশক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—সবিকার ও সগুণের আচ্ছাদনে নির্ব্বিকার ও নির্গুণ ব্রহ্মত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন—এবং অব্যক্ত-সংশ্রব-শূন্য জীবজগতের চির-আশ্রয় সগুণব্রহ্মে পর্য্যবসিত দেখিয়াছিলেন। এই সগুণ ব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষ, ইনিই মহাকাল অথবা

মহাবিষ্ণু, ইনিই ঈশ্বর অথবা ভগবান্, ইনিই অর্দ্ধনারীশ্বর প্রকৃতিপুরুষ এবং প্রকৃতি কুক্ষিগত পুরুষের কর্ত্তৃত্বশূন্যতাহেতু ইহাকে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মহাকালী নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইনিই প্রধান, ইনিই প্রকৃতি। একজন যাঁহাকে বলেন সগুণ ব্রহ্ম, অন্যজন তাঁহাকে বলেন প্রকৃতি এবং এইজন্যই শাস্ত্রকর্ত্তাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি বিভিন্ন নহেন, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় ভেদরহিত এবং পরস্পর সাপেক্ষ মাত্র।

এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মসংযুক্ত প্রকৃতির লীলাপ্রসূত এবং তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে নিয়মিত রহিয়াছে। তাঁহারই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীব আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে না; কি যেন এক আঁধারের আলোক,—পিপাসার পানীয়—এবং নিভৃতের সঞ্চিত ধনের আকাঙ্ক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিপতিত হইতেছে। প্রকৃতির এই মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, আর্য্যঋষির এই অভ্রান্ত উপদেশ যুগযুগান্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কলির ঘোর অজ্ঞানতমসায় অন্ধ হইয়া দুঃখদারিদ্র্যপ্রপীড়িত ভারতের বর্ত্তমান সন্তানগণ, অহঙ্কারোদ্দীপ্ত পাশ্চাত্যবৈদেশিকগণের তমঃপ্রধানক্ষাত্রধর্ম্মোচিত সিদ্ধান্তের কোলাহলে বধিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে না। হায়, হায়! ভারতের সন্তান লালসাপূর্ণহৃদয় বৈদেশিক বন্ধুর সৌহার্দ্দ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, শ্রবণপটাহের নিকটস্থ হইয়া তাহার সহোদর ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে 'প্রবুদ্ধ হও' বলিয়া আকুলকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে, সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া শতযোজনদূরস্থ সেই বৈদেশিক বন্ধুর হৃদয়ও চমকিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি তাহার চৈতন্য হইতেছে না। আর যাহারা জন্মান্তরীন পুণ্যফলে এই তত্ত্বোপদেশের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারাও ভ্রান্ত হইয়া আত্মশক্তিদ্বারা প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়াস করিতেছে এবং এই ধৃষ্টতার প্রতিফল স্বরূপ সংসারজালে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতেছে। যাঁহার শক্তিতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুপর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত তাঁহার বন্ধন আত্মশক্তি দ্বারা ছিন্ন করিবার চেষ্টা, হিমালয় নিসৃত জাহ্নবীস্রোতের গমনপথে ঐরাবতের বিফল বিরুদ্ধশক্তিপ্রয়োগ হইতেও যে অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক তাহা আজ কেহই লক্ষ্য করিতেছে না।

আর্য্যঋষিগণের জ্ঞানকর্ম্মের যথাক্রমিক উপদেশ, কাণ্ডারীহীন তরণীর নাবিকের মত সদ্গুরুর অবলম্বনশূন্য ভারত-সন্তান কর্ত্তৃক যথোচিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে না, তাই আজ ইহাও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইতেছে, যে প্রেমে তাঁহার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা—যায়, প্রেমে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। অস্তি, ভাতি এবং প্রীতির স্বভাবস্বরূপ তাঁহারই অভিব্যক্তি এই জীব, ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি এবং প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অন্তরের অন্তরে প্রীতির পুণ্যস্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াও উহাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দূরে অপসৃত করিয়া দুঃখসাম্রাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছি। আজ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছে। সমাজের শীর্ষস্থানীয়, পৃথিবীর

প্রত্যক্ষ দেবতা ব্রাহ্মণ, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় যে নিখিলবিশ্বাত্মিকা প্রাণশক্তি গায়ত্রীর ধ্যান করিতেছে, তাহার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতেছে না। যিনি দিবাকরমণ্ডলাভ্যন্তরস্থ তৎপ্রকাশক আদিত্যদেবস্বরূপ পরমপুরুষরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গলাভের নিমিত্ত তাঁহারই দিকে নিরন্তর প্রেরণ করিতেছেন, আমরা জননমরণভীতি-বিদূরণার্থে ত্রিভুবনের প্রাণস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছি—গায়ত্রীর এই ধ্যানে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অভিনিবিষ্ট হইতে ঋষিগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু হায় কালের কি অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এই অন্ধকারের বিদ্যুৎ-ঝলকময়ী, শক্তিহীনের বড় আশার আশ্বাস-বাণী, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের পক্ষাঘাতগ্রস্ত হৃদয়কে ঝঙ্কৃত করিতেছে না; ব্রাহ্মণ বুঝিতেছে না যে অনুক্ষণ যিনি তাঁহারই দিকে আমাদিগকে প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রিয় না হইয়া পারেন না,—আমাদিগের আপনার না হইয়া পারেন না। এই তত্ত্ব আমাদিগের লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই সগুণ ব্রহ্ম বা প্রকৃতির প্রীতিস্বভাব আমাদিগের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা-হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রকৃতির মোহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে অর্থাৎ তাঁহার শান্তিময় ও আনন্দময় স্বরূপ অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়া প্রেমের বন্ধনে তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায়, জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যমুখী ইচ্ছা এবং কর্তৃত্বা-ধীনে জীব অবশ হইয়া কেবল দুঃখের সাম্রাজ্যে ইতস্ততঃ ঘূর্ণ্যমান হইতেছে, আপনার কর্তৃত্বাভিমান বিস্মৃত হইয়া জীব যদি জননীর প্রতি বালকের ন্যায় নির্ভর সম্বল হয়,—তাঁহাকে মঙ্গলময় ও প্রেমময় জানিয়া নিবিষ্ট অন্তঃ-করণে যদি তাঁহাকেই ভাবনা করে,—দৃশ্য-জগতের সকল সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করিয়া যদি তাঁহারই স্তুতিগান হৃদয় হইতে স্ফুটিত হয়,—তবে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-প্রকৃতি প্রসন্ন হইয়া প্রকারান্তরে জীবের বশীভূত হয়, জীব তখন অনন্ত সুখের রাজ্যে বিচরণ করে—ইহারই নাম প্রকৃতির বন্ধনচ্ছেদ,—ইহা-রই নাম মুক্তি। জীব যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত-হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুব্যাপী ব্রহ্মত্বের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক প্রেমের চিত্রপট সহস্র-কোটী স্নিগ্ধসূর্য্যের প্রভায় তাহার অন্তরে বাহিরে উন্মুক্ত হইয়া যায়, অনন্ত বিশ্বব্যাপী অনন্ত একত্বের মধ্যে দ্বৈতভাব উপলব্ধি করে, জ্ঞানময়ী মহাবিষ্ণু বা মহাকালী মূর্ত্তির অভ্যন্তরে ভাবময়ী রাধাকৃষ্ণ বা হরগৌরী মূর্ত্তি প্রকটিত হয়,—নিরাকার সাকারত্বে পরিণত হয়,—দ্বৈতের একীভূত হইয়া জীব স্বাবলম্বনপূর্ণ আনন্দময় হয়—ইহারই নাম ব্রহ্মানন্দ ও ইহারই নাম প্রেম। জীব তখন স্বাধীনচেতা হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিকারপ্রাণে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সতত বিমলালোকে শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মব্যাখ্যা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হয়, জগতের সমস্ত কুহেলিকা বিদূরিত হইয়া তত্ত্বসকল সম্যকপ্রকারে পরিস্ফুট হয়, জগদ্-গুরুর স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতি-নিষ্পে-ষিত ভয়ব্যাকুলিতচিত্ত মোহভ্রান্ত ভ্রাতৃগণকে

সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন—মাভৈঃ মাভৈঃ—ভীত হইও না, দুঃখের অভিঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক সুখের অস্তিত্ব অসম্ভব মনে করিও না, আমি সেই প্রেমময়কে জানিয়াছি, তাঁহাকে পাইলে সকল দুঃখের অন্ত হইয়া যায়। দানবদলনী করালবদনী কালী তাঁহার রক্ষয়িত্রী হইয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হন,—সামঋগাদি চতুর্ব্বেদ সহকারে বিদ্যাবিধায়িনী সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠাগ্রে অধিষ্ঠিত হন,—সর্ব্বাভিষ্টপ্রদানকরী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী অন্নপূর্ণা তাঁহার ধর্ম্মগৃহে প্রতিষ্ঠিত হন, নির্ব্বিকারত্ব ও উদাসীনতা লইয়া শিব তাঁহার পুণ্যদেহ আশ্রয় করেন, প্রেমমধুময় রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়নিকুঞ্জ আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত হয় আর তিনি জগতের মঙ্গলার্থে জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য গম্ভীর হুঙ্কারে দিগ্‌-দিগন্ত প্রবুদ্ধ করিয়া কহিয়া থাকেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

প্রীতি যে জীবের স্বভাব ইহা বুঝাইতে দর্শন—বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, মানুষ নিজের স্বভাব একটুমাত্র প্রণিধান করিলেই ইহা বুঝিতে পারে। প্রীতি বা প্রেম জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীব সর্ব্বদাই অপর হইতে ইহা প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং নিজেও অপরকে ইহা প্রদান করিতে ব্যগ্র হয়। আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন—জীবের এই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সেই প্রেমময় সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবানের প্রেমস্বভাব এবং সকলকে তাঁহার প্রতি মহান্ আকর্ষণের ফল। মানুষ চিরকাল তাঁহাকে পাইবার জন্যই পাগল, বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া অমৃতের আশায় হলাহল পান করে। আর্য্যঋষিগণের এই তত্ত্বোপদেশ আমরা যদিও সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু এমন এক সময় আমাদের হয় যে সময় আমরা ক্ষণকালের জন্য বুঝিতে পারি যে জাগতিক সমস্ত বস্তু হইতে আমাদের প্রীতি উঠাইয়া লইয়া একমাত্র ভগবানের উপর বিন্যস্ত করাই উচিত এবং শান্তি ও আনন্দের আশায় কেবল তাঁহাকেই ভজনা করা কর্ত্তব্য। আমরা যে প্রকার সমাজ লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, সেই সমাজে থাকিয়া আমরা অনেক প্রকার ভাবের মধ্যে পতিত হই, এবং তত্তৎভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানা বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যে আপনাদের শক্তি ব্যয়িত করি। অন্নচিন্তায় আকুল হইয়া ইতস্ততঃ মনোনিবেশ করিতে করিতে অত্যাচার ও ব্যাভিচারস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেই, ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রবল উত্তেজনায় নীতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উন্মার্গগামী হই, চপলতার পূর্ণ আবেগে বন্ধুবান্ধবের সহিত হাস্যরসিকতায় মগ্ন হই, কিন্তু আমাদের এই মোহমত্ততার মধ্যে যমরাজের বিজয়দুন্দুভি একসময়ে আমাদিগকে জাগাইয়া দেয়,—সাধু সজ্জনের জীবনদৃষ্টান্ত এবং অভ্রান্ত উপদেশ একসময়ে আমাদিগকে চিন্তাশীল করে,—ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত ও স্তোত্রাদি একসময়ে আমাদিগের মন সরস করিয়া দেয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, এই যে সংসার লইয়া আমরা বিব্রত রহিয়াছি, ইহা ত চিরসঙ্গী নহে, ইহা অস্থায়ী এবং দুঃখপ্রদ; যিনি এই সংসারচক্রের নিয়ন্তা এবং যিনি

আমার সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতা, তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বক্ষণ আমার জীবন কর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিসঙ্গত। কর্ম্মফল, পরলোক, স্বর্গনরক, পাপপুণ্য এবং আহারবিহারের বিধিনিষেধ প্রভৃতি শাস্ত্রকর্ত্তাগণের সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বন্ধে আমার যেরূপ মতই থাকুক না কেন, আমি অনেক সময়ে হৃদয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ইহা বুঝিতে পারি যে ভগবানকে ভাল না বাসিয়া আমার জীবন বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ভগবানকে ভজনা না করিয়া আমার মনুষ্যজন্ম বিফল হইয়া উঠিতেছে। যদিও আমরা অতি সামান্যমাত্র সময়ের জন্য এ বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি কিন্তু এই চিন্তার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নহে। আমরা বাস্তবিক বুঝি যে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নিবিষ্ট হইতে না পারিলেও সংসারের দৈনন্দিন সকল কার্য্য করিয়া ভগবানের জন্যও আমাদের কর্ম্ম করা উচিত এবং কিছু সময় তাহার জন্যও আমাদের ব্যয় করা উচিত। কিন্তু বুঝিয়া-শুঝিয়াও ঐশ্বরিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি না; লোকের উপদেশে এবং বক্তৃতায় যদিইবা মনটা একটু ভগবন্মুখী হয়, শরীর তখন অবশ হইয়া এলাইয়া পড়ে, পূরা এক ছিলিম তামাক খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ি, সকল বিপদ মিটিয়া যায়। ঈশ্বরভজন আমার কর্ত্তব্য ইহা বুঝিলেও আমি উহা করিতে পারি না; সর্ব্বদাই মনে হয় উহা আমার সাধ্যাতীত। প্রতিদিন ইহা আমি বুঝিতেছি এবং প্রতিদিন এই সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মন হইতে এবিষয়ের চিন্তা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তবে এখন জিজ্ঞাস্য এই যদি আমি সামান্যমাত্র সময়েও অভ্রান্তরূপে বুঝিয়া থাকি যে ঈশ্বরভজন আমার একান্তপক্ষে কর্ত্তব্য এবং আমি নিতান্ত শক্তিহীন বলিয়া তাহা করিতে পারিতেছিনা তবে আমার এখন পন্থা কি? কি পন্থা অবলম্বন করিলে আমি ঈশ্বরভজনে শক্তি পাইব, আমার সংসারিক সকল কার্য্য করিয়াও ঈশ্বরের প্রতি মন সর্ব্বক্ষণের জন্য অনুরক্ত থাকিবে এবং পৃথিবীর সকল ভালবাসার বস্তু অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র তাহাকে ভালবাসিতে সমর্থ হইব? যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সহিত কথা কহা যায় না, যাঁহার কোন প্রকারের সন্ধান কোনদিন পাই নাই, তাহাকে কেমন করিয়া ভালবাসিব? সাংসারিক যাবতীয় পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু তাহাকে ত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কেবল নাম শুনিয়াছি, তিনি একজন আছেন, ইহা সকলের মুখে শুনিয়াছি, মন্দিরের বিগ্রহ মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে তাঁহার রূপকল্পনা দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া, তাঁহার সত্তা একেবারেই উপলব্ধি না করিয়া, শূন্যে গ্রন্থিবন্ধনের বিফলতার মত কিছুতেই তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেছি না। ইহার কি উপায় কিছু নাই? সংসারে এমন লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বাস্তবিক প্রাণে প্রাণে ঈশ্বরকে ভজনা করিবার প্রয়াসী, কিন্তু সাংসারিক নানা গণ্ডগোলে এবং ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রেরণায় তাহার ঈপ্সিত কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে না। ইহারা নিজের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন এবং

একটা পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র রহেন। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব এই শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে নিতান্ত কম নহে; বরং এত অধিক যে তাহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

আর্য্যঋষিগণ জনসমাজের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা দীক্ষা। দীক্ষাগ্রহণ করিলে জীব আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার অধিকারী হয়। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া জীব নূতন জীবন প্রাপ্ত হয় এবং আপনার প্রকৃতি ও অধিকারানুযায়ী নাম ও রূপকল্পনার বিশেষত্ব অনুসারে ঈশ্বরের বীজমন্ত্র লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার প্রতি সংযুক্ত থাকিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যাহারা তরুণবয়স্ক তাহারা দীক্ষার আবশ্যকতা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠজ্ঞানী, তাহারা বলেন—ঈশ্বরের ভজনায় জন্মাবধি সকল জাতির এবং সকল প্রকার প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরই বৃদ্ধবালকনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার রহিয়াছে, ইহাতে দীক্ষানামক গুরুতাব্যবসায়ী পরধনপুষ্ট ব্রাহ্মণগণের তান্ত্রিকী অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাদিগের এই যুক্তি যুদ্ধের কেশলকতার মধ্যেও প্রবেশ করে দেখিতে পাই। কিন্তু একথা একবারও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে যাঁহারা ঈশ্বরভজনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন এবং পথভ্রান্ত জীবের দুঃসহ ত্রিতাপক্লেশ সন্দর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য চণ্ডাল ব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে এই ধর্ম্মজগতের জন্মগ্রহণরূপ দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই আমাদের চেয়ে চিন্তাশীলতা এবং তত্ত্বজ্ঞানে হীন ছিলেন না। একবার শিক্ষিতসমাজ ইহার প্রতি আপনার মন অভিনিবিষ্ট করিলে দীক্ষার চিরবসন্তরাজিত জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গরাজ্য ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া চক্ষুর সম্মুখে আপনার স্বরূপ প্রকাশিত করিবে, প্রাণে প্রাণে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে।

এই যে মানুষ দুঃখনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বক্ষণ আকুল, তাহার এই দুঃখনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই বিশেষত্ব রহিয়াছে যে মানুষ কেবল একাকী শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতে চায় না, সর্ব্বদাই তাহার দ্বৈতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত রহিয়াছে। নিজে ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ অন্য এক ব্যক্তিত্বের সংসর্গে থাকিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিতেই চায় এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব সকল ঐশ্বর্য্য ও মধুরিমার পূর্ণতায় পর্য্যবসিত না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষার অবসান হয় না। যে দিন মানুষ বুঝিতে পারে একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও উপরে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকৃত নিবাস নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সে দিন মানুষ আপনার ভাব এবং প্রবৃত্তির অনুযায়ী এক নয়নানন্দকর মোহিনীমূর্ত্তি মানসপটে চিত্রিত করিয়া তাঁহার সহবাসের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। ধর্ম্মবীর-প্রসবিনী ভারতভূমির ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া নানা বিভিন্নপ্রকৃতি-জীবের জন্য প্রেমের চরম লক্ষ্য আনন্দময়

ভগবানের তেত্রিশকোটী রূপ কল্পনা জগতের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং ভাবের সাকারত্ব-সম্পাদনকারী বিরাটশক্তিসম্পন্ন বীজ-মন্ত্রসকল প্রকাশিত করিয়া জীবের মোক্ষ-পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। যুগযুগান্তর হইতে কত শত সহস্র মহাত্মা এই সকল বীজ-মন্ত্র সাধন করিয়া, ভাবের সাকার মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাদের সিদ্ধিপ্রাপ্ত-শক্তি দ্বারা ইহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান শক্তিহীন জীবের ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্‌গণ আজিও তাহার সাহায্যে ইষ্ট-সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে মিমাংসাদর্শনের সাহায্যে স্থায়ের বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান সমাজে আবশ্যকতা নাই, এডিসনের ফনোগ্রাফ তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছে; পৃথিবীর সকল মহাদেশের চিত্রকরগণ ভাবের সাকার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শিক্ষিতের মনোরঞ্জন করিতেছে এবং প্রতিদিন মানুষ বক্তৃতায় ও অভিনয়ের শব্দঝঙ্কারে ভাবোদ্দীপক শক্তির পরিচয় পাইতেছে; সুতরাং এমতাবস্থায় নিত্য-ভগবানের সহিত বীজমন্ত্রের নিত্য-সম্বন্ধ ও তাহার অব্যর্থ কার্য্যকারিতা কাহাকেও বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। মানুষ একটুমাত্র সমাহিতচিত্তে চিন্তা করিলে বীজ-মন্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে পারে এবং সুদূর প্রবাসে অবস্থিত প্রিয়তম স্বামীর ভাবনা করিতে করিতে প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নী যেমন সর্ব্বক্ষণ তাহার নাম স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করে, সেইরূপ আপনার ভাব এবং প্রবৃত্ত্যানুযায়ী ভগবানের বিশেষ এক রূপ কল্পনার এক বিশেষ নামস্বরূপ বীজমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। মানুষ ভগবানের জন্য লালায়িত হইলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আপনার ভাব অনুযায়ী বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হয় এবং গুরুমুখাৎ সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তালসংযুক্ত জপের সাহায্যে একদিন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সিদ্ধকাম হয়।

সামরিক বিভাগের সংবাদ যাহারা রাখেন তাহারা জানেন যে একদল সৈনিকসহ কোন এক নদীসেতু অতিক্রম করিতে হইলে দলের অধিনায়ক সৈনিকগণের তালপদবিক্ষেপ ভঙ্গ করিয়া বিপর্যস্ত পদক্ষেপে চলিবার আদেশ করেন; তাহার কারণ এই সম তালসম্ভূত বহু সৈনিকের পদক্ষেপ শব্দের প্রভূত শক্তিতে সুদৃঢ় সেতু একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইতে পারে। আর্য্যঋষিগণ তালসংযুক্ত শব্দের এই অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই বীজমন্ত্র সমূহ তালসংযোগে জপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শৃগালের গৃহে শৃগাল এবং সিংহের গৃহে সিংহের স্থায় ভগবানের চিরসঙ্গত ব্যবস্থায় জীব সমান ভাব ও সমান প্রবৃত্তিবিশিষ্ট বংশমধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সেই বংশানুক্রমিক কুলমন্ত্রই ভবব্যাধির অমোঘ ঔষধ স্বরূপ তাহার কাণের ভিতর দিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেই চির নূতন ও চির পুরাতন, হৃদয়ের বড় আদরের ধন, বীজ মন্ত্রে বিরাট শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া ভগবানের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয় এবং তাহার মনুষ্যজনম সফলতা প্রাপ্ত হয়। দীক্ষা এই বীজমন্ত্র মানুষকে আনিয়া দেয়, দীক্ষা মানুষকে প্রকৃত পথে টানিয়া নেয় সুতরাং দীক্ষাই আমাদের প্রথম পন্থা।

শ্রীযোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

—:o:—

সাধক-সঙ্গীত

[৪]

ছি! ছি! মা তোর একি বাসনা।
এমন ধারা নাই দেখা বা শুনা, শবাসনা হলি,
বাস না পরিলি,—না পরিলি মণিমুক্তা বা সোণা॥
যে পতির কারণে ত্যজিলি নিজ প্রাণে,
তারই বক্ষে নাচ, না চা'লি তার পানে,
কাঁটা দিলি শিবে সতীত্ব সোপানে,
শোণিত পানে আবার দেখি মগনা॥
কুলনারী হয়ে কেবা এত হাসে,
অনায়াসে রণে এসে মুক্তকেশে,
অকরুণ ভাষে কে এমন সম্ভাষে,
রক্ত রসে কার বা ভাসে রসনা॥
বিরোধ কালে কার বা ক্রোধ এমন প্রবল,
কপাল ফলকে ঝলকে অনল,
খড়্গহস্তা এমন মেয়ে আছে কে বল;—
গোবিন্দেরে কেবল দিতে যাতনা॥

——০——

পাগলের দর্শন।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(১)

এই যে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড ইহা কি? ইহা পঞ্চভূতের চরম ব্যক্তাবস্থার ফল। ইহাতে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব কি প্রকারে বুঝা যায়? ইহা কতটুকু স্থান ব্যাপিয়া স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ করিতেছে, এই ব্যাপকতার কারণ-শক্তি আকাশ। ইহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, এই রূপান্তরশীলতার গতি কারণ-শক্তি বায়ু। সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত হইয়া রূপান্তরিত হয়, এই বিভক্ত কারণ-শক্তি তেজ! পরমাণুর সংযোগে অস্তিত্ব, এই সংযোগ কারণ-শক্তি

ব্যক্তরূপে-জল। এই চতুর্ব্বিধ শক্তির সমন্বয়ে স্থূল কাষ্ঠখণ্ডরূপে প্রকাশিত, এই স্থূল কাষ্ঠখণ্ডরূপে প্রকাশ কারণ-শক্তি ক্ষিতি। পঞ্চভূতের সামঞ্জস্যে সংযোগ কারণ-শক্তির ঐকান্তিক বিকাশ হইতেই পদার্থ সমুহ স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়।

কাষ্ঠখণ্ডে আঘাত করিলে কঠিন বোধ হয়, এই কাঠিন্য বিষয়টী কি? এই কাঠিন্য সাকার কি নিরাকার? জল লঘু পদার্থ ইহা হইতে তেজের ব্যক্তাবস্থা, অর্থাৎ তাপের স্থূলাংশ বাহির করিয়া ফেলিলেই কোন অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হইয়া স্থূল বরফরূপে প্রকাশিত করে এবং কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কাঠিন্য সেই অব্যক্ত শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? *

কাষ্ঠখণ্ড সম্বন্ধেও তাহাই, কোন অব্যক্ত শক্তির ব্যক্ততায় পরমাণুসমষ্টি একান্ত সংযোগিত হওয়ায়, স্থূল কাষ্ঠখণ্ড রূপে প্রকাশিত। সুতরাং পরমাণুসমষ্টি একান্ত সংযোগিত হওয়ার কারণ বিকশিত সংযোগ কারণ-শক্তি ইহার ঐকান্তিক ব্যক্ততাই স্থূল কাঠিন্য।

এই শক্তির ব্যক্তাবস্থায় সাকার, অব্যক্তাবস্থায় নিরাকার। ব্যক্তাবস্থায় স্থূল কাঠিন্য রূপে প্রকাশিত হইলেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় সুতরাং এই অবস্থায় স্থূল আকারবিশিষ্ট বলা যায়; কিন্তু যখন অব্যক্তাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে (অর্থাৎ জলের লঘু অবস্থায় যখন অব্যক্ত থাকে) তখন ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; সুতরাং এমতাবস্থায় এই শক্তি নিরাকার পদবাচ্য।

সংযোগ-কারণ-শক্তির স্থূলাবস্থা রস অর্থাৎ জল। * সূক্ষ্ম রাগ-দ্বেষময়-সংযোগ কারণ শক্তিকে সাময়িকভাবে অব্যক্ত রাখিয়া পরমাণু সমষ্টির সংযোগ করিয়া থাকে এবং বিস্তার কারণ ও গতি কারণ শক্তির সাহায্যে স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্থায়ীরূপে গণ্ড কারণ-শক্তিকে অব্যক্ত রাখিতে সক্ষম হয় না বলিয়া, বরফ পুনরায় জলে পরিণত হয়, স্থূলদেহ পুনঃ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে।

---

* বরফ প্রস্তুত করিতে হইলে তাপের স্থূলাংশটুকু মাত্র বাহির করিতে হয়, সূক্ষ্ম অব্যক্তাংশ অর্থাৎ Latent heat) বর্ত্তমান থাকে, ইহাই পুনঃ ব্যক্ত হইয়া বরফকে জলে পরিণত করে।

Boiling point—100°c freezing point 0°c. Ice latent heat 86°F. If you mix salt with ice if will go below -12°c.

* আধুনিক জড় বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, Hydrogen (উদজান) Oxygen (অম্লজান) উভয়ের Combination (সংযোগ, মিশ্রন নহে) হইলে জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখাযায়, এই দুইটী গ্যাস সংযোগিত হইলে, সংযোগ-কারণ-শক্তি প্রকাশিত হইয়া ক্রমে স্থূলাবস্থায় জলরূপে পরিণত হয়।

পাগল জড়বাদী নহে, তাহার জ্ঞানের ভিত্তি একমাত্র যোগ, সুতরাং জড়ের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিবার আবশ্যক নাই। যদিও মূলতঃ জড়বাদীদের সহিত এক মত নয় তথাপি সূক্ষ্মভাবে এক রহিয়াছে, যেহেতু তাহাদের জড়ের উৎপত্তি-স্থান ভক্তি করিয়াই লিখিতে হইতেছে।

এইরূপে ক্ষণিক একশক্তির একান্ত বিকাশে অন্য শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জড় পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; এবং আমরা যাহাকে নূতন সৃষ্টিকার্য্য বলি, তাহা এইরূপেই সংঘটিত হইতেছে। ব্যক্তশক্তি ও অব্যক্তশক্তি উভয়ের চরমে সাম্যাবস্থার নাম স্থিতি। যে অবস্থাকে আমরা স্থিতি বলি, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির নহে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝাযায় প্রতি অনুপলে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে; যেহেতু ভূমাগতি অবিরাম অনন্তদেশে ধাবমান সুতরাং কোন অবস্থাই এক অনুপলের জন্যও স্থিতি লাভ করিতে পারে না! স্থিতি-বিষয়টী কেবল স্থূলদৃষ্টিতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপে ক্ষণিক একশক্তির একান্ত বিকাশে অন্য শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জড় পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্তহয়; এবং আমরা যাহাকে নূতন সৃষ্টিকার্য্য বলি, তাহা এইরূপেই সংঘটিত হইতেছে। ব্যক্তশক্তি ও অব্যক্তশক্তি উভয়ের চরমে সাম্যাবস্থার নাম স্থিতি। যে অবস্থাকে আমরা স্থিতি বলি তাহা একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির নহে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় প্রতি অনুপলে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে ; যেহেতু ভূমাগতি অনন্ত দেশে ধাবমান সুতরাং কোন অবস্থাই একঅনুপলের জন্যও স্থিতি লাভ করিতে পারে না। স্থিতি-বিষয়টী কেবল স্থূলদৃষ্টিতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যখন সংযোগ-কারণ-শক্তি অব্যক্ত হয়, তখন অখণ্ড-কারণ-শক্তি ব্যক্ত হইতে থাকে, সুতরাং স্থূলাবস্থা সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইতে বাধ্য হয়। ইহাই প্রলয় নামে অভিহিত। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। বাস্তবিক সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় কিছুই সৃষ্টি হইতেছে না, সুতরাং কিছুরই ধ্বংস হয় না।

এই শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড চৈতন্য সম্পন্ন কি অচৈতন্য ? প্রথমে দেখা যাউক চৈতন্যাবস্থা কি প্রকারে বুঝি ? কোন পদার্থ গমনাগমনে সক্ষম হইলে তাহাকে চেতনাময় পদার্থ বলা হয়। তাহা হইলে বুঝাগেল, যে শক্তি গমনাগমনে সক্ষম তাহাই চেতনাময়। এক্ষণে দেখাযাউক শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে কোন গমনাগমন শক্তি বর্ত্তমান আছে কি না ?

যখন ইহা সজীব বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান ছিল, তখন যে চৈতন্যসম্পন্ন ছিল সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, তবে এক্ষণে শুষ্ক অবস্থায় চৈতন্যসম্পন্ন কি না ? ইহা শুষ্ক যেহেতু সংযোগকারণ-শক্তি রস, কথঞ্চিৎরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং খণ্ড কারণ-শক্তি তেজ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্যক্তাবস্থার চরমাবস্থাই কাষ্ঠখণ্ড রূপান্তরিত হইয়া মৃত্তিকারূপে প্রকাশিত থাকে। তাহা হইলে দেখা যায়, যে শক্তি সমূহের মিশ্রণে ব্যক্তাবস্থায় কাষ্ঠখণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে সেই শক্তি অব্যক্ত হইয়া সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইল, সুতরাং স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইতে একটী সূক্ষ্ম-গতি-শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহা গতি-শক্তিসম্পন্ন তাহা চেতনাময়, যেহেতু চৈতন্য ভিন্ন গতি সম্ভবপর নয়, গতি অভাবে শক্তি নিষ্ক্রিয়। কাষ্ঠত্ব হইতে মৃত্তিকাত্ব পর্য্যন্ত

পৌঁছিতে যে সূক্ষ্ম গতিশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের, সূক্ষ্ম চৈতন্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কাষ্ঠখণ্ড শুষ্কাবস্থায় গুণময়, গুণ হইতেই শক্তির বিকাশ; গুণ ব্যক্ত হইতে হইলেই গতির আবশ্যকতা। সূক্ষ্ম গুণ চৈতন্যের ইচ্ছাময় অবস্থার ভিত্তি। চৈতন্যের অব্যক্তাবস্থা, এই ভিত্তি আশ্রয় করিয়াই ব্যক্ত-গুণময় হইতে সক্ষম হয়। ব্যক্তগুণই ইচ্ছায় পরিণত হইয়া গতিশক্তি। কাষ্ঠখণ্ডের শুষ্কাবস্থায়ও যখন ব্যক্তগুণ প্রকাশিত রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই ব্যক্তগুণের অব্যক্তাবস্থা সূক্ষ্মগুণ, সূক্ষ্মচৈতন্যের আশ্রয়ে রহিয়াছে। সুতরাং ইহার শুষ্কাবস্থায়ও সূক্ষ্মচৈতনা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড যে চৈতন্যসম্পন্ন তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। যদি ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক অবস্থায় থাকিয়া থাকেন, তবে কাষ্ঠখণ্ডেও তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সগুণভাবে তিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। চৈতন্য যাহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাই চৈতন্যসম্পন্ন হইবে, সুতরাং কাষ্ঠখণ্ড যে অচৈতন্য তাহা কি প্রকারে বলা যায়? তবে যাহা অচৈতন্য বাচ্য তাহা অচৈতন্য নয়, অব্যক্তচৈতন্য।

কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিলে ভার বোধ হয়, এই গুরুত্ব বিষয়টী কি? কাষ্ঠখণ্ড সংযোগ-কারণ-শক্তির ঐকান্তিক বিকাশ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। সংযোগ-ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযুক্ত হইতে হইলে, প্রত্যেক অংশেই আকর্ষণ শক্তির স্থূলরূপ বিকাশ হওয়া আবশ্যক।

যেহেতু প্রত্যেকে প্রত্যেককে আকর্ষণ না করিলে স্বভাবতঃ সংযুক্ত হইতে পারে না আকর্ষণ ভিন্ন যখন সংযোগক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, তখন উভয়ে নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ সংযোগকারণশক্তি সূক্ষ্ম, আকর্ষণ শক্তি স্থূল। যাহা স্থূল তাহা সূক্ষ্মেরই ব্যক্তাবস্থা, তাই স্থূল পদার্থে আকর্ষণশক্তি ব্যক্তরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সংযোগকারণ-শক্তির স্থূলাবস্থায় চতুর্ভূতের সামঞ্জস্যে ক্ষিতির উৎপত্তি। এই সামঞ্জস্য শক্তিই সংযোগ-কারণ-শক্তির সাহায্যে আংশিকরূপে স্থূলভাবে কাষ্ঠখণ্ড, সুতরাং উভয়ের মূলবিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই আকর্ষণ শক্তি স্থূলরূপে প্রকাশিত থাকিতে বাধ্য, যেহেতু উভয়ই স্থূল। ক্ষিতির এই আকর্ষণশক্তিকেই বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংযোগকারণশক্তির ব্যক্তগুণ আকর্ষণশক্তি, তাই ইহার স্বভাব অন্তর্মুখী, কেন্দ্রানুকূল। এবং খণ্ডকারণ-শক্তির ব্যক্তগুণ কেন্দ্রের প্রতিকূল বহির্মুখী স্বভাবাপন্ন বিকর্ষণ শক্তি।

পৃথ্বীস্থিত ভূমা-আকর্ষণশক্তি খণ্ড কাষ্ঠস্থিত আকর্ষণ শক্তিকে মিলিত করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত; তাই কোন পদার্থ উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে, তাহা পুনরায় পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া থাকে। কাষ্ঠখণ্ড যখন পৃথিবীর সহিত যুক্ত থাকে তখন তন্মধ্যস্থিত খণ্ড আকর্ষণশক্তিও পৃথিবীস্থিত ভূমা শক্তি, উভয়ে সগুণবিশিষ্ট হইয়া, উভয় শক্তিই মিলিতাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই মিলিতাবস্থার বিচ্ছেদসময়ে উভয়ের সংযোগ স্বভাবে যে ব্যাঘাত জন্মে তাহাই ব্যক্তরূপে গুরুত্ব। এই বিচ্ছেদকারণশক্তির তারতম্যানুসারে পদার্থের গুরুত্বের

তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পরমাণুসমষ্টি যে পদার্থে যত অধিক হয় আকর্ষণ শক্তিও তাহাতে তত অধিক বর্ত্তমান থাকে।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথিবীতে পরমাণু সমষ্টি অধিক বলিয়া আকর্ষণশক্তিও তাহাতে অধিকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকার আধিক্য বর্ত্তমানহেতু প্রত্যেক পদার্থই পৃথিবী-যুক্ত থাকিতে বাধ্য। যে খণ্ডপদার্থে পরমাণু সমষ্টির তারতম্যভেদে যতটুকু আকর্ষণ শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্নকালীন, মিলনস্বভাব বর্ত্তমান-হেতু মিলিত থাকিতে বিচ্ছেদশক্তির প্রতিকূলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিচ্ছেদ-কারণ-শক্তি মিলন-কারণ-শক্তিকে পরাভূত করিতে যতটুকু ব্যবহৃত হয়, পদার্থের গুরুত্বও সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। তাই বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তু হইতে গুরুত্বে অধিক হইয়া থাকে।

(২)

বিস্তার কারণশক্তি, গতি কারণশক্তি খণ্ড কারণশক্তি ও সংযোগ-কারণশক্তি, ইত্যাদিতে যে একটী সূক্ষ্ম ভূমাশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই শক্তির মূল কারণ কি? প্রথমে দেখাযাউক শক্তি বিষয়টা কি? ইহা প্রকাশস্বভাবাপন্ন স্থূল গুণ। যাহা প্রকাশস্বভাবাপন্ন তাহা সূক্ষ্ম গতিশক্তিসম্পন্ন, যাহা গতিশক্তিসম্পন্ন তাহা স্থূল। শক্তি-ব্যক্ত, ইহার অব্যক্তাবস্থা ইচ্ছা। যখন ইচ্ছা ব্যক্ত হয়, তখনই গতি শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ব্যক্ত-কারণ-শক্তি ইচ্ছারই বিকাশ মাত্র।

এই ইচ্ছা কি? চৈতন্যের সূক্ষ্ম স্পন্দন। এই স্পন্দনের মূলকারণ গুণ। যেহেতু গুণ হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। গুণ সূক্ষ্ম, ইচ্ছা স্থূল। নির্গুণ হইলে ইচ্ছার উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবে? বস্তুতঃ গুণই ব্যক্তরূপে ইচ্ছা। এই গুণের সূক্ষ্মাবস্থার ভিত্তিই ব্যক্ত-চৈতন্য। চৈতন্য অচৈতন্যের ব্যক্তাবস্থা। অচৈতন্য, চৈতন্য ও অচৈতন্যের অতীত কোন একটী অসম্ভব, (ইহাও বলা যায় না) এইরূপ একটা কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু অচৈতন্য, নিরাকার, নির্গুণ, শূন্য ইত্যাদিও একটী গুণ।* যাহা সগুণ তাহা স্থূল, যাহা স্থূল তাহা সূক্ষ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্ম অসম্ভব (ইহাও বলা যায় না) এইরূপ একটী কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অসম্ভবের অতীত বিষয়টীই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-নির্গুণাতীত। তাই তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। কেবল বুঝিবার জন্য সগুণভাবে এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি আছেন। এই অবস্থায় তাহাকে চৈতন্যের স্পন্দনের স্থির-বিস্তারবিহীন কেন্দ্রকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। বস্তুতঃ যেখানে জ্ঞান পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করায়, সেই অসম্ভবের আশ্রয় দাতাই ভূমা বা ব্রহ্ম।

চৈতন্য স্পন্দিত হইবার কারণ কি? অব্যক্ত চৈতন্য ব্যক্ত হইতে সূক্ষ্ম গুণ আশ্রয় করে, গুণ আশ্রয় করিলেই ব্যক্ত ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্ম ইচ্ছা গতি রূপে ব্যক্তাবস্থায় প্রকাশিত হইতে সক্ষম হয়। এই গতিশক্তির সূক্ষ্মাবস্থাই স্পন্দন-কারণ-শক্তি। সূক্ষ্মাবস্থাকে স্থূলাবস্থায় প্রকাশিত করিতে চৈতন্যের ইচ্ছা হওয়ায়, সেই সূক্ষ্ম বাসনা স্পন্দন রূপে ব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত

* এ সম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে আলোচনা হইয়াছে।

হয়। ব্রহ্মের (সগুণ) এই স্পন্দন জলতরঙ্গের ন্যায় ক্রমে বিবৃত্তি লাভ করিয়া স্থূল গতিশক্তি রূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ঈদৃশ স্পন্দনের প্রথম স্থান প্রকৃতি, দ্বিতীয় স্থান মহত্তত্ব, তৃতীয় স্থান অহংকার, চতুর্থ স্থান পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। পঞ্চমস্থান স্থূলভূত রূপে প্রকাশিত। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদির ইন্দ্রিয়গত শক্তির বিকাশ করিয়া কর্ম্মক্ষম হইতে, তামস অহংকার প্রকাশিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অবশেষে এই পঞ্চ তন্মাত্রের স্পন্দনের গতি বিবৃত্তি লাভ করিয়া, স্থূল পঞ্চভূত রূপে প্রকাশিত হয়।

ভূমা-চৈতন্যের গুপ্ত ইচ্ছা যাহা সাম্য তাহাই প্রকৃতি ইহাই স্পন্দনের প্রথম স্থান। প্রকৃতি প্রকাশিত হইতে হইলেই গতির আবশ্যকতা, সুতরাং স্পন্দনে বেগ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য। স্পন্দনের বেগবৃদ্ধি হইলেই তাহা সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূল হয়। এই বেগবৃদ্ধি করিয়া মূলা প্রকৃতিকে স্থূলাবস্থায় প্রকাশিত করিতে চৈতন্যের যে আবশ্যকতা বোধ জন্মে সেই বোধের সূক্ষ্মাবস্থা শুদ্ধসত্ব ও স্থূলাবস্থা মহত্তত্ব; ইহাই স্পন্দনের দ্বিতীয় স্থান। মহত্তত্ব, বুদ্ধিবিশেষ, বুদ্ধি প্রকাশিত করিতে হইলে আমিত্বের আবশ্যকতা, সুতরাং দ্বিতীয় স্থানীয় স্পন্দনের বেগ বৃদ্ধি করিয়া অহংকারের প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহাই স্পন্দনের তৃতীয় স্থান। অহংকারের উদয় হইলেই জ্ঞান খণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, কর্ম্ম করিতে হইলেই ইন্দ্রিয়ের দরকার; সুতরাং তৃতীয় স্থানীয় স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া সূক্ষ্ম-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মনও ইহাদের প্রকাশের সাহায্যকারী সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহাই স্পন্দনের চতুর্থ স্থান। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আশ্রয় করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই, স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মের শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, স্থূল কর্ম্মকারিণী শক্তি প্রকাশিত হইলেই পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত স্থূলাবস্থার সাহায্য করিতে বাধ্য, যেহেতু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শক্তি সহ সূক্ষ্মাবস্থায় নিত্য সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং চতুর্থ স্থানীয় স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া স্থূলবস্থায় স্থূলপঞ্চভূতরূপে প্রকাশিত হয়; ইহাই স্পন্দনের পঞ্চম স্থান। এই রূপে স্থূল জগত প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই স্পন্দন মূলস্থান হইতে জলতরঙ্গের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে অধিকতর গতিসম্পন্ন হইয়া, বিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে, এবং সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে গতির আধিক্যহেতু স্থূলরূপে প্রকাশিত হইয়া, স্থূল জগতরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, আমাদের জ্ঞানান্তর্গত যে কোন গতিশক্তি তাহা এই স্পন্দনের বেগের স্থূলাবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বস্তুতঃ এই ভূমা-স্পন্দনের স্থূলগতিই ব্যক্তাবস্থায় স্থূলগতিশক্তি। এই গতি শক্তিতেই পৃথিবী ঘুরিতেছে, আমরা গমনাগমনে সক্ষম হইতেছি এবং চরম ব্যক্তাবস্থায়—লৌহ, কাষ্ঠ ইত্যাদির কাঠিন্য রূপে প্রকাশিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই স্পন্দন ত্রিগুণসম্পন্ন। এইজন্য প্রত্যেক পদার্থেই সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই

গুণত্রয় লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে সৃষ্টি, রজোগুণ হইতে স্থিতি এবং তমোগুণ হইতে প্রলয় কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। (৩)

আমাদের দেহে এই ত্রিগুণময়ী গতি শক্তি কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকাশিত হইতেছে? আমাদের দেহটী চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পূর্ণরূপে বিকশিতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অহংকারযুক্ত-জ্ঞানে ইহাকে খণ্ডরূপে উপলব্ধি হয়, কিন্তু অহংকারের লয়ে, ভূমা—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু প্রতিপন্ন হয় না। ইহা নিত্য, ভূমা—ব্রহ্মের স্পন্দিতাবস্থার স্থূলরূপে বিকশিত স্থান। নির্গুণব্রহ্ম চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বিষয়গুলি আশ্রয় করিয়াই সগুণরূপে ব্যক্ত।

আমাদের দেহমধ্যে মূলাধারস্থ সূক্ষ্ম, স্থির শান্ত, সমা, সচ্চিদানন্দময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই প্রকৃতি। ইহা দেহস্থ সূক্ষ্ম অব্যক্ত চৈতন্যের স্পন্দনের প্রথমস্থান। অব্যক্ত পুরুষ সহস্রারে অবস্থিত। তিনি ব্যক্ত হইতে গুণ প্রাপ্ত হইয়া মূলাধারস্থ সূক্ষ্ম স্থিরকেন্দ্রে যুক্ত থাকিয়া স্পন্দিত হয়েন। তাহার এই প্রথম সূক্ষ্ম স্পন্দনই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অর্থাৎ পরমাপ্রকৃতি। ইহার স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্থূলাবস্থায়—দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেই মহত্তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম স্থানীয় স্পন্দনের গতি, দ্বিতীয় স্থানীয় মহত্তত্ত্বের স্থূল শক্তিতে প্রতিহত হইয়া অন্তঃকরণের স্থূল শক্তিরূপে প্রকাশিত। দ্বিতীয় স্থানীয় স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্থূলাবস্থায় তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেই অহংকার। মহত্তত্ত্বের দ্বিতীয় স্থানীয় স্পন্দনের বেগ তাহা অপেক্ষা স্থূল, তৃতীয় স্থানীয় অহংকারের প্রকাশক বেগে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মস্তিষ্কের স্থূল শক্তি রূপে প্রকাশিত। মহত্তত্ত্বের সূক্ষ্ম শুদ্ধাবস্থা শুদ্ধসত্ত্ব; ইহার শক্তির গতি অন্তর্মুখী, সুতরাং মূলধারস্থ সূক্ষ্ম কেন্দ্রানুকূল। এই অন্তর্মুখী কেন্দ্রানুকূল সূক্ষ্ম গতিশক্তি স্থূল মহত্তত্ত্বের বহির্মুখী কেন্দ্র প্রতিভিকর্ষিণী শক্তিতে (centrifugal force) প্রতিহত হইয়া উপরিতন মস্তিষ্কের (upper Brain) স্থূল শক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। মহত্তত্ত্বের স্পন্দনের বেগ অহংকারের তৃতীয় স্থানীয় কিঞ্চিৎ স্থূল বেগে প্রতিহত হইয়া নিম্নতন মস্তিষ্কের (Lower Brain) স্থূল শক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। তৃতীয় স্থানীয় স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্থূলাবস্থায় চতুর্থ স্থান প্রাপ্ত হইলেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্রের স্থূলশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। অহংকার যদিও তিন ভাগে বিভক্ত, তথাপি স্থূলতঃ দুই ভাগেই ইহার কর্ম্মের বিকাশ সহজেই প্রতিপন্ন হয়। একটী সূক্ষ্মভাগে অন্যটী স্থূলভাগে। সূক্ষ্মভাগ সত্ত্বগুণাত্মক, ইহা সাত্ত্বিক অহংকার অর্থাৎ ছোট আমি নামে অভিহিত। স্থূলভাগ রাজস (তৈজস) ও তামস (বৈকারিক) অহংকার অর্থাৎ বড় আমি নামে অভিহিত। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় জন্মে। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের ব্যক্ত-শক্তি রজোগুণাত্মক। রজোগুণাত্মক শক্তি ব্যক্তরূপে কর্ম্মক্ষম হইলে তমোগুণের উৎপত্তি হয়; সুতরাং তামস অহংকার প্রকাশিত হইয়া পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম অহংকারের গুণ ত্রয়ের এই প্রকার ব্যক্তাবস্থাই সূক্ষ্ম-চৈতন্যের স্পন্দনের

চতুর্থ স্থান। তৃতীয় স্থানীয় স্পন্দনের বেগ তাহা হইতে স্থূল চতুর্থ স্থানীয় বেগে প্রতিহত হইয়া ফুসফুসের স্থূলশক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। (ক্রমশঃ।)

কস্যচিৎ-পাগলস্য।

———0———

জড়ভরত উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তুমি পণ্ডিতের ন্যায় বাক্য বলিতেছে, কিন্তু তোমাকে পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পণ্ডিতেরা তত্ত্ব বিচার করিয়া কখন "স্বামী" ও "ভৃত্য" এতাদৃশ ব্যবহারকে সত্য বলেন না। রাজন্! যে সকল বেদবাক্যে অনেকানেক গার্হস্থ্য যাগ-যজ্ঞ বিষয়ক বিদ্যা সম্যকরূপে প্রকাশ পায় তন্মধ্যে হিংসা রোষাদি রিপুরহিত তত্ত্বজ্ঞানের উপ-দেশবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বপ্নের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর গৃহ সম্বন্ধীয় যাগযজ্ঞ বিষয়ে যাহাদের আস্থা আছে এবং তজ্জনিত সুখকে যাহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন, উৎকৃষ্ট বেদবাক্যও তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যতদিন পুরুষের মন সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে, ততদিন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বিস্তার করে। বাসনাযুক্ত আত্মার উপাধিভূত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মুখ্য ঐ মনই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহে জীবের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা প্রকাশ করে এবং সংসারচক্রে মায়াদ্বারা জীবোপাধি সৃষ্টি করিয়া আপনার আত্মাকে আলিঙ্গনকরতঃ সুখ, দুঃখ ও দুঃসহ মোহ-রূপ কালপ্রাপ্ত স্বীয় কর্ম্মফল বিস্তার করে। মন বর্ত্তমানে জীব—"জাগ্রত" ও "স্বপ্ন" এই দুই অবস্থায় অবস্থিতি করে। অতএব মনই সংসার এবং মুক্তির কারণ স্বরূপ। মহারাজ! মন গুণত্রয়ে মিলিত হইয়া জীবের দুঃখের কারণ হয়; কিন্তু সেইগুণ হইতে পৃথক হইয়া আবার মঙ্গলের হেতু হয়। দীপ যখন, ঘৃতাক্ত বর্ত্তিকা দাহ করে, তখনই কৃষ্ণবরণ শিখা ধারণ করে, কিন্তু যখন ঘৃত নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন তাহার স্বাভাবিক শুভ্রদীপ্তি প্রকাশিত হয়। এইরূপ মন যখন গুণ ও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত হয়, তখনই ত্রিবিধ বৃত্তি অবলম্বন করে, তদ্ভিন্ন আপনার স্বরূপেই অবস্থিতি করে। বীর! মনোবৃত্তি সমুদয় একাদশ, তন্মধ্যে পাঁচটী ক্রিয়াকার, পাঁচটী জ্ঞানাকার এবং একটী অভিমান। শব্দাদি পঞ্চগুণ, গ্রহণাদি পঞ্চকর্ম্ম এবং শরীর, এই একাদশ ঐ বৃত্তি সকলের বিষয়, গন্ধ রূপ, স্পর্শ, রস, শব্দও এই পঞ্চগুণ; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানাকার বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। আর মলত্যাগ, সম্ভোগ, গতি, বাক্যোচ্চারণ এবং কর্ম্মকরণ এই পঞ্চকর্ম্ম, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্যকারক বৃত্তির বিষয় হয়। "ইহা আমার" এই প্রকারে ভোগের সাধন হইয়া শরীর অভিমানের বিষয় হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা অহং-কারকে দ্বাদশ বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তাহাতে শরীরই ঐ দ্বাদশ বৃত্তির বিষয়।

তখন উঁহার নাম "শয্যা" অর্থাৎ শরীর হয়। রাজন্! পূর্ব্বোক্ত একাদশ বৃত্তি, বিষয়, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট-কাল নিবন্ধন পরম্পর ঈশ্বর হইতে ক্রমে ক্রমে শতসহস্র ও কোটী-গুণে পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তাহারা আপনা হইতে বৃদ্ধি পায় না। মন মায়াযোগে জীবাত্মার সৃষ্টি করে। উঁহার যে বৃত্তি সকল অবিচ্ছিন্ন ধারায় অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে, ঐ সকল বৃত্তি কখন প্রকাশিত কখন বা তিরোহিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর সকল অবস্থারই সাক্ষী, অতএব তিনি সর্ব্বাবস্থাতেই সমস্ত দর্শন করেন।

রাজন্। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, জগতের কারণ, পূর্ণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। তাহার জন্ম নাই। তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। ভূত সমদায়ই তাঁহার বাসস্থান। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণই আছে। মায়া তাঁহার অধীন। তিনি সেই মায়াদ্বারা ভূত সকলে অবস্থিতি করেন। যেরূপ বায়ু, প্রাণ স্বরূপে স্থাবরজঙ্গমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ পরমাত্মাও জীবাত্মার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উঁহাকে শাসন করেন। হে নরেন্দ্র! যতদিন দেহী জ্ঞানোদ্রেক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মায়াকে দূরে অপসারিত করিয়া সঙ্গত্যাগ করিতে এবং ষড় রিপুজয় করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, ততদিনই এই সংসারে ভ্রমণ করে। শোক, মোহ, রোগ, রাগ ও লোভ, এই সকল আত্মারই উপাধিভূত মনেরই সহচর; মন মমতা উৎপাদন করে। অতএব মনুষ্য যতদিন ইহাকে যাবতীয় সাংসারিক দুঃখের ক্ষেত্রভূমি স্বরূপে জানিতে না পারে, ততদিন এই সংসারে ভ্রমণ করে। তুমি লোকগুরু শ্রীহরির চরণ সেবারূপ অসিদ্বারা এই শত্রুকে পরাজয় কর। রাজন্! এ বড় প্রবল শত্রু, উপেক্ষা করিলে উঁহার বল আরও বৃদ্ধি পাইবে। যদিও ইহা ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু আত্মাকে খর্ব্ব করিতে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী।

রাজা রহুগণ কহিলেন, হে যোগেশ্বর! ঈশ্বরের ন্যায় আপনিও লোকদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করিতেছেন। বস্তুতঃ পরমানন্দ অনুভব করাতে আপনার দেহকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান হইয়াছে। সামান্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া আপনি কেবল স্বীয় বিজ্ঞান-শক্তি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মণ্! দেহাভিমান-রূপ সর্প দংশন করাতে আমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে যেরূপ জ্বর-রোগ পীড়িতের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং গ্রীষ্মপীড়িতের পক্ষে সুশীতল বারি আরোগ্যের নিমিত্ত হয়, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার পক্ষে অমৃততুল্য হইল। আমার যে বিষয়ে সংশয় আছে, সে সকল বিষয় আপনাকে ইহার পর জিজ্ঞাসা করিব। এক্ষণে আপনি আপনার অধ্যাত্ম-যোগ-গ্রথিত পূর্ব্বোক্ত বাক্য-সকলকে সহজ করিয়া পুনর্ব্বার উল্লেখ করুন। আমার চিত্তে সাতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। হে যোগেশ্বর! আপনি বলিলেন যে, "কার্য্যের ফল সংরূপে কেবল বিবেচিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, অতএব তত্ত্ব বিচার-মুখে অবস্থিতি করিতেও সংখ নহে।" এবিষয়ে আমার বুদ্ধি সুস্থির হইতে অসমর্থ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

(ক্রমশঃ।)

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক উৎসব। শান্তি-আশ্রমের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৬শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন আলিপুর-দুয়ার, বগুড়া প্রভৃতির ভক্তগণও উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দরিদ্র-নারায়ণসেবা এবং শ্রীশ্রীভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তনে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বঙ্গদেশের ৮হরিসভাগুলিও ঐ দিন বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ভারতের প্রতি হিন্দুগৃহেই দান-ধ্যান, পূজা-অর্চনা হইয়া থাকে।

———0———

জলাশয় প্রতিষ্ঠা। তরপ পরগণার মিরাণী গ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত মহাশয় একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শাস্ত্রীয় বিধানুসারে যজ্ঞাদি সম্পাদন ও বহুতর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুষ্করিণীটার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। আজকাল চতুর্দ্দিকে যে প্রকার জলাভাবের কথা শুনা যাইতেছে, দেশের ধনবানগণ যদি রজনীবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপন আপন গ্রামে ও জমিদারীতে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন, তাহাহইলে দেশের জলাভাব অনেকটা বিদূরিত হইতে পারে। শাস্ত্রে জলদানে অক্ষয় পুণ্যের ব্যবস্থা আছে। এই দুর্দ্দিনে রজনীবাবুর এ নিস্বার্থ কার্য্য প্রশংসনীয় এবং সদাশয় ধনবান্ মাত্রেরই অনুকরণীয়।

———0———

জন্মোৎসব। জ্ঞানাবতার জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত ৮পুরীধামের গোবর্দ্ধনমঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন তীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংসদেব গত বৈশাখ মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত হিন্দুসমাজ তাঁহাকে বহু সম্মানে গ্রহণ করিয়া অভিনন্দন দানে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উপদেশে ২৮শে বৈশাখ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মোৎসব কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বেদ-বেদান্তরূপ কল্পপাদপের পরগাছায় যে দেশের ধর্ম্ম ভাণ্ডার পূর্ণ, সেই দেশে বৌদ্ধযুগের পর পুনঃ হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতার সমাদর দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী গুণগ্রাহী হইতেছেন, গুণের আদর করিতে শিখিয়াছেন। এক্ষণে প্রতিবৎসর বঙ্গদেশে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ উৎসবে যাঁহারা বেদান্ত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনুষ্ঠাতাগণ সাধুবাদার্হ।

———0———

ভক্ত শিশু। শ্রীহট্টজেলার গোবিন্দপুর চা-বাগানের ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের বাসায় সম্প্রতি হরি সংকীর্ত্তন হয়। ঐ সময়ে তাঁহার একটী ছয় মাসের শিশুপুত্র মাতার ক্রোড়ে স্তনপান করিতেছিল, হঠাৎ শিশুটী স্তন ছাড়িয়া "হরিবোল হরিবোল"

বলিতে লাগিল। প্রাঙ্গনের সমস্তলোক শুনিয়া অবাক্। কেহ কেহ প্রেমভরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শিশুটীর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও চ'ক্ষে প্রেমজল বহিয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি জন্মান্তরবাদে আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এ ঘটনা সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ?

———0———

পূর্ণিমা-উৎসব। বৈশাখ মাসের পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথীতে বিষ্ণুর নবম অবতার ভগবান্ বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের নিকট ঐ দিন স্মরণীয় ও পরম পবিত্র। অত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের সেবকগণ কর্ত্তৃক গত বৈশাখী পূর্ণিমাতে শান্তি-আশ্রমে বুদ্ধপূজা, বুদ্ধ-চরিত পাঠ ও হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

———0———

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা। অত্র "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন" হইতে সুপেয় পানীয় জলের অভাব নিবারণার্থ একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যে শান্তি-আশ্রম ৫১৮্ টাকা দান করিয়াছেন। গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ দশহরার দিন শাস্ত্রীয় বিধানে পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

———0———

আশ্রম-সংবাদ—আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস দেব ভক্তগণের অনুরোধে গত ২১ জ্যৈষ্ঠ সশিষ্যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পরিভ্রমনে বহির্গত হইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তিনি দিনাজপুর, রংপুর, আলিপুরদুয়ার, বগুড়া, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমনকরতঃ বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

———0———

জন্মোৎসব—বর্ত্তমান মাসের ৩১শে তারিখ শনিবার ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে। আমরা গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে ও সর্ব্বসাধারণকে উৎসবে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেছি। আশাকরি উৎসবে যোগদানকরতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত অনুগৃহীত করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না

———0———

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

জড়ভরত উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন! পার্থিব বিকারের মধ্যে যাহা এই পৃথিবীতে চলিয়া বেড়ায়, তাহাই এই ভারবাহকাদিজন্তু রূপে কথিত হইয়া থাকে। ঐ বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশঃ গুলফ, জঙ্ঘা, জানু, কটি, বক্ষ, গ্রীবা ও স্কন্ধ প্রভৃতি অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা, শিবিকার উপর 'সৌবীর দেশের রাজা' এই নামে একটী পার্থিব বিকার। তুমি সেই বিকারকেই আত্মা ভাবিয়া আপনাকে সিন্ধুসৌবীর দেশের রাজা বলিয়া অভিমান করিতেছ এবং সেই মদেই অন্ধ হইয়াছ। এই সকল শোচনীয় দশাগ্রস্ত সমধিক ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বলপূর্ব্বক বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করায় তোমার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তুমি আপনীকে লোকের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া যে শ্লাঘা করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণই অলীক। তুমি অতিশয় নির্লজ্জ সুতরাং মহাজনগণের সভায় শোভা পাইতে পার না। রাজন! যখন চরাচর সকল বস্তুই এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন এবং এই পৃথিবীতেই লীন হইতেছে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে, কেবল নাম ভিন্ন "জগৎ প্রপঞ্চ" এই ব্যবহারের অন্য কোন কারণ নাই; আছে বলিয়া স্থিরকরা, কেবল অনুমান মাত্র। আর ক্ষিতি শব্দেরও যথার্থ কোন অর্থ নাই, কারণ ক্ষিতি পরমাণুতে লীন হইয়া থাকে। "পরমাণু" শব্দও কেবল মায়া দ্বারা মনোমধ্যে কল্পিত হয়। পরমাণু কল্পনা করিবার প্রয়োজন এই যে, ঐ সকলের সমষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই "পৃথিবী" এইরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে।

হে নৃপ! আত্মাতে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন কৃশ, কখন স্থূল, কখন কার্য্য, কখন, কারণ, কখন চেতন, কখন বা অচেতনের কার্য্য দেখিয়া "তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আছে" এইরূপ যে প্রতীতি হয় তাহাও মিথ্যা। দ্রব্য, স্বভাব, চিত্ত, কাল ও কর্ম্ম, এই সকল নামে প্রসিদ্ধ দ্বারাই এই প্রতীতি উৎপাদন করে। মহারাজ! বিশুদ্ধ এক, পূর্ণ, বাহ্যাভ্যন্তর-শূন্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নির্ব্বিকার জ্ঞানই কেবল একমাত্র সত্য। ঐ জ্ঞানেরই নাম ভগবান্। পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই বাসুদেব বলিয়া থাকেন। রহুগণ! তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদি দান পরোপকার, বেদাধ্যায়ন এবং জল' অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা, ইহার মধ্যে কোনটী দ্বারাই এই জ্ঞান পাওয়া যায় না। মহৎ ব্যক্তির-পদধূলি-লেপনই ঐ জ্ঞান প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যে স্থানে মহৎ ব্যক্তি অবস্থিতি করেন, সে স্থানে পুণ্যকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির-গুণ কীর্ত্তনই হইয়া থাকে। সেই কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে মুক্তিপ্রার্থী শ্রোতার সৎবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে রাজন্! আমি ভরত নামে রাজা ছিলাম। আমি অনেক দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সঙ্গজনিত সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত এবং ভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই সময় মৃগাসক্ত হওয়াতেই আমার ঐ উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছিল এবং আমি মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম। শ্রীহরির অর্চ্চনা করায় আমার যে প্রভাব জন্মিয়াছিল, সেই প্রভাববলে মৃগজন্মেও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারি বলিয়াই পাছে আবার মনুষ্যদিগের সঙ্গহেতু সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে সর্ব্ব-সঙ্গপরিহার করিয়া ভ্রমণ করি। অতএব সাধুদিগের সুসঙ্গজাত জ্ঞানরূপ অসিধারা অজ্ঞান-রূপ পাপকে ছেদন করিলে শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ পূর্ব্বক মানব ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সংসারের শেষ সারস্বরূপ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এই লোকরূপ বণিক্ সমূহ মায়া দ্বারা দুর্গমপথে প্রেরিত হইয়া সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা বিভক্ত কর্ম্ম সকলকে কর্ত্তব্য বোধকরতঃ সুখলাভের ইচ্ছায় ভবারণ্যে ভ্রমন করে, কিন্তু কখন কোন স্থানেই সুখ প্রাপ্ত হয় না। উহাদিগের সারথি সুনিপুণ নহে, এজন্য ঐ অরণ্য মধ্যে প্রসিদ্ধ ছয়জন দস্যু বলপূর্ব্বক উহাদিগের ধন অপহরণ করে। উহারা ঐ বন মধ্যে স্বার্থচিন্তায় ব্যস্ত হইয়া যখন অসাবধান হইয়া পড়ে, তখন যেমন ব্যাঘ্র মেষকে আক্রমণ করে, তেমনই রিপুরূপ শ্বাপদেরা আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করে। কখন কখন উহারা প্রভূত লতা, গুল্ম ও তৃণে সমাচ্ছাদিত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তীক্ষ্নদংষ্ট্রা মশকাদির দংশনে অস্থির হয়, কখন সম্মুখে মায়ানগর দর্শন করে, কখন বা প্রচণ্ডবেগ অগ্নিশিখাতুল্য জাজ্বল্য-মান পিশাচকে দেখিতে পায়। বাসস্থান জল ও ধনধান্য, এই সকল দ্রব্যে স্বভাবতঃই তাহাদিগের প্রয়োজন আছে, অতএব তাহারা ঐ সকল বস্তু উপার্জ্জন করিবার অভিলাষে ঐ বনের নানা স্থানে ভ্রমন করে। কোথাও বা বাত্যোত্থিত ধূলিপটলে দিক্‌সকল ধূম্রবর্ণ এবং নয়ন আচ্ছন্ন হওয়াতে, তাহারা কোন্

দিবই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। কোন স্থানে অদৃশ্য ঝিল্লীরব শূল-সদৃশ তাহাদের কর্ণে বিদ্ধ হয়। কোথাও বা পেচক-শব্দে অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়া উঠে। কোন স্থানে ক্ষুধায় কাতর হইয়া এরূপ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহার ছায়া স্পর্শ করিলেও পাপ হয়। কোথাও বা মরীচিকাকে জল জ্ঞান করিয়া ধাবিত হয়। কোন স্থানে অতিবেগে ধাবিত হইয়া জলশূন্য নদীতে পতিত হয়। কোথাও বা খাদ্যাভাবে কেহ অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে। কোনস্থানে দাবাগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্নুত্তাপে সন্তপ্ত হয়। কোথাও বা যক্ষহস্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়। কোন স্থানে অন্য বলবান্ ব্যক্তি দ্বারা ধন অপহৃত হওয়াতে বিষণ্ণ ও দুঃখচিত্ত হইয়া শোককরতঃ মূর্চ্ছিত হয়। কোথাও বা মায়া-নির্ম্মিত পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখীর ন্যায় মুহূর্ত্তকাল আমোদ প্রমোদ করে। কোন স্থানে চলিতে চলিতে পদে কণ্টক ও প্রস্তরাদি বিদ্ধ হওয়াতেও পর্ব্বতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া অবস্থিতি করে। কোথাও বা কোন সাংসারিক পুরুষ প্রতিক্ষণে অন্তর্নিহিত অগ্নিদ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া অন্য ব্যক্তির কর্ত্তৃক ক্রুদ্ধ হয়। কোন স্থানে কেহ অজগর দ্বারা কবলিত এবং বনমধ্যে পতিত হইয়া নষ্ট হয়। কেহ বা তীক্ষ্ণবিষ-বৃশ্চিকাদি দ্বারা দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় যন্ত্রনাযুক্ত হইয়া গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে পতিত হয়। কেহ বা কিঞ্চিৎ মধুর অন্বেষণে গমন করিয়া মক্ষিকাদ্বারা দষ্ট হইয়া ভয়ানক যন্ত্রনা ভোগ করে; অথবা অতিকষ্টে যদিও কিঞ্চিৎ মধুলাভ করে তাহাহইলে অন্যে তাহার নিকট হইতে ঐ মধু অপহরণ করিয়া লয়। যদি সে ঐ অপহারককে আক্রমন করে, তাহাতে অন্য অপহারক আবার ঐ মধু গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। মহারাজ! কোথাও কতকগুলি লোক শীত, বাত, আতপ ও বর্ষা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া বসিয়া থাকে। কোথাও বা কেহ পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা বস্তু গ্রহণ করে। কোথাও বা বঞ্চনা করতঃ বিবাদ করে। ঐ অরণ্য মধ্যে কোন কোন স্থানে শয্যা, আসন ও গৃহহীন ব্যক্তি, যখন পরের নিকট ঐ সকল সামগ্রী প্রার্থনা করিয়া পায়, তখনই পরদ্রব্যে অভিলাষী হয় এবং সেইহেতু অপমানও সহ্য করে। লোকে এইরূপে ধনাদি দ্বারা একজন অন্য ব্যক্তির শত্রু হইয়া উঠে, তথাপি পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ পরিশ্রম, ধনক্ষয় এবং অন্যান্য উপসর্গের পীড়ায় পীড়িত হইয়া এই সংসারপথে পরিভ্রমণ করে। যে দল, নূতন উৎপন্ন হইয়া ঐ হীনবল জনগণকে গ্রহণ করিয়া স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করে, সে দল আর সেই স্থানে প্রত্যাগমন করে না। দলের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকেও অদ্যাপি এতাদৃশ ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই না যে ঐ পথের পার প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারাজ! বনচারী দলের মধ্যে যে বীর সকল দিগ্‌গজ-কেই পরাজয় করিতে পারে, তাহারা এই "ভূমণ্ডল আমার" "এই ভূমণ্ডল আমার" এই বলিয়া ভূমির নিমিত্ত বিবাদ করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। অতএব বৈরশূন্য নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীসকল যে সুশীতল শান্তিপ্রদ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হ'ন তাহারা সে পদ প্রাপ্ত

হইতে কখনই সমর্থ হয় না।

হে নৃপ! ঐ দলের মধ্যে কোনব্যক্তি কোন স্থানে কোন লতার শাখা আশ্রয় করিয়া এবং সেই শাখারূঢ় পক্ষীগণের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া, সেই শাখাতেই আসক্ত হয়, কোন স্থানে কেহ সিংহ সমূহের ভয়ে ভীত হইয়া, বক্, কঙ্ক ও গৃধ্রগণের সহিত বন্ধুত্ব করে। কিন্তু তাহাদের নিকট প্রতারিত হইয়া পরিশেষে আপন ইচ্ছায় হংসবংশে প্রবেশ করে, কালক্রমে তাহাদেরও আচার ব্যবহার ভাল বোধ না হওয়ায়, স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করে। তাহারা পরস্পরের দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরমায়ু কত তাহার সংখ্যা যেন একবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। কোনস্থানে কেহ স্ত্রীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্য তাহাদের নিমিত্তই আশা-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করে এবং সেই আসক্তিহেতু অনায়াসে ক্লিষ্ট ও স্বীয় সংসারবন্ধন মোচনে অসমর্থ হয়। কোথাও বা কোনব্যক্তি অনবধানতানিবন্ধন পর্ব্বতগুহায় পতিত হইয়া গুহাচারী হস্তীর ভয়ে ভীত হয় এবং সামান্য লতাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। হে অরিসূদন! ঐরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত ব্যক্তি, কখন কোন উপায় দ্বারা ঈদৃশ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সঙ্গীগণ সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। কিন্তু মায়া যে সকল মনুষ্যকে সংসারপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অদ্যাপি প্রকৃত পথ অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। হে রহুগণ! মায়া তোমাকেও সংসারপথে প্রেরণ করিয়াছে, অতএব আপনার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় প্রাণীর সহিত বন্ধুত্ব কর এবং বিষময় বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্ব্বক শ্রীহরির সেবাদ্বারা জ্ঞানরূপ অসিকে শাণিত করিয়া সেই অসি হস্তে গ্রহণকরতঃ সংসারপারে গমন কর। রাজা কহিলেন, মনুষ্যজন্মই সকল জন্মের শ্রেষ্ঠ। স্বর্গে যে জন্ম হয়, পণ্ডিতেরা বলেন সেই জন্মাপেক্ষা অন্য কোন জন্মই শ্রেষ্ঠ নাই, কিন্তু সে জন্মে কোন কার্য্য হয় না; কারণ ভবাদৃশ যে সকল মহৎব্যক্তির চিত্ত শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, স্বর্গে তাহাদিগের সহিত অন্যব্যক্তি সকলের সমাগম-সম্ভাবনা নাই। মহৎব্যক্তির চরণ-রেণু সংস্পর্শে যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হয়, ভগবান্ শ্রীহরিতে তাঁহাদিগের যে বিমল ভক্তি জন্মিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দেখুন পূর্ব্বে সকল কুতর্কের মূল স্বরূপ আমার যে জ্ঞান ছিল, মুহূর্ত্ত মাত্র আপনার সঙ্গলাভ করাতে আমার সেই অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইল। আমি সুশীল, মহৎ সাধুব্যক্তি সকলকে নমস্কার করি। ব্রাহ্মণবংশজ ক্রীড়াশীল বালক হইতে আরম্ভ করিয়া যুবা ও বৃদ্ধ সকলকেই নমস্কার করি। যে সকল ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে অবধূত বেশে দেশে দেশে ভ্রমন করেন, প্রার্থনা করি, তাঁহারা রাজকুলের মঙ্গল করুন। ব্রহ্মর্ষি ভরত মহানুভব ছিলেন। মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়গণের উত্তাল তরঙ্গসকল শান্ত হওয়াতে গাম্ভীর্য্যে জলনিধিকে বদ্ধ করিতেন। অতএব সিন্ধু দেশাধিপতি রহুগণ অবমাননা করিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন এবং তাহার অতি বিনীত প্রণিপাত গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার এই পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌবীর পতিও সাধু সমা-

গমে পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া দেহে মায়া কৃত অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের আশ্রিত ভরতের আশ্রয় লাভ করিয়া রহূগণের দেহে আত্মবুদ্ধি বিদূরিত হইল।

যে সকল ব্যক্তি দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ করে, তাহাদিগের ইষ্টানিষ্ট মিশ্রিত কার্য্য-সকল শমাদি গুণ দ্বারা বিভক্ত হইয়া বিবিধ দেহ উৎপাদন করে। সেই সকল দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগের নামই সংসার। ছয় ইন্দ্রিয় ঐ সংসার অনুভবের দ্বার স্বরূপ। যেমন বণিক্‌গণ অর্থচেষ্টায় দুর্গম পথে বহুদূর গমন করে, সেইরূপ এই জীব সমূহ, পরম পুরুষ শ্রীহরির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী মায়ার সহযোগে ঐ ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন এক দুর্গম পথরূপ দুশ্চল সংসারপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং শ্মশানতুল্য অপবিত্র ও ক্লেশদায়ক সংসার-বনে প্রবিষ্ট হইয়া, স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। অখিলগুরু শ্রীহরির চরণপদ্মের ভৃঙ্গস্বরূপ ভক্তগণ যে পথে গমন করেন, সে পথ সকলপ্রকার সংসারতাপ শান্তি করে, জীবগণ অদ্যাপি সেই শান্তিময় পথ উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় নাই। ভবারণ্যে তাহাদিগের চেষ্টা বিফল বা নানা বিঘ্নে প্রতিহত হইতেছে। ছয় ইন্দ্রিয়ই সংসারকাননের ছয় প্রসিদ্ধ দস্যু। তাহাদের কর্ম্ম দেখিলে তাহাদিগকে দস্যু বলিতে হইবে। পুরুষ সংসার মধ্যে অতি-ক্লেশে যে কিঞ্চিৎ ধনোপার্জ্জন করে, তাহা-ধর্ম্মের সাধন, এইজন্য ইহকালে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ। কারণ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সাক্ষাৎ পরম পুরুষের আরাধনা রূপ ধর্ম্মের ফল পরকালেই দর্শে। কিন্তু যে রূপ চৌরগণ, অসাবধানীর ধন হরণ করে, সেইরূপ ছয় ইন্দ্রিয়, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, এবং বাসনা ও চেষ্টাদ্বারা গৃহস্থাশ্রমের নিন্দিত ভোগসকল উপভোগ করিয়া বিচলিতাত্মা কুবুদ্ধির সংসারীর ঐ ধর্ম্ম সাধনরূপ ধনহরণ করিয়া লয়। স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারভুক্তব্যক্তি সকলই নাম এবং কর্ম্মে ব্যাঘ্রাদি স্বরূপ। অতি লুব্ধ সংসারী মনুষ্য, মেষশাবকরূপ; যে উহারা, তাহার সম্মুখহইতেই ঐ দ্রব্য স্ব হরণ করিয়া লয়। যেমন প্রতিবৎসর কর্ষণ করিলেও অন্তর্নিহিত বীজ দগ্ধ না হওয়াতে, বপনকাল অতিত হইলেই ক্ষেত্র পুনর্ব্বার তৃণ, গুল্মলতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠে, সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্র গৃহস্থাশ্রমেরও কর্ম্মসকল একেবারে উৎপন্ন হয় না। কারণ এই আশ্রম, কাম সকলের ভাণ্ডস্বরূপ। অতএব যেমন কর্পূরভাণ্ড হইতে কর্পূর গ্রহণ করিলেও উহার গন্ধ দুর হয় না, সেই বাসনার ক্ষয় হইলে কর্ম্মেরও ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি এই গৃহস্থাশ্রমে রত হয়, দংশ ও মশকের ন্যায় নীচব্যক্তি সকল এবং পক্ষী, পতঙ্গ, তস্কর ও মূষিকগণ তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লয়। মন, মায়া, কাম ও কর্ম্মে লিপ্ত হওয়াতে জীবের দৃষ্টি দূষিত হইয়া যায়। সে সেই অবস্থায় এই পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন মায়ারচিত নগরীর ন্যায় মিথ্যাভুত নরলোককে সত্য স্বরূপ দর্শন করে, কখন বা পান-ভোজন ও মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়-সুখে অভিলাষী হইয়া, মরীচিকাসম বিষয় সমূহ ধাবিত হয়। অশেষ দোষের নিদানীভূত স্বর্ণ ও একপ্রকার বিষ্ঠা স্বরূপ। কিন্তু জীব স্বর্ণের ন্যায় রক্তবর্ণ রজোগুণ দ্বারা নির্ম্মিত বুদ্ধিবলে প্রেরিত হইয়া—যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তি অগ্নির উত্তাপ লাভে ইচ্ছুক হইয়া বনমধ্যে

অগ্নিশিখার ন্যায় জাজ্বল্যমান পিশাচকে দর্শনকরতঃ তাহার প্রতি ধাবিত হয়। সেইরূপ জীব ঐ স্বর্ণ লাভেচ্ছায় ধাবিত হইয়া থাকে। কখন বা বাসস্থান, পানীয়, ধন প্রভৃতি আত্মার উপজীব্য সামগ্রীতে চিত্ত স্থাপন করিয়া এই সংসারারণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমন করে। কখন বাত্যাসদৃশী প্রমদাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তৎকালজ অনুরাগে বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ায়, নিশাচর ভূতগণের ন্যায় দুরাচার হইয়া উঠে এবং ধূলি প্রক্ষিপ্ত-চক্ষু পথিকের ন্যায় সদাচার-লঙ্ঘনের সাক্ষিরূপ দিগ্‌দেবতাদিগকে দেখিতে পায় না। কখন একবারমাত্র আপনা হইতেই বুঝিতে পারে যে, বিষয় বিত্তাদি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু দেহে অভিমান থাকাতে অবিলম্বেই তাহার ঐ রূপ স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তখন সে সেই ভ্রষ্ট স্মৃতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া আবার বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়।

সমক্ষেই হউক আর পরোক্ষেই হউক, শত্রু বা অধিকারী পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রোৎসাহিত হইয়া যুক্ত যুক্ত বিবেচনা না করিয়াই যে ভৎর্সনা করেন, তাহা পেচক ও ঝিল্লীরবের ন্যায় অতি কর্কশ এই সংসারে জীবের তাদৃশ শব্দে কখন কর্ণশূল উৎপন্ন, কখন বা হৃদয় ব্যথিত হয়। জীব যখন পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি সমুদয় ভোগ-করে, তখন সে জীবন্মৃত ধনীর নিকট ধাবিত হয়। বিষ তিন্দুক (কুঁচলে) প্রভৃতি অপবিত্র দ্রুম-লতার এবং বিষকূপের তুল্য ঐ সকল ধনীর ধনের দৃষ্টাদৃষ্ট কোন প্রয়োজন নাই। যেরূপ জলহীন নদীতে পতিত হইয়া মস্তক কাটিয়া যাওয়াতে মনুষ্য পতনকালে এবং তাহার পরেও যন্ত্রনা ভোগকরে, সেইরূপ অসাধুসঙ্গে বুদ্ধি প্রতারিত হওয়াতে জীব কখন তোয়হীন নদীতুল্য পাষণ্ডমত আশ্রয় করিয়া ইহকাল এবং পরকালে দুঃখভোগ করে। কখন যদি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত পীড়িত হইয়া খাদ্য সামগ্রী দেখিতে না পায়, তখন যাহার যাহা কিছু থাকে, তাহার নিকট যাইয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করে।

গৃহস্থাশ্রমের চরম ফল সুখ। অভিলষিত বস্তু সকল ইহাকে প্রতপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, অতএব ইহা দানবতুল্য। জীব এতাদৃশ গৃহলাভকরতঃ শোকাগ্নি দ্বারা কখন সাতিশয় দুঃখ ভোগকরে, কখন বা রাজরূপী রাক্ষস সকল কালবশে প্রতিকূল হইয়া তাহার অতি প্রিয়তম ধনরূপ প্রাণ অপহরণ করিয়া লয়, তখন সে মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করে। জীবনসূচক হর্ষাদি চিহ্ন তাহাতে আর দৃষ্ট হয় না। সেই সংসারী পুরুষ কখন মিথ্যা-ভূত পিতা-পিতামহকে মনে মনে সত্যস্বরূপ বোধ করিয়া, ক্ষণকালজন্ত স্বপ্নসুখ অনুভব করে।

সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অতি বিস্তৃত, সুতরাং পর্ব্বত স্বরূপ। জীব কখন সেই কর্ত্তব্য সকলের পার প্রাপ্তির আশায় অলৌকিক দুঃখে আক্রান্ত হইয়া কণ্টক ও কঙ্করব্যাপ্ত-ক্ষেত্রে ভ্রমনকারী পুরুষের ন্যায় অবসন্ন হয়। কখন বা শরীর মধ্যস্থ দুঃসহ জঠরানলে সন্তপ্ত হওয়াতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের উপর ক্রুদ্ধ হয়। নিদ্রাই অজগর সর্প। জীব নিদ্রাগত হইয়া ভয়ানক গাঢ় অন্ধকারে-আচ্ছন্ন জনশূন্ত অরণ্যতুল্য সংসারে শয়ন করিয়া থাকে এবং শবের ন্যায় পতিত হইয়া

কিছুই জানিতে পারে না। কখন তাহার মান-রূপ দংষ্ট্রা ভগ্ন হইয়া যায়, কখন বা দুর্জ্জনরূপ বৃশ্চিক দংশন করাতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। তদ্বারা তাহার সাতিশয় যন্ত্রনার বৃদ্ধি পায় এবং দিন দিন বিজ্ঞান (বুদ্ধি) ক্ষীণ হওরাতে অন্ধের ন্যায় অন্ধকূপে পতিত হয়।

কাম সকল যৎকিঞ্চিৎ মধুস্বরূপ। জীব সেই মধু অন্বেষণ করিতে করিতে পরের স্ত্রী বা বস্তু আক্রমণ করিলে, তদধিকারী বা রাজা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ অপার নরকে পতিত হয়। এইজন্ম পণ্ডিতেরা এই প্রবৃত্তি পথের কার্য্যকেই ইহ ও পরকালে সংসারের জন্ম-ভূমি বলিয়া থাকেন। এই প্রকারে পুরুষ পরদ্রব্য হরণ করিয়া যদি বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে দেবদত্ত (অন্য ব্যক্তি) তাহার নিকট হইতে ঐ বস্তু কাড়িয়া লয়; দেবদত্ত হইতে আবার বিষ্ণু মিত্র হরণ করে। এইরূপে হস্ত হইতে হস্তান্তরে চলিয়া বেড়ায়। অতএব যে ব্যক্তি পূর্ব্বে হরণ করিয়াছিল, সে ভোগ করিতে পায় না। জীব শীত, বাত ও আত-পাদি বহুবিধ আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিকার করিতে অসমর্থ, সুতরাং দুস্তর চিন্তাহেতু বিষন্ন হইয়া কাল যাপন করে। কখন বা পরস্পর পরস্পরের ধন লইয়া ক্রয়বিক্রয়করতঃ একজন অন্যের নিকট হইতে এক কাকিণী (৫গণ্ডা কড়ি) মাত্র বা তাহা অপেক্ষাও ন্যূন, যৎকিঞ্চিৎ অপহরণপূর্ব্বক বঞ্চনা করিয়া কলহ করে। এই সংসারপথে পূর্ব্বোক্ত প্রবল কষ্ট ও ধননাশ প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ সকল আছেই। তদ্ভিন্ন সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জন্ম ও মরণ ইত্যাদি আরও অনেক উপসর্গ আছে। কখন দৈবমায়ারূপিণী স্ত্রীর ভুজলতায় আলিঙ্গিত হইয়া দূরীভূত-বিজ্ঞান জীবের হৃদয় তাহারই বিহারগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে এবং তাহার আশ্রয়ে পুত্রকন্যার আলাপন অবলোকন ও চেষ্টায় চিত্ত অপহরণ করাতে অজিতাত্মা ব্যক্তি আত্মাকে অপার অন্ধকারে পাতিত করে।

পরম পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্রেরই নাম হরিচক্র। পরমাণু অবধি দ্বিপরার্দ্ধকাল ঐ চক্রের স্বরূপ। উহার বিরাম নাই, সকল অবস্থাতেই উহার সমভাব। ঐ চক্র তৃণ-স্তম্ভ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রতিকারাশক্ত—যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমকে সংহার করিয়া থাকে। সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির কালচক্রই পূর্ব্বোক্ত হরিচক্র। জীব উহা হইতে ভীত হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাকরতঃ অমূলক পাষণ্ড-শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া সদাচার ভ্রষ্ট হয়, সুতরাং গৃধ্র, বক, কঙ্ক ও কাকতুল্য পাষণ্ড, দেবগণকে আশ্রয় করে। পাষণ্ডেরা আত্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত. অতএব তাহার ও তাহাদের নিকট বঞ্চিত হইয়া ব্রাহ্মণকুলে গিয়া বাসকরে। কিন্তু ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন প্রভৃতি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের আরাধনারূপ যে আচার, তাহা ভাল বোধ না হওয়াতে, তাহারা শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে। বৈদিক-আচার-বর্জ্জিত শূদ্রের পবিত্রতা নাই, সুতরাং পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ভিন্ন তাহাদের অগ্নি-হোত্রাদি অন্ত ক্রিয়ারও অধিকার নাই। কেবল সামান্য লৌকিক কার্য্য করিয়াই

তাহারা আপনার জীবনকালের সীমা বিস্মৃত হইয়া যায়। কখন বা পশুর ন্যায় ঐহিক বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্রের প্রতিই বাৎসল্যভাব প্রকাশ করে এবং ভোগ শোকে অভিভূত হয়। এইরূপে সংসারপথে সুখ দুঃখাদিদ্বারা বদ্ধ হইয়া মৃত্যু রূপ মত্তহস্তীর ভয়ে ঘোর অন্ধকার রূপ রোগাদি আপদে পতিত হয়। কখন বা শীত বাত প্রভৃতি দৈবিক, ভৌতিক ও আত্মসম্বন্ধীয় দুঃখের প্রতিকার অশক্ত হইয়া বিষময় বিষম বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং তজ্জন্য বিষণ্ণ ভাবে অবস্থিতি করে। কখন বঞ্চনা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ধনোপার্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠে। কখন ধনাভাবে শয্যা ও আসনাদি ভোগ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ঐ সকল বাঞ্ছিত বস্তুর উপার্জ্জনে স্থির নিশ্চয় হইয়া অন্যের নিকট হইতে বহুবিধ বিষয় অবমাননাদি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ধনাসক্তি দ্বারা পরস্পর শত্রুতা করিয়াও পূর্ব্ব বাসনার জন্য কখন পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হয়। আবার কখন একজনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করে। এই সংসার-পথে বিবিধ ব্যসন দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া নবজাত ব্যক্তিকে গ্রহণকরতঃ তাহাতেই অভিভূত ও মুগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। আত্ম তত্ত্ববিদ্ সাধুব্যক্তিভিন্ন অন্য সকলেই ইহাতে পতিত হয়। পণ্ডিতেরা সাধুব্যক্তিকেই সংসারের পার বলিয়া জানেন। যোগানুষ্ঠান দ্বারা সংসারপথ রোধ করা যায় না। যে সকল শান্তিপরায়ণ স্থিরাত্মা মুনিগণ দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই পথের পথিক হইয়া থাকেন; যে সকল দিগ্‌গজ রাজর্ষিগণ যাগ যজ্ঞ করেন, তাঁহারাও ঐ পথ রোধ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা কেবল "এই রণভূমি আমার "এই রণভূমি আমার," বলিয়া কলহ করতঃ আপনারা রণভূমিতেই বিনষ্ট হন। যে কর্ম্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া অধিক ক্লেশে নরকাপদ হইতে মুক্তিপায়, কিন্তু পুনর্ব্বার সংসারপথে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহলোকে আসিয়া মানবকুলের সহিত মিলিত হয়। যাহারা স্বর্গে গমন করেণ, তাহাদিগকেও আবার এই সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

যেমন মক্ষিকা গরুড়ের কার্য্যের অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সংসারে কোন রাজা সেই রাজর্ষি মহাত্মা ঋষভ পুত্রের আচরিত পথের অনুগমনে সমর্থ হয় না। মনোমত স্ত্রী পুত্র মিত্র ও রাজ্য পরিত্যাগ করা অতি কঠিন কর্ম্ম, কিন্তু ভরত রাজা পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরিকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যৌবনকালেই, বিষ্ঠার ন্যায় ঐ সকল পরিতাগ করিয়াছিলেন। যে মহৎব্যক্তিগণের চিত্ত বাসুদেবের আরাধনাতেই অনুরক্ত তাঁহারা মোক্ষকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন। অতএব ভরত যে সুদুস্ত্যজ্য রাজ্য-পুত্র-স্বজন ও মহিষীকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রধান প্রধান দেবগণের প্রার্থনীয় যে রাজলক্ষ্মী ভরতের কৃপাপাত্র হইবার জন্য তাঁহার দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকিতেন, ভরত তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি যখন মৃগদেহ পরিত্যাগ করেন, তখনও মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন্ যে, যে হরি যজ্ঞস্বরূপ, যিনি যজ্ঞাদির ফলদাতা, যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যিনি অষ্টাঙ্গযোগরূপী, জ্ঞানই

যাহার প্রধান ফল, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বজীবের শাসনকর্ত্তা আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যাবতীয় ভগবদ্ভক্তেরাই যে রাজর্ষি ভরতের বিশুদ্ধ গুণ ও কর্ম্মের আদর করিয়া থাকেন এই প্রবন্ধে তাঁহারই চরিত্র বর্ণিত হইল।

—o—

কে ঐ ?

কে ঐ নব-নীল-নীরদ-তনু রুচিরে।
সমর-বেশে বামা হরহৃদি বিহরে।
বিবসনা হরহৃদে, নাচে বামা রণমদে,
পদভরে কম্পিতা মহী রে।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল,
হিমকর রাজিত নখরে।
এলো চিকুরনিকর, কটীতটে নরকর,
বামকরে নরমুণ্ড অসি রে।
সদা বামেতর কর, যাচিছে অভয় বর,
গলদেশে মুণ্ডমালা শোভে রে।
কাটিয়ে দনুজ মুণ্ড, করিতেছে খণ্ড খণ্ড,
রক্তধারা পান সদা করে রে।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখ-কুলা' দন্ত-মুলা,
এলোচুলা গায় ধুলা নাচে রে।
কভু রাধা কভু কালী, কভু কৃষ্ণ বনমালী,
কভু দুর্গারূপা দশভুজা রে।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি মৃদুগতি,
কভু বিশ্বমোহিনীরূপা রে।
কভু ঘোর রণবেশে নাচে, কভু অট্টহাসে,
ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধরে রে।
ইহারি রচিত বিশ্ব, নহিলে এমন দৃশ্য ;—
গড়িতে কভু কি কেহ পারে রে!
ইঁহারি ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও'র কৃপাদৃষ্টি,
প্রলয় করিতে পারে হুঙ্কারে।
ত্রাণ পেতে যদি চাও, উঁহারি শরণ লও.
কালভয় যাবে দূরে রে॥

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—o—

ঈশ্বর-ইচ্ছা।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বিষম ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, স্বেচ্ছাচারিতার সময়ে,—সকলেই ঈশ্বরপ্রকৃতি নিরূপণে ব্যস্ত। ঈশ্বর কিংস্বরূপ ? ঈশ্বরের প্রকৃতি কি ? ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, অভিলাষ, প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয়ের অধীন হইয়া কার্য্য করেন কি না ? ঈশ্বর-ইচ্ছা ও মনুষ্য-ইচ্ছার পার্থক্য কি ? ঈশ্বর নির্গুণ কি সগুণ ? নিরাকার কি সাকার, নিষ্ক্রিয় কি ক্রিয়াশীল ? ইত্যাদি বিষয় নির্ব্বাচনে অগ্রসর। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্ম, সকলেই ধর্ম্মান্দোলনে উন্মত্ত, ঈশ্বর নিরূপণে ব্যস্ত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মানবহৃদয়ে অবিশ্রান্ত তর্কস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বলিতেছেন "ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার কোন কার্য্য করিবার সাধ্য নাই; তাঁহার স্কন্ধে দুই মাথা যে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।" মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বলিতেছেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছাই পুণ্য, ঈশ্বরের অনিচ্ছাই পাপ।" কেহ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে সাকার উপাসনা প্রতিপন্ন করিতেছেন; কেহ ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয়, কেহ ক্রিয়াশীল বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও ক্রিয়াশীল; তিনি অনন্ত রাজ্যে অনন্ত ক্রিয়াবান্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। নতুবা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, কতিপয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, তিনি কোন স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না, কি থাকিতে পারেন না; তিনি অনন্ত ক্রিয়াবান্। তিনি অনন্ত ক্রিয়াবান্ হইয়া অনন্ত শক্তিদ্বারায় এই চরাচর বিশ্বের অনন্ত কার্য্য অনন্তকাল হইতে নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাও অনন্ত বিষয়ীভূত; যাঁহার ইচ্ছা অনন্ত, তাঁহার ইচ্ছার সহিত সীমাবদ্ধ মানবের ইচ্ছার তুলনা হইতে পারে না। মানব-ইচ্ছার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ঈশ্বর-ইচ্ছার সেরূপ পরিবর্ত্তন নাই। তাঁহার এক অনন্ত ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় একসময়ে সমাধান হইতেছে,—অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, এক ইচ্ছার অন্তর্গত। তুমি যেমন একজনকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিয়া কোন কারণে তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাক,—কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল নহে। তাঁহার অনন্ত ইচ্ছাতে মানবের হর্ষ, বিষাদ, একসময়ে উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে সময় কান্দিতেছ, আমি সেই সময় হাসিতেছি, এই দুইটী বিভিন্ন ক্রিয়া ঈশ্বরের এক ইচ্ছা দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনন্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয়

পক্ষান্তরে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি আমাতেও আছেন। যদি আমাতেও তাঁহার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, সেই অনন্ত হইতে যে শক্তি পাইয়াছি, সেই অনন্ত হইতে যে জ্ঞান পাইয়াছি, সেই অনন্ত হইতে যে ইচ্ছা পাইয়াছি, সেইসকল সীমাবদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে না। সেই অনন্ত ঈশ্বর আমাতেও বর্ত্তমান থাকিয়া, মনুষ্যশক্তি সীমাবদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল করিতেছেন, অথচ মনুষ্যকে অনন্ত উন্নতিপথে লইয়া যাইতেছেন, ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। আমরা যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, বাহ্যিক ব্যবহারে তাহা কতকটা সীমাবদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয় সত্য, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ভাব, ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য, দয়া প্রভৃতি অনন্ত উৎস হইতে উৎপন্ন এবং অনন্ত ভাবব্যঞ্জক। সুতরাং আমাদের ইচ্ছাও অনন্ত ভাবপ্রসারিণী; যাহার বুদ্ধি অনন্ত ঈশ্বরকে পাইতে ব্যাকুল; ভক্তি প্রেম অনন্ত ঈশ্বরকে পাইবার জন্য; শক্তি যার অনন্ত-ঈশ্বরকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে—আমরা মানবের সেই ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিকে সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, আপনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় বোধ করি ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে? আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে নির্ব্বোধ, কর্ণ থাকিতেই বধির, শক্তি থাকিতেই অশক্ত বলিয়া কেবল স্বীয় জীবনকে

অন্ধতম কূপে নিমগ্ন করিতে থাকি।

আমরা যদিও এক লাফে সাগর পার হইতে পারি না, পাখীর ন্যায় উড়িতে পারি না; কিন্তু আমাদের অনন্ত প্রসারিণী ইচ্ছা অনন্ত আকাশে বিচরণ করিবার জন্য সততই বাহু প্রসারণ করিতেছে। সুতরাং আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যকারীশক্তি না থাকিলেও ইচ্ছার অনন্তত্ব অস্বীকার করা যাইতেছে না। অতএব যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অপরিবর্ত্তনীয় ও অনন্ত হয়, তবে মানবের ইচ্ছাও অপরিমেয় ও অনন্ত; এবং মানব-ইচ্ছায় যতটুকু পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি, ঈশ্বর-ইচ্ছাতেও সেইরূপ সম্ভব।

কেহ যেন মনে না করেন, আমরা ঈশ্বর ইচ্ছা ও মানব ইচ্ছা এক প্রকৃতির করিতেছি বলিয়া অধঃপাতে যাইতেছি এবং ঈশ্বরকে অবমাননা করিতেছি;—কেবল স্থূল বিষয়গুলি যাহা উপলব্ধি হইতেছে, তাহাই দেখাইতেছি মাত্র। পাঠক! আর একটু ভিতরে প্রবেশ করুন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র তাঁহার "সেবকের নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়া গিয়াছেন "ঈশ্বরের ইচ্ছাই পুণ্য অনিচ্ছাই পাপ।" যদি ইহা সত্য হয়, যদি সংসারে একটী তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য অপরটী অনিচ্ছার কার্য্য বলিয়া সম্পাদিত হয়, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলা যাইতে পারে না। কারণ মানবের ন্যায় তাঁহাতেও ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ভাব আছে। এই অনিচ্ছার ভাব থাকিতেই মানব ইচ্ছা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কথাটা বোধহয় তত স্পষ্ট হইল না; মনে করুন আমার একটা পাখী পুষিবার ইচ্ছা হইল এবং পরক্ষণেই কতকগুলি কারণে বুঝিতে পারিলাম, পাখিটীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায় তজ্জন্য পাখী পুষিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং আমার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঈশ্বর-ইচ্ছার পরিবর্ত্তন ঠিক এই প্রকার না হইলেও, যখন আমরা ঈশ্বরের অনিচ্ছার কার্য্য করিতে যাই, এবং তাহাতে নানাপ্রকার ক্লেশ পাইয়া পুনরায় ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; তখন যেমন আমাদের ইচ্ছার পরিবর্ত্তন সহজে বুঝা যায়—সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া কেন অনুমিত না হইবে? এখানে মানব-ইচ্ছার ও ঈশ্বর-ইচ্ছার এই পার্থক্য থাকিল যে, মানব একটী কার্য্য ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সম্পন্ন করিতে যাইয়া অন্য একটী কারণে তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং ঈশ্বরও সেই কার্য্যটী আমাদের দ্বারায় সম্পন্ন করাইয়া তাঁহারও ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইল; কারণ যখন তাঁর ইচ্ছার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছার কার্য্য করিতে যাই, তখন কি তাঁহার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে না? আরও পরিষ্কার হউক, ইচ্ছার পরিবর্ত্তন অনিচ্ছা এবং অনিচ্ছার পরিবর্ত্তন ইচ্ছা। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুইটী ভাব স্বীকার করা যাইতেছে, তখন ইহাই যে পরিবর্ত্তন তাহাও অবশ্যম্ভাবী।

এখন আর একটা কথা উঠিতে পারে যে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতি। মানব যেমন একটী কার্য্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পরক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা [illegible] প্রকারের [illegible] ঈশ্বরের ইচ্ছা [illegible] সেইরূপ ন্যায় অনন্ত [illegible]

দিকে ইচ্ছার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, অপর দিকে অনিচ্ছার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর কখনও মানবের ন্যায় একটী কার্য্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পরক্ষণের অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা যাহা অনন্তকাল হইতে তাহা ইচ্ছা; অনিচ্ছা যাহা অনন্তকাল হইতে তাহা অনিচ্ছা, সুতরাং তাঁহার আর ইচ্ছার পরিবর্ত্তে অনিচ্ছা, অনিচ্ছার পরিবর্ত্তে ইচ্ছা উপস্থিত হইতে পারে না।

ইহা সত্য, কিন্তু একটী ইচ্ছা করিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ এরূপ ভাব না থাকিলেও ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দুইটী স্বতন্ত্র সত্বা থাকিলেও পরস্পর বিরোধী ভাবকে পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। মনে কর ঈশ্বর আমার মঙ্গল করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; হঠাৎ আমি এই ইচ্ছার বিপরীত পথে চলিলাম—অমঙ্গল আনয়ন করিলাম—ইহাতে তাঁহার অনিচ্ছার ভাব নিহিত রহিয়াছে, ইহা কি ঈশ্বর ইচ্ছার পরিবর্ত্তন নহে? তুমি বলিবে ইহা পরিবর্ত্তন নহে, দুইটী বিভিন্ন সত্বার দুইটী বিভিন্নমুখীন ক্রিয়া মাত্র। পরিবর্ত্তনে একটীর অভাবে অপরটী প্রতিষ্ঠিত করিবে; অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের সার ভাগটুকু এই যে একটী ইচ্ছার পরিবর্ত্তে অপর একটী ইচ্ছা সমুপস্থিত হওয়া; মাঝখানে অনিচ্ছার ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আমরাও এই প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার ভাবকেই পরিবর্ত্তন বলিতে চাই। এক ইচ্ছার পরিবর্ত্তনে অপর ইচ্ছা সমুপস্থিত হউক, ইচ্ছার পরিবর্ত্তন যে অনিচ্ছা তাহা আর অস্বীকার করা যাইতেছে না।

চুরী করা পাপ বা ঈশ্বরের অনিচ্ছা, চুরী না করা ঈশ্বরের ইচ্ছা; এখানে মনুষ্যের ন্যায় একটী ইচ্ছার পরিবর্ত্তে আর একটী ইচ্ছা সমুপস্থিত না হইলেও ইচ্ছার পরিবর্ত্তে অনিচ্ছা সত্বেও যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তন্মধ্যেও সেই ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। নতুবা ঈশ্বরের অনিচ্ছাতেও মানব ভূরি ভূরি পাপ কার্য্যে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিয়া ঘোর পাপাচারী হইতেছে। মানব ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে কার্য্য করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার শক্তি আমাদের দিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে তাহার ভিতর ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান।

তাই কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বলিয়াছেন, সমুদয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে পারে না। ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি, দ্বেষ হিংসা, চৌর্য্য, প্রতারণা প্রভৃতি যাবতীয় অসৎ কার্য্য, ঈশ্বর ইচ্ছাতে সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কাহারও কোন কার্য্য করিবার সাধ্য না থাকে, সদসৎ উভয়বিধ কার্য্যই যে ঈশ্বর ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাদ্বারায় আমাদের পরম মঙ্গলময় সত্স্বরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই যে অসৎকার্য্য সকল সম্পাদিত হইল, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। কুমার এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"কোন একটী ব্যক্তি অন্যের একটী দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল; তজ্জন্য ইহলোকে রাজদ্বারে অপহরণ করা অবশ্যই দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার বিচার ইহলোকে না হইয়া পরলোকে

ঈশ্বরের নিকট হইতে চলিল ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ হইল "আমার বস্ত অমুকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" চোর উত্তর করিল—"উহার কোন বস্ত, সংসারে সকল বস্তই ঈশ্বরের—অতএব যে ব্যক্তি "আমার বস্ত" বলিতেছে, সেই মিথ্যাবাদী এবং রাজদ্বারে তাহারই চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হওয়া উচিত।" ইহাতে হয়তঃ সকলেই বুঝিতে পারিলেন, চুরী, মিথ্যাকথা, পরদারহরণ, বিশ্বসঘাতকতা এসকল কিছুই নয়। সমুদয়ই ঈশ্বর ইচ্ছায় সাধিত হয়। যাহা আমাদের নিকট অসৎ বলিয়া বোধ হইতেছে, বাস্তবিক তাহা আমাদের অজ্ঞানতা দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে মাত্র। অতুল প্রতিভাবলে মানব বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অপূর্ণ মানবকে অনন্তত্ব লাভ করাইবার জন্য কোন মঙ্গলময় পথে যাইবার জন্য এই সকল আপাতঅমঙ্গলকর, দুঃখজনক, মোহজনক, মায়াজনক কার্য্যে মানবকে নিয়োজিত করিতেছেন। যাহা তোমার, আমার কিম্বা মানবসমাজের নিকট ঘৃণ্য, অসৎ, অমঙ্গলপ্রদ, তাহা অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতার অনন্ত মঙ্গলময় বিধানের অন্তর্গত কোন মঙ্গলময় ফলোৎপাদক হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

ঐ যে প্রবল ঝটিকায় গৃহদ্বার ভগ্ন হইল, জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল, কলেরা রোগে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ বিয়োগ হইল ঘোরতর যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হইল, এ সকল আপাততঃ অতীব অমঙ্গলজনক বলিয়া প্রতীতি হইলেও ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলময় বিধানের অন্তর্গত তাহা কে অস্বীকার করিবে?

আবার যখন মনে হয়, ভয়ানক পাপের কার্য্য, যাহাতে জীবনের সমূহ ক্ষতি সমাজের দেশের প্রচুর ক্ষতি, যাহাতে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়, অ'ত্মার আত্মগ্লানি (F) উপস্থিত হয়, দেহের বিনাশ সাধিত হয়, এহেন অসহনীয় নরক যন্ত্রণা ঈশ্বর ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে—তখন শুনিয়া হৃদয় যেন কেমন অবনমিত হইয়া যায়।

এতক্ষণ যাহা পর্য্যালোচনা করা গেল, তাহাতে বোঝা গেল, ঈশ্বরের অনিচ্ছার কোন সত্তা আছে বলা যাইতে পারে না। অনিচ্ছা অভাবাত্মক শব্দ। সুতরাং তাহার কার্য্যও অভাবাত্মক। মানব সেই সকল অভাবাত্মক কার্য্য দ্বারায় যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহাও অভাবাত্মক বা অজ্ঞানতা। প্রজ্ঞাবলে মানব এই সকল দুঃখ যন্ত্রণার অভ্যন্তরেও বিমলানন্দ উপভোগ করিবে। যে ঈশ্বরের অনিচ্ছার ভাবে তুমি মহাপাপে নিমগ্ন হইতেছ, তাহা কোন কার্য্য নহে, প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। সুতরাং ঈশ্বরের অনিচ্ছার কোন সত্ত্বা বা কার্য্য নাই। মনুষ্য তাহা সম্পন্ন করিবে কিরূপে? অতএব সমস্ত কার্য্যই যে সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের মঙ্গলময় ইচ্ছায়ই সম্পাদিত হইতেছে, তাহা অবধারিত সত্য। এবং এইভাব হইতেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত উভয় মহাত্মার মতের সামঞ্জস্য হইতেছে।

ঈশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যাহা দান করিয়াছেন তাহা অবশ্য আমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন, বৃত্তিগুলি যথাযথ আমাদের অধীন না থাকিলে, তাহাদের কার্য্যকারী শক্তি থাকিতে পারে না।

জগতে এমন বস্তু নাই যাহা কাল, দেশ, পাত্রের অধীন নহে। সমুদয়ই এক অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিয়মিত, উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসের অধীন। সুনীল নৈশাকাশবিহারী চন্দ্রমা, উষার স্নিগ্ধতা, মাধ্যাহ্নিক প্রখরতা, ঋতুভেদ, সুমন্দ মারুতহিল্লোল, সকলই সেই একটী গুরু নিয়মের অধীন। ইহাতে হর্ষ বিষাদের কোন কারণ নাই।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

দুঃখ পাই সুখের জন্য সুখ পাই দুঃখের জন্য, এ সংসারচক্র জগৎপ্রপঞ্চ সকলই অবিদ্যা, মিথ্যা। ধন জন, দারা, পুত্র, সমুদায় মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা—আমার দেহ মন প্রাণ মিথ্যা—মিথ্যা যাহাকে তুমি সুখ বলিয়া অনুভব করিতেছ, আনন্দিত হইতেছ;—আমার সুখের জন্য ঈশ্বর চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র পরিমণ্ডিত নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার সুখের জন্য; কুসুম সুবাস, পাখীর কাকলি, কামিনীর কমনীয় কান্তি, নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী সৃষ্ট করিয়াছেন, সংসারে যাহা কিছু আমার সুখের বলিয়া, আনন্দের বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছ, বাস্তবিক এ সমুদয়ই মিথ্যা পরীক্ষার প্রলোভন মাত্র। পরীক্ষা ভিন্ন কোন কার্য্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। শত শত বার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াও, আবার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতে হয়, অথবা প্রস্তুত হইতেই হইবে ইহাই প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সামাজিক গঠনভঙ্গনে, সমাজে নব নব সুনিয়ম প্রতিষ্ঠায়, নব নব শাসন প্রণালীতে সমাজবন্ধন কথঞ্চিৎ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় বটে,—কিন্তু সেই সকল বাহ্যিক মিথ্যা প্রবোচনায় হৃদয় প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। অনন্ত উন্নতির কার্য্য শাসনে সংসিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা কেবল অনন্ত বিবেক দ্বারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনন্ত বিবেক এ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করাইতে সক্ষম করে। অতএব জগতে ধ্বংস, উৎপন্ন, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ বলিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে সমুদয়ই মিথ্যা এবং পরীক্ষার প্রলোভন মাত্র। এই প্রলোভন-ময় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রলোভন-ময় জীবনে প্রলোভনপূর্ণ বিষয় ভিন্ন, অবিদ্যা জনিত মায়া প্রকৃত প্রশস্ত পথে বিচরণ করিতে অল্পলোকেই সক্ষম হইয়া থাকে। অল্পলোকেই সেই মহত্তত্ত্বানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে, সমাজচক্র ভেদ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয়। মানব কোন মহান্ শক্তির অধীনে অতি সূক্ষ্ম দুর্ভেদ্যসূত্রে জড়িত হইয়া, প্রলো-ভনের মোহিনী শক্তিতে স্খলিত পদ, লাঞ্ছিত অপমানিত, দুঃখিত, মর্ম্মাহত—আবার পরক্ষণেই ধূলিধূসরিত অপগণ্ড শিশুর ন্যায় মাতৃমুখ নিরীক্ষণে ব্যস্ত (?)। সংসারে এ রহস্যের মর্ম্ম কে বুঝিবে? কে এ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবে। কাহার সাধ্য প্রলোভনসজ্জিত, চিত্ত মোহ-কর, হৃদয়হারী আদর্শচিত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই মনোবিজ্ঞানাতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, শুভা-পাপবিদ্ধ ভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে? সহজ জ্ঞানানুমোদিত বিবেক-বাণী শ্রবণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাধন ভজন না করিলে, এই ইচ্ছাযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে না। প্রাকৃতিক রাজ্য বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ না হইলে, ধর্ম্মভাবে হৃদয় গঠিত না হইলে যোগতত্ত্ব বুঝিবার

সাধ্য কি? যেখানে পদে পদে বিয়োগ সেখানে যোগের সম্ভাবনা কোথায়? যোগরাজ্যে উপস্থিত হইলে ঈশ্বর ইচ্ছার সহিত স্বীয় ইচ্ছার যোগ করিলে আর অনিচ্ছা-পরিবর্ত্তনশীলতার ভাব থাকে না। ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর অনিচ্ছার কার্য্য দেখিতে পাইবে না। (!) সমুদয়ই তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার অনিচ্ছার কোন কার্য্য নাই; আমরা অজ্ঞানতা দ্বারা যাহা দেখিতে পাই, তাহা মিথ্যা ও শূন্যমাত্র।

শ্রীমনোমোহন দাস।

———:0:———

সাধক-সঙ্গীত।

[৫]

বসবার তরে দিলাম আসন
বসি বসি এই আসি ব'লে তারা হলি অন্তর্দ্ধান;
কোথা গিয়ে রইলি, ফিরে না আসিলি,
আশৈলক্ষ জন্ম ক'রলাম অন্বেষণ।
শিবের বক্ষে বাস যদি না ত্যজিবে,
যদি বিল্বমূলে চিরদিন বসিবে,
তবে বল ক'দিন এমন ভাবে শিবে,
শূন্য রবে আমার হৃদয় আসন।
ছাড় শিবে বাস ছাড় নৃত্য শবে
মায়ের কোলে খেলা মা কি নিত্য সবে,
ছাড় সমর শিক্ষা শিবের সনে ভিক্ষা,
ছাড় ছাড় শিবে শ্মশানে ভ্রমন।

———:0:———

প্রেমে-সমাধি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শব্দ শুনিয়াই "কি হইল কি হইল" বলিয়া ভৃত্যেরা ছুটিয়া উপরে গেল? গিয়া দেখিল ব্রজমোহন অচেতন অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ মাথায় জল দিতে লাগিল, চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল, আর কেহবা বাতাস করিতে লাগিল। বহুক্ষণ

যখন চেতনা হইল না, তখন ভৃত্যেরা বাবুর প্রাণহানির আশঙ্কা করিয়া একজনকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিল।

তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে; উষার আলো পূর্ব্বকাশ উদ্ভাসিত করিবার আশায় পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছে, বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ কুলায় বসিয়া প্রভাতী-ভজন কুজন করিতেছে, তুষারশীতল সুমন্দ-বায়ু অচেতন জীবসকলকে সচেতন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সেই মৃদু সমীরণ স্পর্শে কৃষ্ণধন চক্ষু মেলিয়া চাহিল; চাহনি উদাস, শরীর অবশ। ডাক্তার আসিয়া অচেতন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, "সে কিছু হয় নাই' বলিয়া তাহাকে বিদায় করিল। প্রভাত হইতেই টেলিগ্রাফের পিয়ন, একখানা টেলি-গ্রাম দিয়া গেল,—তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "কাল সন্ধ্যাকালে মহামায়ার মৃত্যু হইয়াছে, তুমি শীঘ্র বাড়ী চলিয়া আইস"।

এইরকমের যে কিছুএকটা হইবে তাহা কৃষ্ণধন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। এখন তাহার বেশ বোধহইল যে পূর্ব্ব-রাত্রের স্ত্রীমূর্ত্তি তাহাকে পরলোকর অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছিল। কি আর করে, শোকাতুর কৃষ্ণধন কালবিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

বাড়ী আসিতেই মহা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। কৃষ্ণধনও অনেক কাঁদিল। এখন তাহার জীবন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে; আর কাহারও জন্য যেন মায়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, ভালবাসা নাই। কেমন যেন সকল বিষয়েই একটা উদাসের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; কোনও বস্তুতে স্পৃহা নাই, কোনও জিনিষ ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই। চিত্তের কি এক বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

ব্রাহ্মণের একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়; কৃষ্ণধন দশদিন পবিত্র-ভাবে যাপন করিয়া আজ একাদশ দিবসে শুদ্ধচিত্তে শ্রাদ্ধীয় বেদীতে আসীন হইয়াছে। আজ আবার তাহার সেই দেবী-মূর্ত্তির কথা মনে পড়িল, আজ আবার সেই মহাদেবীর অন্তিম বাক্যাবলী মনে হইল। কাঁদিয়া উঠিয়া কৃষ্ণধন বলিল, আমি শ্রাদ্ধ করিব না। কে যেন অলক্ষ্যে তাহার কানে কানে বলিয়া গেল,—'তুমি শ্রাদ্ধ করিবেনা? তাহা হইলে যে তোমার কর্ত্তব্যের অবহেলা করা হয়, তাহাতে পাপ হইবে যে তোমার, তুমি শ্রাদ্ধ কর, তোমার মঙ্গল হইবে"। আবার প্রাণে শক্তি আসিল, আবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণধন মহামায়ার শ্রাদ্ধ করিল।

কৃষ্ণধন মহামায়াকে খাইতে দিবে, অন্নাদি লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বহুক্ষণ গেল, কেহই আসিল না, কেহ সে অন্ন গ্রহণ করিল না। কৃষ্ণধন বিরক্ত হইয়া নিজেই সে অন্ন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সেই গ্রাস হাতে তুলিয়া মুখে দিতে যাইবে, অমনি কে যেন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, তোমার এখনও পরলোকে বিশ্বাস হয় নাই? তুমি কি মনে-কর আমি এ অন্ন খাই নাই? কৃষ্ণধন বলিল (পাঠকের মনে থাকে যেন সূক্ষ্ম-দেহীর সহিত কথা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে হইয়া থাকে সে কথা মনে মনে, অন্যে শুনিতে পায় না, রবীন্দ্র নাথের ভাষায় তাহা—আমিই জানি,

আমার মনই জানে"।) কি করিয়া বুঝিব যে তুমি খাইয়াছ? আমি এতক্ষণ তোমার আশায় আশায় বসিয়া রহিলাম, কৈ, তুমি তো আসিলে না, অগত্যা আমিই খাইতে ছিলাম। উদ্ধগতা মহামায়া বলিল, তাও কি হয়? আমি যে খাইয়াছি, আমার উচ্ছিষ্ট খাইলে আমাদের উভয়েরই অপরাধ হইবে। আমরা সূক্ষ্মদেহী, প্রত্যেক বস্তুরই সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তোমরা স্থূলদেহধারী স্থূলাংশ গ্রহণ কর। তুমি এ অন্ন গ্রহণ করিও না, আমি ইহার সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়াছি। সে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণধন উঠিল। *

* পুস্তকে লিখিত অলৌকিক ঘটনাগুলি প্রায় সকলই সত্যের উপরে সংস্থাপিত। পাঠকের বিশ্বাস না হইলে, লেখক নাচার; হিন্দু অহিন্দু হইল, কাহার দোষ দিব?

শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের অবকাশে কলেজ বন্ধ হইয়াছিল, আবার খুলিতে চলিল। যথা সময়ে কৃষ্ণধন কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেল।

তাহার অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ভগবান-লাভের জন্য সে এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধন্য স্ত্রী, এখন হইতেই তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে চলিলে; যাও মা যাও, তুমি মহামায়া,—এক মায়ায় তুমি জগতের ঘরে ঘরে স্ত্রীরূপে বিরাজিত, আর এক মায়ায় তুমি জগতে জননীরূপে তোমার হৃদয়ের স্নেহদানে সন্তানকে আপদে বিপদে রক্ষা করিতে তৎপরা। তবে তাই হউক, তোমার সন্তানকে রক্ষা কর; দেখিব মা, তুমি কৃষ্ণধনকে লইয়া আবার কোন্ লীলার অবতারণা কর। (ক্রমশঃ।)

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

---:0:---

প্রতিদান।

ফলবান বৃক্ষে যদি কর লোষ্ট্রাঘাত,
প্রতিদানে বৃক্ষ তোমা তোষে ফল দিয়ে,
অসতের অত্যাচার নীরবে সহিয়ে,
কোলে তুলে লয় তারে যেজন মহৎ॥

মাধার প্রহারে নিতাই বলেছিল হেসে,
'মেরেছ মাধাই মোরে কোন ক্ষতি নাই,
একবার 'হরি বলে' কোল দেরে ভাই,'
এমন সুজন বল আছে কোন দেশে॥

---:0:---

উপদেশ—সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

৫১। যাঁতা যন্ত্রের (ময়দা, গম ভাঙ্গিবার যন্ত্র বিশেষ) মধ্যস্থ খুটা হইতে দূরবর্ত্তী গম, কালাই প্রভৃতি চাকার নিষ্পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু যেসকল গম, বা কালাই খুটাকে আশ্রয় করে তাহার অক্ষত দেহে বর্ত্তমান থাকে; এ সংসারও

যাঁতাবং, যাহারা অহংবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে চায়, তাহারা সংসার-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; কেবল সাধুসজ্জন, যাঁহারা এ সংসারযন্ত্রের খুটাস্বরূপ ভগবানকে আশ্রয় করে তাহারাই "এধার ওধার দুধার রেখে খেয়ে যায় দুধের বাটী"।

৫২। জগৎকে ভগবদ্ভাবে ভালবাসার নাম প্রেম।

৫৩। যদি জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পার, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কি হইবে? যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

৫৪। শিষ্য দূরেই থাকুক, আর কাছেই থাকুক তাহারা কখনও গুরুর মঙ্গলদৃষ্টির অন্তরাল হয় না।

৫৫। যাহারা গুরুর আদেশে—ভগবদাদেশে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; তাহাদের অভিমান ত্যাগ করিয়া—ফলাফলে বিচার না করিয়া কায়মনোবাক্যে নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিয়া যাওয়া উচিত।

৫৬। বনে সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত বাস করিবে, তবু অসতের সহবাসে থাকিবে না।

৫৭। জীবসেবা,—সাধ্যানুসারে পরোপকার এ প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম ত্যাগকরিলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না।

৫৮। মানবজীবন সুখে ও দুঃখে আবৃত, তাই জীব প্রকৃত জীবনের পরিবর্ত্তে সুখদুঃখ-ভোগাবস্থাকেই জীবন নামে অভিহিত করে।

৫৯। চিৎ ও আনন্দ কিম্বা জ্ঞান ও ভক্তি জীবনের স্বাভাবিক সম্পত্তি—স্বরূপ অবস্থা, খোঁজ করিয়া লইতে হয় না; কেবল সাধনা দ্বারা সুখদুঃখের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অতীত হইতে পারিলে আপনা হইতেই স্বরূপের অভিব্যক্তি হইবে।

৬০। যদি সত্য লাভ করিতে—আপনার স্বরূপ অবস্থা লাভ করিতে চাও, তবে ভগবানে দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও—নিশ্চয়ই সত্যলাভ হইবে।

৬১। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত বিদ্যা, ধন, মান, শারীরিক বল, খ্যাতিপ্রতিপত্তি সমস্তই বৃথা।

৬২। ইচ্ছাময়ী মা কাহারও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না, কেবল ইচ্ছাটী বিশুদ্ধা ও একমুখী হওয়া প্রয়োজন।

৬৩। যতক্ষণ সংসারে আছ কাহাকেও আঘাত করিও না, কেহ আঘাত করিতে আসিলে নিবারণের চেষ্টা করিও, কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করা দুর্ব্বলতা সুতরাং পাপ।

৬৪। যদি ভগবানের বিকাশ বুঝিতে চাও—সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট রোগশোকের মধ্যে আপনাকে আনন্দে রাখিতে চেষ্টা করিও

৬৫। কেবল মন্ত্র লইলে শিষ্য হওয়া যায় না—বিশ্বাস করিয়া মন প্রাণ না ঢালিয়া দিতে পারিলে শিষ্য হওয়া বৃথা।

৬৬। সুখ দুঃখ মায়ার খেলা—ভোগ লালসা ইন্ধন, যতক্ষণ ইন্ধন থাকে ততক্ষণ আগুণ নিবিয়া যায় না।

৬৭। লোকে তোমাকে যতই পর মনে করুক না কেন তুমি কাহাকেও পর মনে করিও না।

৬৮। অপকারীকে উপকার দ্বারা পরাজয় করিবে। সকলকে প্রেমে বশীভূত রাখিবে।

৬৯। ভগবানের প্রীতিসাধন ব্যতীত নির্ম্মল আনন্দ কোথায়ও নাই; সুতরাং অন্য হইতে সুখের আশা বিড়ম্বনা।

৭০। মনুষ্যত্ব লাভের প্রকৃত ও অকপট ইচ্ছা থাকিলে স্বয়ং ভগবান্ তাহার সহায়।

ক্রমশঃ।

———:0:———

তীর্থ-যাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

৩রা চৈত্র শনিবার—অদ্য প্রাতে প্রত্যেকে ২।৶০ আনা হারে টিকিট কিনিয়া বেলা ৮॥০ টার গাড়ীতে ডাকোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং ১১ টার সময় রতমল পহুছিয়া তথায় মাধ্যাহ্নিক আহারাদি ক্রিয়া সমাপনকরতঃ পুনরায় ১২ টার সময় গাড়ীতে উঠিলাম এবং ৫½টার সময় গুজরাটের অন্তর্গত গুদরা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরস্থিত সরকারী ধর্ম্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানে আগন্তুক আসিবামাত্র তাহাকে স্থানীয় পুলিশ আফিসে নাম ধাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিবরণ লিখাইয়া দিতে হয়; তদনুসারে সন্ধ্যার পর দুইজন পুলিশ আসিয়া আমাকে ধর্ম্মশালা হইতে প্রায় এক মাইল দূরস্থিত পুলিশ আফিসে লইয়া গেল। আমি তথায় পহুছিয়া আমাদের নাম ধাম, কত জন আসিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি ইত্যাদি বিবরণ লিখাইয়া দেওয়ার পর একজন পুলিশ আমাকে ধর্ম্মশালায় পহুছাইয়া দিয়া গেল। এখানে রাত্রিকালে পুলিশ আফিসে যাইতে আমার একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল এবং আমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সঙ্গীগণও বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমাকে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন, আমরা আহারাদি সমাপনান্তে নিদ্রার কোলে রাত্রি কাটাইলাম।

৪ঠা চৈত্র রবিবার—ভোর ৫½টায় ডাকোর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া বেলা ৮½টার সময় ডাকোর ষ্টেশনে অবতরণকরতঃ ৯টার সময় ষ্টেসন হইতে একক্রোশ দূরস্থিত গুজরাটী বণিকদিগকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা দ্বয়ের একটীতে শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ উদয়রাম পাণ্ডা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলাম। তদনন্তর গোমতীগঙ্গায় স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে ভগবান্ ৺ডাকোরজীকে দর্শন করিতে গেলাম। সেই মূর্ত্তি যে কত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। মন্দিরের সম্মুখে ফুল, বেলপাত, মাখনমাটী, মিশ্রী প্রভৃতি পূজোপকরণ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। আমরা পূজা ও ভগবানের ভোগ দেওয়ার জন্য পাণ্ডাজীকে ৫৲ পাঁচ টাকা দিলাম

মন্দিরটী অতি বৃহৎ ও নানারূপ কারুকার্য্য-খচিত। এই মন্দির পেশোয়ারের নায়েব প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত। নায়েবের পুত্র সন্তানাদি না হওয়ায় সন্তানকামনায় মন্দির নির্ম্মাণের মানস করিয়াছিলেন। যথাকালে ভগবদনুগ্রহে একটী পুত্রসন্তান জন্মিল; নায়েবমহাশয়ও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে এই মন্দির নির্ম্মাণ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

৺ডাকোরজীর মন্দির প্রস্তুত করাইতে পেশোয়ারের নায়েব মহাশয়ের একলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বরদার গায়েকোয়ার এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ভগবানের মন্দিরের পার্শ্বে একটী বৃহৎ দালানে নানা কারুকার্য্য-খচিত রৌপ্যনির্ম্মিত চারি পাঁচশত হাওদা মণিমাণিক্যনির্ম্মিত শয্যা—আস্তরণ, স্বর্ণ-রৌপ্যের পিকদান, রেকাব, বিড়িদানী, গাড়ু, খড়া, জলচৌকী প্রভৃতি নানাবিধ আসবাব স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; স্বতঃই মনে হয় যেন যদুবংশীয় রাজগণ এখনও এখানে রাজত্ব করিতেছেন।

বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের বহুপূর্ব্বে এখানে একটী সামান্য মন্দির ছিল এবং তথায় একজন সাধক বাস করিতেন। তিনি এখান হইতে পদব্রজে ছয়মাসে দ্বারকাধামে এক একবার যাতায়াত করিতেন। বৃদ্ধকালে যাতায়াতে অপারগ হইয়া শ্রীশ্রীদ্বারকানাথজীকে আপনার অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিলেন, ভক্তাধীন বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ স্বপ্নযোগে তাঁহাকে জানাইলেন যে তোমাকে আর আসিতে হইবে না, আমিই তোমার নিকট যাইব। গোমতীর ধারে একটী ছোট দালানে উক্ত সাধকের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ডাকোরজীর মন্দির হইতে কিছুদূরে নানা কারুকার্য্যখচিত সম্মুখে রূপার কবাট বিশিষ্ট ৺লক্ষ্মীমাতার একটী ছোট মন্দির আছে; তদ্ভিন্ন ঐ স্থানে অন্যান্য দেবতাও আছেন। এখানে ৺ডাকোরজীর ডাক নাম রণছোড়জী। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমায় এখানে বৃহৎ মেলা হয়; ঐ উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

গোমতী গঙ্গার ধারে সত্যভামার তৌল-যজ্ঞের স্থান, এইস্থানে নারদ দেখাইয়াছিলেন কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নাম বড়।

৫ই চৈত্র সোমবার—অদ্য ডাকোর সহরের দর্শনীয় স্থান গুলি দেখিলাম। বেলা ৫টার সময় জুনাগড়াভিমুখের যাত্রা করিলাম, সমস্ত রাত্রি গাড়ীতেই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল ডাকোর হইতে জুনাগড়ের ভাড়া ৩৸০ আনা।

৬ই চৈত্র মঙ্গলবার—বেলা ১২টার সময় গাড়ী জুনাগড় পঁহুছিল। আমরা তথায় শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর পাণ্ডা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

৭ই চৈত্র—অদ্য প্রাতে শ্রীযুত মণিশঙ্কর পাণ্ডা মহাশয়ের সমভিব্যাহারে বাসা হইতে রওয়ানা হইলাম। আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পলাশিনী সেতু (স্বর্ণরেখার উপরস্থিত সেতু) পার হইলাম—এখানে প্রত্যেককে ৵০ আনা হিসাবে কর দিতে হইয়াছিল। পলাশিনী সেতুর অদূরে গোমতীগঙ্গা ও স্বর্ণরেখার সঙ্গম-স্থল ত্রিবেণীগঙ্গা নামে অভিহিত; এখানে স্নানতর্পণাদি করিতে হয়। ত্রিবেণীগঙ্গা

হইতে অল্পদূরে দামোদরকুণ্ড; স্বর্ণরেখার প্রশস্তায়তন জলাংশই দামোদরকুণ্ড নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে যে রাজা চন্দ্রকেতুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু ও দেবাদিদেব মহাদেব চন্দ্রকেতুপুর (বর্ত্তমান জুনাগড়) রাজধানীর সন্নিকটে অবস্থিতি করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তদবধি ভগবান্ বিষ্ণু এই দামোদরকুণ্ডে এবং তথা হইতে কিছুদূরে সুবর্ণরেখা নদীতীরে ভবনাথমন্দিরে মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। দামোদরকুণ্ড মহাতীর্থ স্থান। এখানে স্নানতর্পণ করিলে পাপনাশ ও পিতৃপুরুষদিগের সদ্গতি হয়। কুণ্ডের চারিদিক উচ্চ শৈলমালা বেষ্টিত এবং ঘাট, সোপানাদিও প্রস্তর নির্ম্মিত। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্যে ২৭৫ফুট এবং প্রশস্তে ৫০ফুট হইবে। কুণ্ডতীরে বহুসংখ্যক মন্দির, ধর্ম্মশালা ও পান্থনিবাস। বিস্তর নাগাসন্ন্যাসী কুণ্ডতীরে অবস্থিতি করিতেছেন। কুণ্ডেরতীরে হিন্দুর মহাশ্মশানক্ষেত্র; দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি কুণ্ডজলে নিক্ষিপ্ত হয়। কুণ্ডজলের এমনই গুণ যে অস্থি জলে পড়িবামাত্র ক্ষণবিলম্বেই দ্রবাকারে গলিয়া কুণ্ডজলের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

রেবতীকুণ্ড।

দামোদরকুণ্ডের নিকটেই রেবতীকুণ্ড। রাজা রৈবতের কন্যা এবং বলদেবের পত্নী রেবতীদেবীর নামেই এই কুণ্ড খ্যাত। কুণ্ডের পার্শ্বেই যে বিশাল, বিরাট দুরধিগম্য পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে তাহাকেই অধুনা লোকে রেবতাচল বলে, কিন্তু পুরাণে সমগ্র শৈলমালাই রেবতাচল বলিয়া বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধ শিলালিপি।

রেবতাচলের পাদদেশে একটী প্রাচীন কীর্ত্তি নিদর্শন আছে। একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে তিনটী প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে। শিলালিপির বিবরণ পালি ভাষায় লিখিত। উক্ত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে সম্রাট অশোক, রুদ্রদম ও স্কন্দগুপ্তের তিনটি বিভিন্ন শিলালিপি আছে। অশোকের শিলালিপি খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০ বৎসরের প্রাচীন; ইহাতে পশ্চিম ভারতে অশোকের রাজ্যবিস্তারের কথা আছে। রুদ্রদমের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে ১৫০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় রাজা দক্ষিণাত্যের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন; আর স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিতে জানা যায় যে ঐ রাজা ৪৫৭খৃষ্টাব্দে সুদর্শনকুণ্ডের ভগ্নবাঁধ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং জলপ্লাবনে সেতু ভগ্ন হইলে তাহাও পুনঃ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সুদর্শনকুণ্ড গিরিণারের নিকটেই অবস্থিত।

সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট অনাবৃত প্রস্তর খণ্ডের (শিলালিপি) উপর ছাদ ও চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া দিয়াছেন।

ভবনাথ মহাদেব।

দামোদরকুণ্ড হইতে প্রায় একক্রোশ পূর্ব্বে সুবর্ণরেখা নদীতটে নিভৃত বটবন মধ্যে রাজা চন্দ্রকেতুর স্থাপিত ভবনাথ মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। মন্দিরের নিকট আরও কয়েকটী ভগ্ন প্রাচীন মন্দির আছে। উহাদের মধ্যে একটীর দ্বারদেশের প্রস্তরখণ্ডের উপর ভোজরাজের শিলালিপি আছে। প্রতি মাঘ মাসে এখানে মেলা হয়। মন্দিরের নিকট

মৃগীকুণ্ড আছে, ইহাতে যাত্রীরা স্নান করিয়া থাকে। সুবর্ণরেখাতীরে সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্য-বরাহ, সম্বর মৃগ প্রভৃতি জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় জঙ্গল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মেজর রাসেল (Major Russell) এই জঙ্গলে একটী বৃহৎ সিংহ শিকার করেন, ইহার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত জঙ্গলে শিকার করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সুদর্শন।

ভবনাথ মহাদেবের মন্দির হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে "সুদর্শন তালাও" দৃষ্টিগোচর হয়। এই জলাশয় কাহাদ্বারা নির্ম্মিত তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারে না। তবে প্রাচীন শিলালিপি দৃষ্টে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট অশোক, রুদ্রদম ও স্কন্দগুপ্ত ইহার জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন।

রেবতাচল বা গিরিণার দর্শন।

আমরা রেবতাচলের নিম্নস্থিত তীর্থ সকল দর্শনান্তে বেলা ৮টার সময় পর্ব্বতের পদমূলে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের সম্মুখে জুনাগড়ের নবাবের একটী আফিস আছে, তথায় একজন কর্ম্মচারী অবস্থিতি করেন; পর্ব্বতারোহিগণকে জনকরা ।০ চারি আনা হিসাবে ফিস দিয়া তাহার নিকট হইতে টিকেট লইতে হয়।

যখন ভগবানের লীলাক্ষেত্র পুণ্যময় রৈবতক পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম তখন হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। কি মহান্ অভ্রভেদী উচ্চ পর্ব্বত-চূড়া! আবার তাহার উপর শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির কি সুন্দর! মনে হইতে লাগিল যেন অমরাবতী গমন করিতেছি! পর্ব্বতে উঠিবার প্রবেশপথে বিশাল তোরণ-দ্বার; তথায় বহু সংখ্যক শাস্ত্রী প্রহরী সশস্ত্রে পাহারা দিতেছে, তদ্ভিন্ন অনেক সাধু-সন্ন্যাসীও অবস্থিতি করিতেছেন, তোরণদ্বার পার হইলেই বামপার্শ্বে একটী ধর্ম্মশালা ও "ছান্দানি বাব" নামক একটী কূপ আছে। এই দুইটী বোম্বাই সহরের বিখ্যাত ধনকুবের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ মহাশয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত।

তোরণদ্বার অতিক্রম করিলেই সম্মুখে বিস্তৃতায়তন প্রস্তর সোপান। দুই তিনটী করিয়া সোপানের, পরে পরেই একটী করিয়া চত্বর ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রাম গৃহ। এই রূপ স্তরে স্তরে ক্রমাগত দ্বাদশ সহস্র সোপান পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল জুনাগড়ের নবাব বাহাদুর এই অদ্ভুত সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

বহুযাত্রী ও সন্ন্যাসিগণ পদব্রজে এই সোপানশ্রেণী অতিক্রমকরতঃ পর্ব্বতের শিখর-দেশে আরোহণ করেন। কিন্তু ধনবান, বিলাসী বা অসমর্থদিগের পক্ষে ডুলির বন্দোবস্ত আছে। ডুলি বা ঝোলা পাচজন হইতে দশজন বাহকের স্কন্ধে বাহিত হয়। ডুলি আমাদের দেশীয় ডুলির ন্যায়, মাত্র একজন আরোহণ করিতে পারে। পাচজন বাহকের ডুলির ভাড়া ৫৲ পাচ টাকা তদূর্দ্ধে ৭৲। ৭৷৷০ টাকা, এমন কি ১০৲ টাকা পর্য্যন্তও ডুলির ভাড়া আছে।

সোপানারোহণের পথের দৃশ্য অতি

মনোহর। সোপানের দুই পার্শ্বের বনের শোভা, অতি বিচিত্র, নানা জাতীয় পশু পক্ষী নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে—দেখিলে প্রাণে স্বতঃই স্বর্গীয় আনন্দের উদ্রেগ হয়। সোপান আরোহণ করিবার পথে পর পর ছয়টী "পরব" অর্থাৎ বিশ্রামস্থান আছে; তাহাদের নাম যথা,—ছেছু, গোরী, ঢোলী, কালী, মালী ও সুভাবদি।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম "পরবে" (ছেছু) পঁহুছান যায়, ইহা ৪৮০ফিট উচ্চ; দ্বিতীয়টী হাজার ফিট উচ্চ। এখানে কটী সাধু আছেন, তাহার নিকট প্রত্যেক যাত্রী ৵০ এক আনা হারে দিলে খিচুরীভোগ ও মিষ্ট জল পাওয়া যায়। তৃতীয় "পরব" ১৪০০ ফিট উচ্চ। এইরূপে সোপানশ্রেণী ক্রমে উচ্চ হইতে পর্ব্বতের উচ্চতর শিখরদেশে উঠিয়াছে। যত্নাভাবে এইসকল পরব ধ্বংসপথে চলিতে-ছিল; ১৮০১ খৃষ্টাব্দে হরকুমার শেঠানী নামে জনৈক জৈন ইহাদের জীর্ণসংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

আমরা ক্রমান্বয়ে সোপানারোহণ করিতে করিতে গুরুদত্তাত্রেয়ের গহ্বর সমীপে উপস্থিত হইয়া তথায় সযত্নে রক্ষিত গুরু-দত্তাত্রেয়ের পাদুকা সমীপে কিঞ্চিৎ প্রণামী প্রদান করতঃ আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম। বেলা ১২টার সময় গোমুখীকুণ্ডে উপনীত হইয়া স্নানাহ্নিক ও মাধ্যাহ্নিক ভোজন ক্রিয়া সমাধা করিলাম। কুণ্ডে নামিয়া অবগাহন করিবার রীতি নাই, কুণ্ড হইতে জল উত্তোলন করতঃ স্নান করিতে হয়, এবং তজ্জন্য প্রত্যেককে এক আনা হিসাবে শুল্ক দিতে হয়।

দেবকোট।

অম্বামাতার মন্দিরের চারিশত ফুট নিম্নে জৈনদিগের নেমিনাথ মন্দির আছে। এই-শৃঙ্গে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের বহির্দ্দেশে চুরসমা রাজপুত রাজাদিগের প্রাচীন প্রাসাদ ও দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার উত্তরে ভীমকুণ্ড নামে একটী পবিত্র কুণ্ড আছে; পূর্ব্বে এই কুণ্ডস্থানেই বৌদ্ধ গুহাদি অবস্থিত ছিল। আর এই স্থানেই ভৈরবঝাঁপ নামক প্রস্তর আছে। পূর্ব্বে মুক্তিপ্রয়াসী সাধু ভক্তেরা এই প্রস্তরের উপর হইতে লাফাইয়া নারিকেল ফলের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঝম্প প্রদানকরতঃ প্রাণত্যাগ করিতেন। বর্ত্তমানে উক্ত প্রস্তরের উপর হইতে ঝম্পপ্রদান সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অম্বামাতা।

গিরণারে পাঁচটী প্রধান শৃঙ্গ যথা (১) অম্বামাতা, অথবা গিরণার দেবী, (২) গোরক্ষনাথ, (৩) ওথাদ বা অঘোরশঙ্কর, (৪) গুরু দত্তাত্রেয় (৫) কালকা শৃঙ্গ। এই কয়টীর মধ্যে গোরক্ষনাথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ; ইহা উচ্চে প্রায় ৩৬৬৬ ফুট। গুরু দত্তাত্রেয় শৃঙ্গ প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চ। এই শৃঙ্গে প্রাচীনকালে ঋষি দত্তাত্রেয়ের আশ্রম ছিল। কালকা শৃঙ্গে পূর্ব্বে শবমাংস-ভোজী অঘোরী-সম্প্রদায়ের একটী প্রধান স্থান ছিল।

অম্বামাতার শৃঙ্গ সর্ব্ব নিম্নের শৃঙ্গ। ইহাতে অম্বামাতার মন্দির আছে। অম্বা-মাতার মন্দিরে মায়ের একখানি চিত্রপট

আছে; উহা বড়ই চিত্তাকর্ষক ও ভাবোদ্দীপক। চিত্রটী এইরূপ;—সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গসংকুল মহাসমুদ্র—একটী ভক্ত মাতৃদর্শনাভিলাষী হইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণকরতঃ সেই মহাসমুদ্রের মধ্যদিয়া মায়ের মন্দিরের দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। নৌকাখানা ডুবু ডুবু, ভয়ে তাহার প্রাণ কণ্ঠগত: দূর হইতে মা যেন তাঁহার অভয় হস্ত উত্তোলন-করতঃ অভয়বাণীতে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন—ভয় কি বৎস, এস, আমি তোমার সহায়; আর ভক্ত যেন মায়ের সেই অভয়বাণী লক্ষ্য করিয়াই মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে! এই স্থানে জৈনদিগের মন্দির আছে, এই শৃঙ্গের উচ্চতা ২৭০০ ফুট।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—0—

সংবাদ ও মন্তব্য।

জন্মোৎসব—বিগত ৩১শে শ্রাবণ শনিবার ঝুলন পূর্ণিমার দিন অত্র আশ্রমাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের বার্ষিক জন্মতিথি-উৎসব গতবারের স্থায় এবারও যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

—0—

শান্তি-আশ্রম ষ্টেশন—গত ১লা জুলাই হইতে "শান্তি আশ্রম" ষ্টেশনের (Flag Station) কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। এখন হইতে শান্তি-আশ্রমে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ আশ্রমের অনতিদূরস্থিত "শান্তি-আশ্রম", ষ্টেশনে গাড়ী আরোহণ ও অবতরণ করিতে পারিবেন। যোরহাট হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ✓ তিন আনা। আমরা এই জনহিতকর কার্য্যের জন্য, যোরহাট ষ্টেটরেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ ও সুযোগ্য ম্যানেজারমহোদয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

—0—

শোক-সংবাদ—"শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ-নিকেতনের" সেবক-সম্প্রদায়ের অন্যতম সভ্য ৺রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহ জগতে আর নাই। গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীমৎ পরমহংসদেব মহারাজ সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পরিভ্রমণে গিয়াছিল, শ্রীমৎ পরমহংসদেব মহারাজ তথা হইতে আপন জন্মভূমি কুতুবপুর নদীয়া যাওয়ার পথে অল্প অল্প জ্বর হয়, সেই জ্বরই তাহার কাল হইল। দশদিন জ্বরে ভুগিবার পর গত ২৫শে আষাঢ় বুধবার বেলা ৪টা ৪৫মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুপাটে শ্রীগুরুচরণে মাথা রাখিয়া গুরুভাই-দিগদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুচরণ ধ্যান করিতে করিতে হাসিমুখে সজ্ঞানে চিরতরে গুরুপদে বিলীন হইয়াছে। কেন যে আজ সেবকসম্প্রদায় তাহার মত সরল, বিনয়ী, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, সহিষ্ণু ও ধীর একটী অমূল্য রত্ন হারাইল তাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবই জানেন। সেবাকার্য্যে তাহার অদম্য উৎসাহ ছিল; ঘৃণা কিম্বা জাত্যাভিমান একবারেই ছিল না। অতি অল্পদিন মধ্যেই সে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার পরাশান্তি কামনা করিতেছি। বারান্তরে তাহার ক্ষুদ্রজীবনের আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল

—0—

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তীর্থ-যাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

দাতার-পর্ব্বত।

গিরণারের অপর পার্শ্বে দাতার-পর্ব্বত। ইহা উচ্চতায় ২৭৭৯ ফুট। দাতারের শিরোদেশে মুসলমানদিগের পীর জয়মলশার দরগা আছে, জয়মলশার গুরু পীরপাট্টা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থ জয়মলকে সৌরাষ্ট্রে পাঠাইলে জয়মল এই পর্ব্বতের শিরোদেশে দরগা স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে এখানে পীরকে পূজা দিলে কুষ্ঠরোগী নিরাময় হয়, তাই এখানে অনেক কুষ্ঠরোগীর সমাগম হইয়া থাকে।

বৈরতকের নাম রহস্য ও মাহাত্ম্য।

বৈরতকের আরও সাতটী নাম আছে। যথা;—(১) হরসিদ শিকরা, (২) শ্রীসহস্র-কমলা; (৩) শ্রীধাকগিরি; (৪) গিরিরাজ (৫) মরুদেবীপার্ব্বতী; (৬) বাহুবলী; (৭) স্নবর্ণগিরি।

বস্ত্রাপথ।

স্কন্ধপুরাণোক্ত প্রভাসখণ্ডের যে ত্রিশ অধ্যায়ে রৈবতক সম্বন্ধে বর্ণনা আছে, তাহা রৈবতক-মাহাত্ম্য নামে অভিহিত। রৈবতক-মাহাত্ম্যমতে প্রভাসক্ষেত্র অথবা সোমনাথ-পত্তন এবং তন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্র তীরস্থিত স্থানসকল হিন্দুর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থান; তন্মধ্যে আবার রৈবতক বা বস্ত্রাপথ আরও পুণ্যপ্রদ।

বস্ত্রাপথ (রৈবতক) সম্বন্ধে স্কন্ধপুরাণে এরূপ লিখিত আছে যে একদা কৈলাস-বাসিনী পার্ব্বতী কথাপ্রসঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, আপনি কিসে সমধিক সন্তুষ্ট হন? মহাদেব হাসিয়া

উত্তর করিলেন—"যে সত্যবাদী, যে পরদার গমন করে না, যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, এবং যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী, সেই আমাকে সমধিক প্রসন্ন করিতে পারে"। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এখন সময় বিষ্ণু সমস্ত দেবতাগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরকে সম্বোধন-করতঃ ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, হে দেব, আপনি অল্পেই প্রসন্ন হইয়া দৈত্যগণকে অসম্ভব বর প্রদান করিয়া থাকেন; ইহাতে প্রজারক্ষণ কার্য্যে সময় সময় আমাকে বড়ই বিপদে পতিত হইতে হয়। এরূপ করিলে কে আর আমার পূজা করিবে? সদাশিব উত্তর করিলেন—হে বিষ্ণো, তুমি অকারণ আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ কেন? আমার স্বভাবই এইরূপ—তাই লোকে আমাকে আশু-তোষ বলিয়া থাকে। যদি একান্তই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাক, আমি এই মুহূর্ত্তে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি; এই বলিয়াই সেইস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। দেবী পার্ব্বতী তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া দেবগণ সহ ভোলানাথের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

এদিকে মহাদেব কৈলাস পরিত্যাগকরতঃ ঘটনাচক্রে রৈবতকপর্ব্বতে উপনীত হইলেন, মহাদেব রৈবতকের যে স্থানে উপনীত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ অদৃশ্য হইলেন তিনি সেইস্থানেই লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তে উক্তস্থানের নাম বস্ত্রাপথ। দেবতাগণও তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে রৈবতকে উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বতী উজ্জয়ন্তপর্ব্বতে, বিষ্ণু রেবতাচলে, গঙ্গা ও অন্যান্য নদী, শেষ নাগ ও অপরাপর দেবতাগণ ঐ পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধি-ষ্ঠিত হইয়া মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগি-লেন। বহু তপস্যার পর ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবতাগণকে দর্শন দিলেন। দেবতাগণ কৃতাঞ্জলীপুটে কাতরবচনে দেবাদিদেবকে কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইলে, আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু দেবতাদিগকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করাইলেন যে তাহাদিগের প্রত্যেককেই আংশিকভাবে রৈবতকে অবস্থিতি করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞানুযায়ী দেবতাগণ তাহাই করিলেন। কালে ইনিই ভবনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন। প্রতিশ্রুতিবিধায় জনার্দ্দন দামো-দর নামে অম্বামাতা ও অন্যান্য দেবতাসহ অবস্থিতি করিতেছেন।

বস্ত্রাপথের মাহাত্ম্য।

একদা রাজা গজ পত্নী সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নানে গমনকরতঃ গঙ্গাতীরে ভদ্র ঋষির দর্শন পাইলেন। রাজা ঋষিবরকে যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনে, জীব কোন স্থানে গেলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পাইতে পারে তাহা বলুন। মুনিবর উত্তর করিলেন—উপযুক্ত কালে বহুস্থানই শান্তিপ্রদ হইতে পারে; তবে একমাত্র বস্ত্রাপথই এমন শান্তিপ্রদস্থল যে জীব যখনই তথায় গমন করুক না কেন নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবে; দামোদরকুণ্ডে স্নানকালে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে এই গূঢ় রহস্য অবগত হইয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসিলেন—সে স্থান কোথায়? মুনি বলিলেন—উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে। সে স্থান অতি বিস্তৃত ও সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত; তন্মধ্যে

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রৈবতক নামে এক মনোহর নগর আছে। স্বর্ণরেখা নদী পাতাল হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন; শেষ নাগ এই নদীপথে আসিয়া দামোদর দর্শন করেন, রেবতীকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড নামে পবিত্র কুণ্ড আছে। নল, নহুষ, ভগীরথ প্রভৃতি রাজগণ এইস্থানে যজ্ঞকরতঃ স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন; যিনি এই পরম পবিত্র স্থানে পাঁচখানি প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াদেন, তিনি পাঁচ হাজার বৎসর স্বর্গবাস করেন। রৈবতকের চতুপার্শ্বে অন্তর্গ্রহ নামে দুই ক্রোশ দীর্ঘে ও দুই ক্রোশ প্রশস্ত বিস্তীর্ণ পবিত্র ক্ষেত্র আছে। (বর্ত্তমান জুনাগড়ের পূর্ব্বে যে স্বর্ণরেখা নদী আছে, তাহার তীর হইতে উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূখণ্ডই অন্তর্গ্রহ নামে খ্যাত)। এই ক্ষেত্র মধ্যেই দামোদর, ভবনাথ, দামোদরবিষ্ণু, স্বর্ণরেখানদী ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মেশ্বর, গঙ্গেশ্বর, কালমেঘ, ইন্দ্রেশ্বর, রৈবতক, কুবেরেশ্বর, ভীমকুণ্ড, গোমুখীকুণ্ড, এবং ভীমেশ্বর বিদ্যমান। রাজা গজ এই গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া রাসপূর্ণিমায় সস্ত্রীক বস্ত্রাপথে উপনীত হইলেন, এবং দামোদর ও ভবনাথের যথাবিহিত পূজার্চ্চনাকরতঃ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিলেন।

বস্ত্রাপথের পশ্চিমে অন্নভিক্ষা পর্ব্বত (বর্ত্তমান ওসান)। ঐ পর্ব্বতের মধ্যে এক গহ্বর আছে, উহার মধ্য দিয়া পাতালে যাওয়া যায়। উক্ত পর্ব্বতে বিস্তর লিঙ্গমূর্ত্তি, ষোড়শটী সাধুর পীঠস্থান ও একটী স্বর্ণখনি আছে। যাত্রীগণ এই অন্নভিক্ষাতীর্থে তীর্থকৃত্য সম্পাদনকরতঃ মঙ্গলপর্ব্বতের পশ্চিমদিগে প্রবাহিতা গঙ্গাস্রোতে স্নান করিয়া অনতিদূরস্থিত গঙ্গেশ্বর মহাদেবের পূজার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। তথাহইতে যাত্রীগণ সিদ্ধেশ্বর তীর্থে ও চরতীর্থে গমন করিয়া থাকেন। সিদ্ধেশ্বর তীর্থই ত্রিবেণী বলিয়া বিখ্যাত। সিদ্ধেশ্বরের পশ্চিমে লোকেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর তীর্থ। ইন্দ্রেশ্বরের পর মঙ্গলপর্ব্বতের পশ্চিমে যক্ষবনে যক্ষেশ্বরী দেবীর তীর্থ (বর্ত্তমান লাখাবনই পুরাণোক্ত যক্ষবন)। তৎপরে রৈবতক। প্রথমে রেবতীকুণ্ডে ও ভীমকুণ্ডে স্নানকরতঃ দামোদর দর্শনপূর্ব্বক ভবনাথে আসিতে হয়। তথায় মৃগী ও অন্যান্য কুণ্ডে স্নান বা স্পর্শ করিয়া উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে আরোহণকরতঃ অম্বামাতাকে পূজা দিতে হয়; তৎপরে হস্তিপদম্, রসকুপিকা, পারদকূপ, সপ্তকুণ্ড, গণমুখ, গঙ্গা এবং প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য যাদবগণের পীঠস্থানে পূজার্চ্চনা করিতে হয়।

সুবর্ণগিরি।

প্রাচীন কালে এই পর্ব্বতে এবং পার্ব্বত্য নদী সুবর্ণরেখার বালুকারাশিতে স্বর্ণ পাওয়া যাইত; তাই এই নদীর নাম স্বর্ণরেখা বা সুবর্ণরেখা। গঙ্গা যমুনার ন্যায় স্বর্ণরেখাও পাপনাশিনী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। স্বর্ণরেখা রৈবতকপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া নানা বন, উপত্যকা ধৌতকরতঃ জুনাগড় সহরের নিম্নদিয়া সাগরসঙ্গমে পতিত হইয়াছে। প্রাচীন জুনাগড়ের বা উপরকোটের দুর্গ প্রসাদাদি স্বর্ণরেখার তটে অবস্থিত।

অম্বামাতার শৃঙ্গের সর্ব্বনিম্নস্তরে প্রাচীরবেষ্টিত একটী প্রশস্ত সমতল স্থানের নাম

দেবীকোট। উহার প্রবেশ পথের বামপার্শ্বে নেমিনাথ মন্দিরাদি; দক্ষিণপার্শ্বে অন্যান্য মন্দির। নেমিনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনের দক্ষিণে যাতায়াতের পথ আছে; ঐ পথদিয়া অমিয়ঝারা পরেশনাথ মন্দিরে যাইতে হয়। দেবীকোট হইতে দুইশত ফুট উচ্চে গোমুখী কুণ্ড; ইহাহইতে আরও দুইশত ফুট উচ্চে অম্বামাতার মন্দির। অম্বামাতা হইতে ৭০ ফুট নীচে নামিয়া আবার ২১০ ফুট উচ্চে চড়িতে হয়; এই চড়াইয়ের আরম্ভস্থানে একটা কাটাবানে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যাত্রীগণ আপন আপন বস্ত্রের ছিন্নখণ্ড রাখিয়া যায়। চড়াইয়ের উপরে যোগী গোরক্ষনাথের পীঠস্থান। গোরক্ষনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ উপদেশক মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। গোরক্ষনাথ হইতে চারিশত ফুট নীচে কমণ্ডলুকুণ্ড; উক্ত কুণ্ডের কিছু উপরে গুরু দত্তাত্রেয়; এই স্থানে যাত্রীগণ যষ্ঠি ত্যাগ করিয়া যায়। দত্তাত্রেয় ও গোরক্ষনাথের মাঝমাঝি ওগাদশঙ্কর, দত্তাত্রেয়ই শেষ সীমা। ইহার পরে আর যাওয়া যায় না। দত্তাত্রেয়ের পূর্ব্বদিকে কালকা ও রায়েণমাতার শৃঙ্গ।

নেমিনাথের বিবরণ।

দত্তাত্রেয়ের পশ্চিমদিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর আছে, ঐ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মধ্যেই নেমিনাথ ও অন্যান্য জৈন মন্দির। প্রাচীরের উত্তর দিকে চুড়সমা রাজবংশের প্রসিদ্ধ নরপতি রাওখেঙ্গার ও রাণী বাণিক দেবীর প্রাসাদ ও মন্দিরাদি অবস্থিত। নেমিনাথ মন্দিরের উত্তরে অথচ নিম্নে বামদিকে তিনটী জৈন মন্দির; ইহার উত্তরে সোণি পরেশনাথ মন্দির। পরেশনাথ মন্দিরের কিছু উত্তরে অনহুলবাড়ার জৈন সম্রাট কুমারপালের মন্দির। এই মন্দিরে চতুর্থ তীর্থঙ্কর অভিনন্দনাথ ও দুই পার্শ্বে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ ও তৃতীয় তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথের মূর্ত্তি আছে। এই সকল মন্দিরের উত্তরদিকে প্রাচীর। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ভীমকুণ্ড, ভীমকুণ্ডের নীচে পর্ব্বতের শেষ সীমানা; ইহার পরই খাদ। ঐ সীমানার মধ্যে আর একটী কুণ্ড ও হাতীপাগলা নামক অষ্টকোণ বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড আছে। দেবীকোটের প্রাঙ্গন প্রাচীরের ও অপর পর্ব্বতের শেষ সীমানার মধ্যে অনেকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির ও প্রাসাদাদি আছে; তন্মধ্যে কচ্ছভোজের রাজা মানসিংহের মন্দির, তেজপাল, বস্তুপালের মন্দির, খেঙ্গার প্রাসাদ, মঙ্গবোলের ধর্ম্মশালার মন্দির, চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মন্দির ও ভৈরবঝাঁপ প্রভৃতি অবস্থিত।

নেমিনাথ জৈনদিগের দ্বাবিংশতি তীর্থঙ্কর। পুরাণে তাহার নাম অরিষ্টনেমি। একদা উষাকালে কুশাবর্ত্ত রাজ্যান্তঃর্গত সৌরপুরাধিপতি রাজা সমুদ্রবিজয়ের মহিষী শিবা স্বপ্নে দেখিলেন যে অপরাজিত ঋষি তাহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছেন। স্বপ্ন দর্শনের অব্যবহিত কাল মধ্যেই রাণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং যথাসময়ে তিনি একটী সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রটী কৃষ্ণবর্ণ ও শঙ্খ চক্র চিহ্নিত। সমুদ্রবিজয় পুত্রের নাম রাখিলেন অরিষ্টনেমি।

১৯০ ফুট দীর্ঘ ১৩০ ফুট প্রশস্ত সমতল ভূগণ্ডের উপর অরিষ্টনেমির মন্দির অবস্থিত। গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ ভিতরের মণ্ডপটী ৪৪ফিট

দীর্ঘ ও ৪১ফিট প্রশস্ত। মণ্ডপের ছাদ বাইশটী চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। গর্ভগৃহের চারিপার্শ্ব-প্রদক্ষিণপথে কতক-গুলি উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট শ্বেত প্রস্তরের ক্ষুদ্র তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি আছে। বাহিরের মণ্ডপ ৬৮ফুট দীর্ঘ ও ২১ফুট প্রশস্ত। এই মণ্ডপে দুইটী প্রস্তরখণ্ডের উপর কয়েকটী যুগল পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

নেমিনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহস্থিত প্রকাণ্ড মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সিংহাসনোপরি তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সুন্দর, কৃষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তির কেশকলাপ কুঞ্চিত, মুখখানি প্রশান্ত ও গম্ভীর, চক্ষু দুটী স্ফটিক নির্ম্মিত, যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মূর্ত্তির অঙ্গে হার, বালা, বাজু ইত্যাদি বহুমূল্যের অলঙ্কার, মস্তকে রৌপ্য-মুকুট শোভা পাইতেছে। মন্দির ধূপ ধুনা গুগ্গুলের গন্ধে সুবাসিত, পিতলের প্রকাণ্ড ঝাড়ে অহোরাত্র আলো জ্বলিতেছে, মন্দি-রের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৭০টী পীঠস্থান আছে। নেমিনাথ জৈনদিগের দিগম্বর সম্প্র-দায়ের উপাস্য। শ্বেতম্বর ও দিগম্বর জৈন-দিগের প্রধান সম্প্রদায়। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

———:0:———

যবে।

যবে, সারাদিনে শ্রান্ত, দেহলতা খানি
অলসে পড়িবে ঢ’লে,
তুমি, বিছায়ো তখন, স্নেহের আঁচল
মুক্ত সমীরতলে।
যবে, মধুর আবেশে, আঁখি দুটী মোর
মুদিয়া আসিবে পুনঃ,
তুমি, ভরা বুক নিয়ে, সতত আমার
শিয়রে জাগিও যেন!
যবে, স্বপনের সাথে বিশ্ব নীরবতা
গাথিব একটী সুরে,
তুমি, তাহারি মাঝারে ভাসিও তখন
অমিয় মুরতি ধরে।
যবে, চমকি পরাণ উঠিবে জাগিয়া,
জড়তা সরায়ে দূরে,
তুমি, প্রভাতের আলো আশীষের ধারা
ঢালিও নয়ন পরে।
যবে, করমের স্রোত আসিয়ে গরজি
ডুবাতে চাহিবে মোরে,
তুমি, স্তবধ করিতে বিষমতা তার
চাহিও বারেক ফিরে।
যবে, চারিধার হ’তে ব্যর্থ কোলাহল
ফিরিয়া যাইবে লাজে।
তুমি দুহাত পশারি টেনে নিয়ো মোরে,
তোমার স্নেহেরি মাঝে।
ওগো, আবার তেমনি বিছায়ো আঁচল
আবার নিয়ো গো কোলে,
যবে, সারাদিনে শ্রান্ত দেহলতা খানি
অলসে পড়িবে ঢ’লে।

———0———

প্রেমে-সমাধি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এমন জন্ম বৃথায় গেল;-কত তপস্যার ফলে যে জন্ম লাভ করিয়াছি, কত কাঁদিয়া মাথা খুঁড়িয়া যে জন্ম আর পাওয়া যাইবে না, সেই জন্ম—সেই অমূল্য মানব জন্ম, আমি না জানি কত পুণ্যবলে,—না জানি করুণাময়ের কত করুণার বলে আবার পাইয়াছি। তাহাও হেলায় কাটাইতে বসিয়াছি। কত কাঁদিয়া বলিয়াছিলাম, ভগবান্ এবার আর যন্ত্রনা দিও না। এবার তোমার নাম করিব—সব ভুলিয়া—সংসার ভুলিয়া—ধন জন ভুলিয়া—দেহ গেহ ভুলিয়া এবার তোমার নাম করিব; আর কাহারও পানে চাহিব না, কাহারও কথা শুনিব না, কাহারও কাজ করিব না; আমি তোমারি, তোমা ছাড়া আর জানিব না। কোথায় গেল সে সকল কথা, সে আমি কি এই আমি? সে আমি নাই, সে আমি থাকিলে এমন হইত না। এ আমি, সে আমির প্রেতাত্মা। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আমি মরিয়াছে।

দিন যায়;—এক দুই করিয়া বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। আজ প্রায় বিংশতি বৎসর গত হইল,—কৈ কি করিলাম। কি করিতে আসিয়াছিলাম,—কি করিয়া গেলাম! বাজারে কিনিতে আসিয়া ছিলাম—কি যেন হারাইয়া গেলাম। আমার কর্ম্মের ফলে,—আমার ভাগ্যলিপির ফলে কোন্ সময়ে যে আমায় কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে জানি না। হায়, কিছুই হইল না। কেন ভবে আসিয়াছিলাম? আসিয়াই বা কি হইল? না আসাই তো ভাল ছিল। তাইবা বলি কি করিয়া? জানি না ভাগ্যে কি আছে; জানি না এহেন দুর্ভাগা দ্বারা জগতে কোন কাজ হইবে।

এখনো সময় আছে, ডাক মন তাঁহাকে,-প্রাণ ভরিয়া ডাক; হৃদয় খুলিয়া সরল হইয়া তাঁহাকে ডাক। শুনেছি তিনি পাপীর বন্ধু আমিও তো মহাপাপী, আমার কি তিনি দয়া করিবেন না?

এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবক, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, আপন মনে বসিয়া বসিয়া সে এই সকল কথা মনে করিতেছিল। যুবক যেন রূপের খনি। পার্থিব জগতে সে রূপ দেখা যায় না, সে স্বর্গীয় জ্যোতি মরজগতের মানুষের মুখে যেন প্রতিভাত হয় না; মুক্তার ছায়ার ন্যায় সে লাবণ্য জড়জগতের অস্থায়ী অঙ্গে যেন স্থান পায় না। পবিত্র হৃদয়ের সে মাধুর্য্য পাপ-পঙ্কিল কলুষহৃদয়ে থাকিতে পারে না। সে স্বর্গীয় জ্যোতি, লাবণ্য, মাধুর্য্য ও অঙ্গের আভা একত্র সংযুক্ত হইয়া যে রূপের সৃষ্টি করিয়াছে সে রূপ যেন সে যুবকের অঙ্গেই শোভা পায়; অন্য কোথাও তাহার সমাবেশ হইলে তাহা যেন এরূপ সুন্দর হইত না,—এরূপ ভুবনমোহন সৃষ্টি করিত না।

রাত্রি অনেক হইয়াছে এক খানি দ্বিতল গৃহ, তাহার একটী প্রকোষ্ঠে যুবক বসিয়া

রহিয়াছে। গৃহে একটী ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি আসিয়া বিরাজ করিতেছেন। বাহ্যজগৎ নিস্তব্ধ হইলে কি হইবে, যাহার অন্তরে আগুণ জ্বলিতেছে, চিন্তায় চিন্তায় যাহার শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহার সে শান্তিতেই বা কি হইবে? নিজের হৃদয় শান্ত থাকিলে বাহিরের সমস্ত কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ে চিতার আগুণ জ্বলিলে বাহিরের শত শান্তি শীতলতাও মনের সে আগুণ নিভাইতে সক্ষম হয় না। যুবকের হৃদয়ের অস্থিরতায়, অশান্তিতে, সমস্ত জগৎও তাহার চক্ষে বড়ই অশান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধহইতে লাগিল। অস্থির চিত্তে সে বাহিরে আসিল তখন চাঁদ উঠিয়াছে; জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে। মলয় মৃদুমন্দ বহিয়া পৃথিবীর উত্তপ্ত বক্ষ শীতল করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বাহিরে আসিয়া যুবক যেন কতটকা শক্তি লাভ করিল। প্রকৃতির এই প্রাণস্পর্শী শোভা সন্দর্শন করিয়া,—করুণাময় জগদীশ্বরের পদ্মহস্তের সঞ্চালন অনুভব করিয়া দগ্ধপ্রাণ যেন কতটকা শীতল হইল। কিন্তু এ শীতলতাও কতক্ষণ!

সেই অনন্ত বিমানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া,—মেঘের বক্ষে চন্দ্রকিরণের সেই মনোমুগ্ধকর হাস্য দেখিয়া, প্রাণে যেন আবার কাহার অভাব অনুভূত হইল,—কাহার প্রেমময়মূর্ত্তি যেন আবার মনে পড়িয়া গেল। যুবক কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া অতি করুণস্বরে, সে স্বর শুনিলে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়, মানুষ তো কোন্ ছার্, সেই স্বরে বলিতে লাগিল;—

কই ভগবন্, দীনবন্ধো দয়ারসাগর কই তুমি, আমি তো তোমায় দেখিতে পাইতেছিনা; আর কি এজন্মে দেখা হইবে না? কি করিয়া পাইব? পাপে পরিপূর্ণ হৃদয়ের ছায়া নয়নে প্রতিফলিত হইয়া নয়ন আঁধার করিয়া দিয়াছে, চক্ষু থাকিয়াও নাই। জানি তুমি দেহ মাঝে গোপনে রহিয়াছ, এদেহ তোমারই মন্দির;—জানি আমি, তুমি জগতের প্রত্যেক প্রাণীতে প্রাণীতে, প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, প্রত্যেক অস্থিতে সন্ধিতে সকল স্থানেই বিরাজিত, জানিয়াও তোমায় দেখিতে পাইতেছি না; তোমার গুণময় সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। দারুণ মোহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে, কেমন করিয়া পারিব? মায়ার সংসারে ফেলিয়া দিয়াছ, সাধ্য কি আমার আমি সে বন্ধন ছিন্নকরি; তুমি যদি দয়া করিয়া সাহায্য কর, এ দুর্ব্বলকে শক্তি প্রদান কর তবেই পারি, তবেই আমি এ সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে ছুটিয়া যাইতে পারি, তাহা না হইলে আমার সকলই বৃথা হইল। এমন রত্ন হেলায় হারাইলাম, এমন জন্ম হেলায় কাটাইয়া দিলাম। তাহা হইবে না প্রভু, তুমি তাহা পারিবে না, তোমার দয়া করিতে হইবেই। আর তো পারি না, প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে, অসহ্য যন্ত্রনা। বুক ফাটিয়া গেল, গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিল। সহ্য হয় না প্রভু, এ করাতে কাটা, অসহ্য এ তুষের আগুণ!

পারিলাম না, কোন প্রকারেই এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলাম না; দয়াকর প্রভো,

দয়াকর; এ অভাগারে দয়াকর। তোমার পুণ্যপদ তরণীতে এ অভাগারে উদ্ধার কর। কৈ, করিলেনা? তবে আমি কোথায় যাইব, তবে আমি কাহার কাছে যাইব? বড় আশা করিয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি নিরাশ করিও না প্রভো। তুমি নিরাশ করিলে এ এ অভাগা কাহার কাছে যাইবে? শুনেছি তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, কৈ আমায় তো আশ্রয় দিলে না? তা দিবেই বা কেন? আমি ঘৃণিত মহাপাপী। এখনও কাম আসিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিতে চায়, ক্রোধ সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হয়। এখনও আমি ষড়রিপুর অধীন। হৃদয় কলুষিত; এ কালিমাভরা হৃদয়ে তুমি আসিবে কি করিয়া? হৃদয় পবিত্র না হইলে কোথায় তোমার আসন দিব? তুমি তো সকলই বুঝিতেছ প্রভো, হৃদয় পবিত্র করিয়া দেও। শুনিয়াছি রাজা যখন দরিদ্র ভৃত্যের ভবনে পদার্পণ করেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি ভৃত্যের বাড়ী হইতে নিজ বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান পরিষ্কার করিয়া থাকেন, রাস্তা ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকেন, দালান কোঠা উঠিতে থাকে, অন্যান্য ভৃত্যেরা রাজার খাদ্যসামগ্রী ভৃত্যের ভবনে লইয়া যায়। সমস্ত প্রস্তুত হইলে ভৃত্য বুঝিতে পারে এইবার রাজা আসিবেন, এইবার তাহার প্রভু, তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন। রাজার সম্মান রক্ষার্থে, ভৃত্যের অবস্থা বুঝিয়া রাজা নিজেই তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিয়া থাকেন। আমিও তো প্রভো, দরিদ্র, নাই বলিতে কিছুই নাই। কামক্রোধের আগাছায় তোমার পথ অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। তুমি তো সকলই বুঝিতেছ; আমার মনের অবস্থা, হৃদয়ের কথা সকলই জানিতেছ, তবে আর বিলম্ব কর কেন ঠাকুর? তোমার রাস্তা তুমি পরিষ্কার করিয়া লও, অনুপযুক্ত হৃদয় উপযুক্ত করিয়া লও। এখনও কি সময় হয় নাই আমি তো আর পারি না, তোমা ছাড়া আর থাকিতে পারি না। কি করিব নাথ? এস তুমি, এসে দেখ ঠাকুর,—

"নয়নের বারি পূর্ণ করি ঝারি
দেখ সারি সারি রাখা গিয়েছে;
সেই বারি দিয়ে চরণ পাখালিয়ে
এস, বস, আমার হিয়ে পাতা রয়েছে।'

আলো করে বস ঠাকুর; শীতল হই আমি, তোমার শ্রীচরণ-পরশে সার্থক হউক আমার জন্ম, সার্থক হউক আমার সাধনা।

মুখ নীরব হইল, আর বলিতে সক্ষম হইল না; যুবক কাঁদিয়া আকুল হইল।

কাঁদিলে শান্তি পাওয়া যায়, বিশেষতঃ তাঁহার জন্য কাঁদিলে প্রাণে কি যেন এক বিমল আনন্দ ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যুবকের প্রাণেও তাহাই হইল, অমৃত-শীতলতায় হৃদয় ভরিয়া গেল, শরীর অবশ হইয়া আসিল। সে উঠিয়া ঘরে যাইতেই শান্তিময়ী নিদ্রা তাহার চির শান্তিময় ক্রোড়ে তাহাকে টানিয়া লইল। যুবক ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন দূরে গাইয়া চলিয়াছে;—

ওঠ, জাগ, আর ঘুমাইও না, ঘুমাইও না।
শিয়রে দাড়ায়ে সে যে তারে ফিরাও
না ফিরাইও না!
আকুল নয়নে সে তো, আশাপথ চেয়ে আছে

তুমি চরণে দলিয়া তারে আখি নীরে ভাসাইও না।
ওঠ, জাগ, আর ঘুমাইও না, ঘুমাইও না।
বালক জাগিল,—শুনিতে পাইল, "তুই, গুরু করিয়াছিস্,—গুরু যে চসমা রে বেটা, নইলে দেখ্‌বি কি করে? সে মনে ভাবিল, সত্যই তো!

(ক্রমশঃ।)

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—০—

সাধক-সঙ্গীত।

[৬]

ছি! ছি! হাসা'লে ভুবন।
বারণ নাহি শোনে দেবনারী হ'য়ে করে কেবা রণ গ্রাসে কে বারণ॥
হ'য়ে শিবে, শিবের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী,
কি উৎসবে আজ শবে ত্রিভঙ্গিনী,
সাজে কি মা তোর শিব সোহাগিনী,
যোগিনীর বেশ নাগিনীর ভূষণ॥
পতি সত্বে সতীর সিঁথির শোভা যেটা,
কই সে সিন্দুর এযে শোণিতবিন্দু ছটা,
শঙ্কর বিদ্যমানে ভাঙ্গলে শঙ্খ কেটা,
রাখলে জটা কি কারণ॥
সিন্দুর মুছে নাম ঘুচালি সধবা,
মৃত্যুঞ্জয়ের জায়া হ'লি তুই বিধবা,
ত্রিলোকের লোকে বলবে তোরে কিবা,
কি বাসনায় বাস না কর ধারণ॥

—:০:—

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

মন্তব্য।

"দ্বিজ রামপ্রসাদ" প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল। আমরা দেশবাসী বুধমণ্ডলীকে এই প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেকে অনেকপ্রকার আন্দোলন—আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিতে হইবে। লেখক সত্য-সংগ্রহের জন্য জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছেন। কোন স্বার্থ না থাকিলেও তিনি একজন সাধকের গৌরবময় জীবন প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রকৃত সত্যের উদ্ধার করিয়া দেশের উপকার সাধন করিয়াছেন। যদিও প্রবন্ধ মধ্যে অনেক অতি প্রাকৃত ও অভ্যুক্তির বহির্ভূত ঘটনা আছে, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গবাসী কেহ চিনীশপুর কালীবাড়ী ও দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লেখক তাঁহারই জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিয়াছেন, প্রথমতঃ এ কথা স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি হইতেই পারে না। এক্ষণে চিন্তার বিষয় এই যে, ইনিই প্রসাদী সঙ্গীত-প্রণেতা রামপ্রসাদ কিনা? তবে সত্যের খাতিরে আমরা ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, লেখক দ্বিজ রামপ্রসাদের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রসাদীসঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলির ভাবার্থে বেশ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু সেন রামপ্রসাদের জীবনীর সহিত বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত সমালোচনায় যে সকল যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অখণ্ডনীয়। বাস্তবিক সেন রামপ্রসাদ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কবি, রাজবৃত্তিভোগী, সভাপণ্ডিত, মানী ও গৃহী, আর দ্বিজ রামপ্রসাদ দীন, দরিদ্র, কৌপীনমাত্রৈকসম্বল, সমাজবহির্ভূত ও সন্ন্যাসী সুতরাং অধিকাংশ সঙ্গীতগুলি দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের সহিত সুন্দররূপে মিলিয়া যায়। তাই সেন রামপ্রসাদের জীবনীতে কষ্টকল্পনা, উৎকট ও অস্বাভাবিক অর্থ এবং রূপক-ব্যাখ্যা করিয়া সঙ্গীতগুলিকে তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে। গানগুলি পূর্ব্বে লোকমুখে ও গায়কদের খাতাপত্রেই ছিল; কাজেই রামপ্রসাদ নামযুক্ত গানমাত্রেই একই রামপ্রসাদের বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়াছিল। তদুপরে ছাপাখানার আমদানী হাওয়ায় রামপ্রসাদী গানগুলি ও প্রণেতার জীবনী প্রকাশের সময় উপস্থিত হইল। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীকে সমাজের লোক বিশেষ চিনিতেন না, দ্বিজ রামপ্রসাদ প্রকৃত সাধক—তিনি জগতের নির্জ্জন প্রদেশে—বনমধ্যে প্রকৃতির ক্রোড়ে সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন; কাজেই জগতের সাধারণ লোক তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন না; কিন্তু সেন রামপ্রসাদ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, নবদ্বীপাধিপতির সভাপণ্ডিত এবং সুকবি; তাই সমাজে তাঁহার নাম সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে প্রসাদী-

সঙ্গীত-প্রকাশকগণ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের অনেক গানগুলি ছাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু গানের ভাবে ও কবিরঞ্জনের জীবনে অনৈক্য তাঁহারাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই অনেক গানের স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রূপক ব্যাখ্যা করিয়া সেন মহাশয়ের জীবনীর সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু সত্য কখনও অপ্রকাশিত থাকে না; তাই তাঁহারা আবার আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। * তন্মধ্যে কেহ কেহ অনেক অনুসন্ধানে দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্বে আস্থাবান্ হইয়াছেন, কিন্তু কোনরূপ সুনিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখককে শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়।

আমরা সেন রামপ্রসাদকে কোন দিনই উচ্চ শ্রেণীর সাধক বলিয়া মনে করিতে পারি না। প্রকৃত সাধকের মধ্যে আদৌ ব্যবসাদারী থাকিতে পারে না। কবিরঞ্জনের "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" ব্যবসাদারী নহে কি? মাতৃভাব-পুষ্ট সাধকের গোপীভাবের স্ফুরণ অস্বাভাবিক। বিদ্যাসুন্দরে এ বিশ্বাস অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বোধহয় সকলেই জানেন, বর্দ্ধমানাধিপতি ও নবদ্বীপাধিপতির মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় বিদ্যাসুন্দরের সৃষ্টি,—নতুবা মূল ঘটনা সত্য নহে। নবদ্বীপাধিপতির আদেশে তাঁহার সভাপণ্ডিতগণ বর্দ্ধমানাধিপতির অন্তঃপুরের কুৎসাপূর্ণ "বিদ্যাসুন্দর" প্রণয়ন করেন। ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন প্রণীত দুইখানি বিদ্যাসুন্দর সৃষ্ট হয়। যে সাধক ব্রহ্মময়ীর উদ্দেশে গাহিয়াছেন, "যেমন বৎস পাছে গাভী ছোটে তেমনি পাছে পাছে ধাবা" এবং যমদূতের উদ্দেশে বলিয়াছেন, "শুধা গে তোর যম রাজারে আমার মত নিয়েছে কটা" সেই মাতৃগতপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী-সাধক পার্থিব রাজার অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় পরের অযথা কুৎসাপূর্ণ পুস্তক লিখিবেন একথা ধর্ম্মজগতের বহির্ভূত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ শ্লোকগুলির বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কি মাতৃ-সাধকের পক্ষে রুচিসঙ্গত? প্রসাদী-সঙ্গীত-প্রণেতা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট যে শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভ করিয়াছেন, কবিরঞ্জন সেন রামপ্রসাদ কখন সে পবিত্র সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন না। কাজেই সাধনাজগতের কলকণ্ঠ পিকরাজ দ্বিজ রামপ্রসাদের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়—প্রসাদী-সঙ্গীত, এ কথা বিশ্বাস করিতে হইবে।

আর ও একটী কথা,—যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তাঁহার রচিত কবিতা ও কীর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ ভীষকপ্রসাদ, দাসপ্রসাদ বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন, গানগুলিতে তাঁহার কি আবার "দ্বিজ" শব্দ প্রয়োগ বুধজনসম্মত? বিশেষতঃ সে কালের একজন সাধকশ্রেণীর পণ্ডিতের একই সময়ে "দাস" ও "দ্বিজ" শব্দ ব্যবহার ধৃষ্টতার পরিচয় নহে কি? সুতরাং বৈদ্য বলিয়া যাঁহারা কবিরঞ্জনকে দ্বিজ রামপ্রসাদ স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টি সুদূরগামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

---

* শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সম্পাদিত সাধক-সঙ্গীতের ভূমিকা ও রামপ্রসাদের জীবনী দ্রষ্টব্য।

আমার জন্মভূমি পশ্চিম বঙ্গ; একাধিকবার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সাধনাক্ষেত্র দর্শনের আমার সুযোগ হইয়াছিল। আবার গত ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে আমরা আটজন সেবক পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামীনিগমানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চীনীশপুর গিয়াছিলাম উভয় স্থানেই আমরা রামপ্রসাদের তথ্যসংগ্রহে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ বা হালিসহরের লোক পুস্তকে প্রকাশিত ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছুই জ্ঞাত নহে; কিন্তু চীনীশপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী অবগত আছে। পাঁচজন একত্র হইলেই দ্বিজ রামপ্রসাদের কথা উঠিয়া থাকে। আমরা ৺কালীবাড়ীর সত্ত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেবোত্তর সম্পত্তির কাগজ পত্র দেখিয়াছি। দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনই সংশয় নাই; এক্ষণে ঘটনাচক্রে তাঁহাকেই বাঙ্গালার বিখ্যাত প্রসাদী-সঙ্গীত-প্রণেতা বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আশা-করি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আপনারাও এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন; কারণ ও যুক্তি দেখাইয়া আমরা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইলাম; সেন রামপ্রসাদ বা দ্বিজ রামপ্রসাদ আমাদিগের শত্রু বা মিত্র নহেন, কেবল সত্য প্রকাশিত হউক—উপযুক্ত ব্যক্তির গুণ প্রচারিত হউক—দেশেরলোক সংশয়শূন্য হউন এইটাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। নতুবা সমাজে কোনরূপ দলাদলির সৃষ্টি হউক এ বাসনা আমাদের আদৌ নাই। সেন রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদ যে পরস্পর ভিন্ন ব্যক্তি তাহা অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং উভয় রামপ্রসাদের যথাযোগ্য জীবনবৃত্তান্ত ও বিবৃত হইল, প্রবন্ধে উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে; এক্ষণে দেশের লোক বিচার করুন যে, প্রসাদী-সঙ্গীতগুলি কোন্ রামপ্রসাদের রচিত। আমরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে রামপ্রসাদের যে কয়টী অপ্রকাশিত গান সংগ্রহ করিয়াছি, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

সম্পাদক—"আর্য্য-দর্পণ"।

(১)

জাগ মা আমার দেহ মধ্যে।
আমি জ্ঞান সন্ধন ভক্তিজবা দিব মা তোর
শ্রীপাদপদ্মে॥
অপূর্ব্ব ছয়পদ্ম আছে মা মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যে।
ডাকিন্যাদি শক্তি তোমার রয়েছে তার প্রতি পদ্মে॥
সুষুম্নার সূক্ষ্ম পথে মা শক্তি সঙ্গে গো যোগাদ্যে,
চল সহস্রদল পদ্মোপরে মা আমি তাই ভাবি গো
ভবারাধ্যে॥
পরমহংসরূপে পিতা আছেন তথা শোন্ বিশুদ্ধে।
পরমহংসিনীরূপিনী মা তুই (একবার) যুগল
মিলনে দেখা দে।
প্রসাদ বড় ভাবছে গো মা কি হবে শমনের
যুদ্ধে।
অভয় দে অভয়ে শমন ভয়ে আর ছলনা করিসনে
আদ্যে॥

(২)

সদা কালী বলনা, জিব রবে না,
কালী ভাবনা; ভয় কি?
কালীনাম মাহাত্ম্য, যে জানে সত্য,
তাঁর বিপত্তি রয় কি?

দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে, সমুদ্র মন্থনে,
দেব পঞ্চাননে, হলাহল পানে, হলো কি ?
সে যে কালী বলেছিল তাই তো বাঁচিল
নতুবা শিব বাচে কি ?

(৩)

আছে বলদ বয়না হালে।
আমার আবাদ জমি পতিত রইলে॥
একহালের হালুয়া যারা তাদের পঞ্চ রতণ ফলে
আমার তিনখানি হাল, পোড়াকপাল, অন্ন
পাইনা কোন কালে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, সঙ্গে ছিল মনা বেটা
সে পড়িল বিষম ভুলে।
সে যে বীজ খেয়েছে, সব লুটেছে, ঘুম দিয়াছে
ক্ষেত্তের আইলে॥

(৪)

আমার দুঃখের কথা কই।
দুঃখে কিম্বা সুখে আছি জান তো গো ব্রহ্মময়ী।
সারাদিন মা মরি খেটে, ভুতে সকল নেয় গো লুটে
দারুণ পেটের জ্বালা সইতে নারি পরের
বোঝা মাথায় লই।
জন্ম জরা মৃত্যু মড়া আর কত সহে গো তারা
প্রসাদ বলে দুঃখের ভরা আমার প্রাণে কেমন
করে সই।

(৫)

আমার ঘরে নবদ্বারে শমন রইল থানা করে।
ঘরে গুরু নাভিস্থল, তাতে মনার বলাবল,
সে ঘরে মন বিরাজ করে।
প্রহরী ফিরে দশ পাঁচ ছয়, মনে বড় সন্দে-হয়,
কপাট নাই মা সে সব দ্বারে।
ঘরচোরা যদি চুরি করে, মাটি দেয় কিম্বা
পুড়ে তারে;
প্রসাদ বলে মাণিক গেলে ঘরের আদর কেউ
না করে।

(৬)

সদা আনন্দময়ী মনে থাকলে পরে
নিরানন্দ হবে কেন ?
যে জন যে বস্তু খায়, উদ্গারে লক্ষণ প্রকাশ পায়
সাসীর মুখেতে যেন, দৃষ্টমান বস্তুজ্ঞান॥
যে জনার যে মতি হয়, চোক্ মুখ তার সাক্ষী হয়
ভানুর উদয় হলে যেন, অন্ধকার নয় কখন।
দ্বিজ রামপ্রসাদের বাণী, পাগল রাজার ক্ষেপারাণী
ও সরকারে চাকরী হলে, পাগল বই আর বলবে
কেন ?

(৭)

কে তোরে দোষে মা গো কে তোরে দোষে।
সকলি ঘটে আমার করম দোষে॥
না জানি তত্ত্ব পরম কথা, আপনি খেয়েছি
আপন মাথা;
চরণ ভজিতে চাই, মনেতে না পাই, আমাকে
দেখিয়ে সাগর শোষে।
আপনা বলিয়ে যারে গো ভাবি, সে চোরে
দেখিয়ে ফিরায় গো আঁখি,
দুঃখ বলিব কাহাকে, জগতে আছে কে ?
অঙ্গ জর জর কাল-বিষে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, শ্যামা মার চরণ কমল
দোলে
যে জপে তাঁর নাম, পূরে তার মনস্কাম,
এইনাম শম্ভুনাথ সদাই ঘোষে।

(৮)

আনন্দময়ী হয়ে গো মা তারা—নিরানন্দে রেখো না।
ঐ দুটী চরণ বিনে আমার মন, যেন অন্ত কিছু জানে না॥
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।
তাতে অকুল পাথারে ডুবালি আমারে, স্বপনে জো ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, ভবে দুর্গা নাম আর কেউ লবে না।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শুন মা ভবানী, পূর্ণকর মনের বাসনা।
আমি এই ভিক্ষা চাই, অন্তে যেন পাই, না হয় যেন জঠর যন্ত্রনা॥

(৯)

ভুলি ভুলি হে গুরুব্রহ্ম আর কি তোমায় কথায় ভুলি।
ত্রিপাদ ভুমি চেয়ে ছিলে, তিন পাদ তিন রাজ্য নিলে।
ঐ বস্ত্রদানপী প্রদাপীর সাক্ষী আছেন রাজা বলী।
শ্রীমতিরে ভাসাইয়ে, মথুরাতে রাজা হলি, যার কারণে বৃন্দাবনে হয়েছিলি কৃষ্ণকালী।
রাবণকে বধিবার ছলে, সীতা লয়ে বনে গেলে, সেই সীতা উদ্ধারিয়ে পুনর্ব্বনবাসে দিলি
শ্রীরামপ্রসাদে বলি, সাধে কি দেই গালাগালি
এখন পতিতেরে না তারিলে কেন গুরুব্রহ্ম হলি।

(১০)

বাজ্‌বে লো মহেশের বুকে, তুই নেমে দাড়া ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব আছে বেঁচে ধ্যানে আছেন মহাযোগী॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচ্‌তে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজড়।
বিষখেকোর হাড় নয় গো সজোর, তুই সরে যা লো শিবসোহাগী।
বিষখোর যাঁর হয়নি মরণ, সে মরবে আজ কিসের কারণ।
রামপ্রসাদ বলে কপট মরণ ঐ চরণ তোর পাবার লাগি।

—:0:—

আবাহন।

কিবা, শারদ হিল্লোলে সেফালি ফুটিল,
পাপিয়া ধরিল তান্।
কিবা, সুমন্দ সমীর হৃদয় স্পর্শিল,
মাতিয়া উঠিল প্রাণ॥
কিবা, কুসুকুসুমে ভ্রমর মাতিল
চুমিল আসিয়া তায়।
উষার কিরণ পড়িল ঢলিয়া
সিক্ত ধরণী গায়॥
আনন্দে উঠিল জগৎ মাতিয়া
সৌম্য শারদ প্রভাতে।
জগজ্জননী মায়েরে স্মরিয়া
উঠিল জয় ভাষতে॥

কাঙ্গিল, ভকত অবদানী
করিতে মায়ের আবাহন।
নূতন বসনে নূতন ভূষণে
সাজিল যতেক পুরগণ।
যতনে পুরিয়া ফুলের ডালা,
আবাল বৃদ্ধ ছুটিল;
খুলি মনপ্রাণ মায়েরে পূজিতে
যতনে নৈবেদ্য সাজাল।
জগৎ ভরিয়া মায়ের বিকাশ
বুঝিয়া ভারত কোনকালে,
শিখায় আজিও জগতজনে
পূজিতে তাঁহারে ফুলদলে।
মায়ের ছেলের আনন্দ অপার
তাই আনন্দে কাটায় দিন।
বুঝিলে ভারতে কেন বা সৃষ্টি
এমন সাধের এমন দিন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বল।

—:0:—

উপদেশ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭১। যে সময়ে মানুষ পশুত্বে কিম্বা দেবত্বে উন্নীত হয়, সেই সর্ব্বদেশে সন্ধিকাল হচ্চে যৌবন; এই সময় সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত আসক্তিকন্টকপূর্ণ বিঘ্ন-বাধা বীরের ন্যায় পদদলিত করিয়া গুরু-পদিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে সারাজীবন বজ্রাহত তরুর ন্যায় যাপন করিতে হইবে।

৭২। যদি আদর্শ মনুষ্যজীবন লাভ করিতে চাও, তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়া দাসের ন্যায় আজ্ঞাবহ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হও।

৭৩। আমোদচ্ছলেও কাম ক্রোধ কিম্বা মিথ্যার আশ্রয় লইও না; কেন না যদি যাহা কৌতুকচ্ছলে করিবে, তিন দিনের দিন তাহা তোমার অভ্যাসে—সংস্কারে পরিণত হইবে।

৭৪। সংস্কার মুছিয়া ফেলা বড় কঠিন; এ যেন চিনাজোঁক, এক মুখ ছাড়াইতে গেলে অন্যমুখে জড়াইয়া ধরে।

৭৫। কোন কার্য্যে শিষ্যের উন্নতি বা অমনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইলে গুরুরই কলঙ্ক বিঘোষিত হয়; কেননা শিষ্য গুরুর প্রতিবিম্ব মাত্র; লোকে শিষ্যের কার্য্যকলাপ দেখিয়া গুরুর বিচার করিয়া থাকে।

৭৬। কাহারও কার্য্যের সমালোচনা করিও না, করিলে ভগবানেরই দোষগুণের বিচার করা হইল।

৭৭। সংসর্গগুণে জীবনের উন্নতি কি অব-নতি হয়; তুমি যতই সাবধান হও না কেন আলকাতরা মাখান ঘরে প্রবেশ করিলে শরীরের কোন স্থানে একটু না একটু দাগ লাগিবেই লাগিবে; তাই অনেক সাধু সন্ন্যাসী আমমোক্ষা-মুমুক্ষু সংসারীলোকের সঙ্গে মিশিতে চান না।

৭৮। স্বার্থপরের ন্যায় কেবল আপন সুবিধা অনুসন্ধান করিও না; অন্যের কার্য্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও।

৭৯। ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইবার কাহার সাধ্য নাই।

৮০। মনে কোনরূপ উদ্বেগ হইলে প্রার্থনা করিও—মনে মনে ভগবানকে জানাইও, সব গোল মিটিয়া যাইবে।

৮১। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপর সব ভারদিয়া নিশ্চিন্তে সংসারে দিন যাপন কর, কোন বিপদই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৮২। শোকদুঃখ, লাভালাভ, সব ভগবানে অর্পণ করিয়া আত্মকর্তৃত্ব ত্যাগকরতঃ ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হও দেখিবে তোমার পুরোভাগ ক্রমশঃ সত্যের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

৮৩। অমূল্য মানবজীবন পাইয়া বাসনা কামনায় দাস হইয়া প্রধান দাবী নষ্ট করিও না,—পরমপদ হইতে ভ্রষ্ট হইও না।

৮৪। মায়িক আনন্দে মত্ত হইয়া নরকের অন্ধকারজনক রথে আরোহণ করিও না।

৮৫। স্বীয় দুর্ব্বলতার জন্য অকপট চিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও; তাঁহার কৃপায় সংসারমোহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে—জ্ঞানের দিব্যালোকে প্রাণ শান্ত হইবে।

৮৬। সংসারের কাজ ইষ্টদেবের কাজ বলিয়া করিও; তাহা হইলে বন্ধন না হইয়া মুক্তির কারণ হইবে।

৮৭। সাধনার প্রথমাবস্থায় অনেক সময় অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতে নিরাশ হইলে চলিবে কেন? উৎসাহ, ধৈর্য্য, ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসই সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন; তাহা পরিত্যাগ করিলে অগ্রসর হইবে কিরূপে?

৮৮। যিনি বিপদ দেন—মঙ্গলও তিনিই দেন; সুতরাং তাহাতে অবিশ্বাস না করিয়া অবস্থানুরূপ জীবন যাপন করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

৮৯। চিত্তশুদ্ধি না হইলে উপলব্ধি হয় না।

৯০। উপলব্ধির বিষয় ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না; তবে তাহার আভাস দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অবিশ্বাসী হৃদয় তাহা বিশ্বাস করিবে না।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

মায়ের অতিথিসেবা।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত "[illegible]বাড়ী" একটী অতি প্রাচীন গ্রাম; ইহা একসময়ে সমৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তত্রত্য স্থানের মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রাম ছিল। গ্রামে বহু জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত অন্যান্য জাতিরও বসবাস ছিল। গোয়ালন্দ ষ্টেশনের বিপরীত দিকে পদ্মানদীর পর পারে আরিচা (শিবালয়) ষ্টেশন অবস্থিত।

শিবালয় ষ্টেশন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটী রাস্তা দ্বারা ঢাকার সহিত যুক্ত হইয়াছে, ঐ ষ্টেশন হইতে ঢাকাভিমুখে চারি মাইল অগ্রসর হইলেই রাস্তার উত্তর পার্শ্বে এই গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমেই দর্শকের নয়নপথে, নয়নমনোমুগ্ধকর নানাপ্রকার বৃক্ষরাজিপরিশোভিত শিববাড়ীর অত্যুচ্চ মঠ পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া অতীত-সমৃদ্ধির কথা জানাইয়া দেয়। উহার নিকটেই সাহিত্যানুরাগী, সংকর্ম্মনিষ্ঠ, স্বদেশ প্রেমিক ৺ কবি দীনেশচন্দ্র বসুর ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ বিরাজিত। যাহাহউক শিববাড়ীর অনতিদূরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মা আনন্দময়ীর মন্দির; ঐ মন্দির "টেপরা কালীবাড়ী" নামে বিখ্যাত। কালীবাড়ীর উপরেই শ্মশান, তথায় একটী পুষ্করিণীও আছে। বহুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত গ্রামের জমিদার ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হয়। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে এই স্থানে মায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনকরতঃ পূজা করিবার জন্য শ্রীশ্রীঅর্দ্ধকালী বংশোদ্ভব ৺রূপনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রতি মায়ের স্বপ্ন দেশ হয়।

এখানে মায়ের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে; তন্মধ্যে শনি ও মঙ্গলবারে বিশেষ ধুমধামের সহিত পূজা হইয়া থাকে; ঐ দুই দিন মায়ের পূজা দিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অত্যধিক লোকের জনতা হইয়া থাকে। কালীবাড়ীর উপরদিয়া একটী প্রশস্ত রাস্তা গ্রামাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

সে অনেক দিনের কথা, একদা বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন গাঢ় তমসাবৃত রজনী, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই; কেবল অবিরতভাবে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল; আর সেই নৈশ গগনে শ্রবণভেদী মুহুর্মুহু বজ্রের ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ ও থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণপ্রভা চমকিয়া পথিকের মনে ভীতি ও নয়নে ধাঁধাঁ জন্মাইতেছিল। এহেন ভীতপ্রদ ও বিপদসঙ্কুল সময়ে দুইটী পথিক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পূর্ব্বকথিত কালীবাড়ীর উপরদিয়া যাইতেছিল। বহুক্ষণ বৃষ্টির জলে ভিজিবার দরুণ তাহারা বড়ই অবসন্ন হওয়ায় একেবারে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিল। শীতে হাত পা আড়ষ্ট হওয়ায় তাহারা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একে শীতে বাতে অবসন্ন তাহাতে আবার গাঢ় অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদবিক্ষেপে তাহাদের পদস্খলন হইতেছিল। তাঁহারা আসন্নমৃত্যুর কবলিত জানিয়া জীবনে হতাশ হইয়া সেইস্থানেই বসিয়া পড়িল। হঠাৎ বিদ্যুতালোকে কালীবাড়ীর ঘর দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাহাদের মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল,—আবার বাচিব বলিয়া নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তাহারা গৃহস্থের বাড়ী মনে করতঃ ঘরের বারাণ্ডায় আশ্রয় লইল। 'ঘরে কে আছেন?' 'ঘরে কে আছেন?' বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকিতেও কোন উত্তর পাইল না। তাহারা আবার ডাকিতে লাগিল, এইবার ঘরের ভিতর শঙ্খবলয়াদির ধ্বনি ও হৃদয়প্রাণস্পর্শী বামাকণ্ঠ স্বর শুনিতে পাইল; কে যেন বলিতেছেন—

কর্ত্তা বাড়ীতে নাই, আমি ও আমার দুইটী মেয়ে এই তিনটী ঘরে আছি। তোমরা কে এবং কেনই বা ডাকিতেছ? তাহারা বলিল—"আমরা দুইটী পথিক, অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, ঘোর অন্ধকারে পথ ঘাটও দেখিতে পাইতেছি না, নিরুপায় হইয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছি; আজিকার মত এখানে থাকিতে চাই, আর কোথায় যাইবারও আমাদের শক্তি নাই। ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"এই একখানা ঘর ব্যতীত আমাদের আর ঘর নাই, বিশেষতঃ আমরা মেয়েমানুষ, তোমরা কিরূপে থাকিবে।"

পথিকদ্বয় অতি কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন—"মা, আমাদের ঘরের প্রয়োজন নাই, কোনমতে বারাণ্ডায় রাত্রির বাকী অংশ টুকু কাটাইব, আপনারা নির্ভয়ে ঘরের ভিতর থাকুন।" পথিকদ্বয়ের কাতরোক্তিতে তাঁহার দয়া হইল, "তবে থাক" বলিয়া বলিলেন—"আমরা ব্রাহ্মণ, বাড়ীতে প্রত্যহ ঠাকুর পূজা হয়, তোমাদের জন্য ভোগের প্রসাদ দিতেছি, তোমরা পুষ্করিণী হইতে হাত পা ধুইয়া আইস"। ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও প্রথমতঃ তাহারা আহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু অতিথি অনাহারে থাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয় বলায়, তাহারা আহার করিতে স্বীকৃত হইল। তিনি বলিলেন—"তোমরা হাত পা ধুয়ে এস, আমি বারাণ্ডায় প্রসাদ রাখিয়া দিব; আহারান্তে থালাদি ধৌত করিয়া বারাণ্ডায় রাখিয়া দিও।" তাহারা পুষ্করিণী হইতে হস্তপদ প্রক্ষালনান্তর আসিয়া দেখিতে পাইল নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা পরিপূর্ণ দুইখানা পাত্র সাজান রহিয়াছে। সমস্ত প্রসাদ খাইতে পারিবে না বলিয়াই প্রথমতঃ তাহাদের মনে ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু যখন খাইতে আরম্ভ করিল তখন কি কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া গেল; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রসাদ উদরসাৎ করিল; দিলে আরও যেন খাইতে পারিত। ফলতঃ এরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও অমৃততুল্য সুস্বাদু ভোজ্য তাহারা জীবনে আর কখনও উপভোগ করে নাই। আহারান্তে থালাদি ধৌত করতঃ বারাণ্ডায় রাখিয়া দিল। প্রাতঃকালে গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। পূর্ব্ব রাত্রিতে যে থালাদি ধৌত করিয়া বারাণ্ডায় রাখিয়াছিল তাহাও দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল। ঘরের দরজার নিকটে গিয়া দরজা বাহির হইতে তালাবদ্ধ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল। দরজার কপাটের মধ্যে একটী ছিদ্র ছিল, কৌতুহল পরবশঃ হইয়া সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া দৃষ্টিকরতঃ ঘরের ভিতর দেখিল—এলায়িত কুন্তলজালশোভিতা ভয়ঙ্করী, বিকটবদনা, বিবসনা, নৃমুণ্ডমালাপরিশোভিতা রুধিরক্ষরিত লোল জিহ্বা, অসিচর্ম্ম ধারিণী—কালীমূর্ত্তি; তাহার দুই পাশে রুধির পানোন্মত্তা দুই যোগিনী—পদতলে জগৎপিতা আশুতোষ। যদিও মূর্ত্তি মৃণ্ময় ছিল কিন্তু তাহারা জীবন্ত মূর্ত্তির ন্যায় দেখিতেছিল। তাহাদের চক্ষু স্থির হইল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মায়ের মুখের দিকে অনিমিষলোচনে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

কিন্তু এ অবস্থা বেশীক্ষণ ছিল না, অল্পকাল মধ্যেই চৈতন্য সঞ্চার হইল। তাহাদের শরীর কণ্টকিত ও পুলকিত হইল; নয়ন যুগল হইতে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল—তাহারা মা, মা, বলিয়া শিশুর মত চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল; এবং মা ছলনা করিয়াছেন বলিয়া মাকে মিষ্ট ভৎ‍সনা করিতে লাগিল।

ধন্য পথিকদ্বয়, পূর্ব্বজন্মে যেন কত পুণ্য ও তপস্যা করিয়াছিলে, তাহারই ফলে আজ তাহাদের ভাগ্যে—এমন শুভদিন মিলিয়াছে! যাহার প্রসাদ লাভার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তপস্যা করিয়াছিলেন,—যাহার কৃপাকণা লাভ-করিবার জন্যে আজও কত যোগীঋষি, সাধু-মহাত্মা শ্মশানে-মশানে, কান্তারে-প্রান্তরে, গিরি-সরোবর তীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অস্থিচর্ম্ম সার করিতেছেন,—দেবাদিদেব জগদ্গুরু সদাশিব সমস্ত পরিত্যাগকরতঃ অহর্নিশি যাহার পদ-সরোজদ্বয় হৃদি-সরোবরে ধারণ করিয়া-ছেন,—ভক্তগণ যাঁহার মূর্ত্তি হৃদিসিংহাসনে স্থাপনকরতঃ ভক্তিপুষ্প দ্বারা নিয়ত পূজা-করিয়া থাকে,—ক্ষুৎপিপাসাতুর বিশ্বপতি মহা-দেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমনান্তর ভিক্ষা না পাইয়া পরিশেষে যাঁহার শ্রীহস্তের অন্ন ভক্ষণকরতঃ উদর পূর্ণ করিয়াছিলেন,—আজ এই পথিক-দ্বয় সেই ভক্তবৎসলা জগজ্জননী মা আনন্দ-ময়ীর বরাভয়প্রদ শ্রীহস্তের অন্ন খাইয়া জীবন সার্থক করিল।

ক্রমে এ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইল, গ্রাম হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহাদিগকে দেখিবার জন্য কালীবাড়ী অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া সকলেই যারপরনাই বিস্মিত হইল। আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিতে করিতে, সকলেই একে একে আপন আপন গৃহাভিমুখে ফিরিয়া গেল। পথিক-দ্বয়ও ভক্তি গদ্গদচিত্তে মায়ের স্তবাদি করিয়া বিদায় হইল। কিছুদিন পরে বন্ধুবান্ধবসহ কালীবাড়ীতে আসিয়া খুব ধুমধামের সহিত মায়ের পূজা দিয়া গেল।

এই কালীবাড়ী সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা জানা আছে, সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইহা উপন্যাস নহে, সত্য ঘটনা। এই গ্রামের এবং চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের ভদ্র, অভদ্র, স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি সকলেই ইহা অবগত আছেন। যাহারা হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা বালকের খেলা ও কুসংস্কার বলিয়া সরল নাসিকাটি কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে এই ঘটনাটী পড়িতে অনুরোধ করি।

ভ্রাতৃগণ! সেই ত্রিজগৎ প্রসবিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, ভক্তহৃদয়রঞ্জিনী হরমনমোহিনী এলোকেশী মা দিগম্বরীর শ্রীচরণ সরোজে প্রণাম করিয়া বলি;—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃস্ম তাম্॥

ব্রহ্মচারী প্রিয়নাথ।

—:০:—

মা আসিলে কি ?

আজ বর্ষপরে আনন্দময়ী মায়ের বঙ্গে আগমন—তাই বুঝি বঙ্গের ঘরে ঘরে আজ আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে—আনন্দের ছড়াছড়ি—আনন্দ কোলাহল ! যে দিকে চাও সে দিকেই দেখিবে কেবল হাসি, কেবল আনন্দ ! মাঠের দিকে চাহিয়া দেখ—সুন্দর শ্যামল ধান্যে মাঠ কেমন সুন্দর দেখাইতেছে ! বোধ হইতেছে প্রকৃতি যেন নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া আপন গরবে আপনি হাসিতেছেন—আর হাসিমুখে আনন্দময়ী মায়ের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ছোট ছোট ধান গাছগুলি জলের উপর মাথা ভাসাইয়া মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে ঈষৎ দুলিতেছে, বোধ হইতেছে তাহারাও যেন কাহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আনন্দে নাচিতেছে—আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া যেন কাহার আগমন সংবাদ নীরবে ঘোষণা করিতেছে ! মা আনন্দময়ী ! তবে সত্যই তুমি আসিলে কি ?

ঐ চেয়ে দেখ, নালা, ডোবা, বিল, ঝিল, তড়াগ পুকুর ভরা বর্ষার জলে কুল ডুবু ডুবু করিয়া কুমুদ, কহ্লার, কমল প্রভৃতি বিবিধ ফুটন্ত জলজ কুসুম বুকে লইয়া আপন মনে হাসিতেছে, আর সৌরভে জগৎ মাতাইতেছে; মধুলোভে ভ্রমরকুল এ ফুলে ওফুলে বসিতেছে, ও গুণ্ গুণ্ রবে কাহার গুণ গান করিতেছে; তাহারাও যেন কাহার আগমনে পুলকিত হইয়া আনন্দে মাতিয়াছে। চেয়ে দেখ নদী, খালের আনন্দ যেন আর ধরে না। তাই বর্ষার জলে দুকুল ভাসাইয়া আনন্দ গাথা গাইতে গাইতে—অবিশ্রান্ত গতিতে আনন্দময়ী মায়ের শুভাগমনের শুভ মুহূর্ত্তে সিন্ধুপতি সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে ! আজ তাহার গতির বিরাম নাই, বুঝি বা কোন অশুভ মুহূর্ত্তে সে মায়ের শুভাগমনের শুভযোগ হারাইয়া ফেলে তাই এত দ্রুতবেগে চলিয়াছে। ঐ দেখ মহাজনগণ নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে বড় বড় নৌকা সাজাইয়া আপন গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে। আজ আর প্রবাসীর আনন্দ ধরে না; বহুদিন পরে শারদীয় অবকাশের শুভসুযোগে পিতামাতা, ভাইবন্ধু, স্ত্রী পুত্র পরিজনের সঙ্গে মিশিবার জন্য গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে। কেহ জলপথে কেহ স্থলপথে, যাহার যে পথে সুবিধা সেই পথে চলিয়াছে। সকলের মনে একই ভাব, একই আশা কতক্ষণে বাড়ী পহুছিবে—কতক্ষণে পুত্র পরিজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। সকলের মনেই আনন্দ—সকলের মনেই উৎসাহ—সকলের মুখেই হাসি ! মা আনন্দময়ী তবে সত্যই তুমি আসিলে কি ?

একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ—নীলাকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আকাশে আর মেঘ নাই, মেঘের আর সে গর্জ্জন নাই—আর সে মুহুর্মুহু শ্রবণভেদী বজ্রপাত ধ্বনি নাই—বিদ্যুৎ মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া আর চমকিতেছে না, কিম্বা আর বর্ষাকালীন অমাবস্যার ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায় বিপন্ন পথিকের ভ্রান্তি জন্মাইতেছে না। নীলাকাশ অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজিমণ্ডিত হইয়া

পৃথিবীর উপর নীল চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর তারই মাঝে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতে করিতে তাহারই শোভাবিস্তার করিয়া আপন মনে হাসিতেছে—আর যেন নীরবে বলিতেছে—মা আসিতেছেন। হাঁ মা আনন্দময়ি সত্যই তবে তুমি আসিলে কি?

ফুল বাগানের দিকে চেয়ে দেখ, জবা সেফালিকা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি নানাজাতীয় ফুলের গাছ ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! বোধ হইতেছে যেন ফুলরাণী প্রকৃতিসতী কাহার পায়ে অঞ্জলী দিবার জন্য ফুলের ডালা সাজাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে কাহার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় হাসিমুখে দাড়াইয়া আছেন—আপন মনে আপন ভাষায় যেন আনন্দময়ী মায়ের আগমন ঘোষণা করিতেছেন! বল, মা, আনন্দময়ী সত্যই তবে তুমি আসিলে কি?

এত গেল প্রাকৃতিক দৃশ্য; একবার সহর বাজারের দিকে চেয়ে দেখ সেখানেও যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে—সকলেই যেন সোৎসাহে কাহার আশায় নবসাজে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সহরবাজারের দোকানগুলি যেন আনন্দের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। চেয়ে দেখ দোকানগুলি কেমন সজ্জিত। পোষাকের দোকানে নানাবর্ণের—নানারকমের পোষাক স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। অলঙ্কারের দোকানে অলঙ্কার' খাবার দোকানে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, মিঠাইর দোকানে নানাবিধ মিঠাই, ফলের দোকানে নানাবিধ ফল শোভা পাইতেছে। বোধ হইতেছে প্রত্যেক দোকান যেন কাহাকে অর্ঘ্য দিবার জন্য আপন আপন অবস্থানুযায়ী সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কাহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ আর কোন দোকানে ক্রেতার অভাব নাই; রাস্তায় আর চলা যায় না, যেন একটা জীবন্ত আনন্দের স্রোত ছুটাছুটী করিতেছে। এক আস্‌ছে—এক যাচ্ছে। দোকানীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে আপন আপন দোকান সাজাইয়া ক্রেতার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেছে। কি যেন কি একটা আনন্দের লহর ছুটিয়াছে—কি যেন অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ প্রত্যেকের প্রাণে প্রাণে খেলিতেছে। সকলের মনেই আনন্দ, সকলের প্রাণেই উৎসাহ,—সকলের মুখেই হাসি! আজ এমন হ'ল কেন? দুদিন আগে ত এরূপ দেখি নাই। সকলেই যেন কার শুভ সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মা আনন্দময়ী, সত্যই তবে তুমি আসিলে কি?

দীনহীন ভিখারীর পর্ণকুটীর হইতে রাজামহারাজার সুধাধবলিত অট্টালিকার দিকে চেয়ে দেখ—কি সুন্দর! দিব্যি ফুটফুটে। কোথায় বন, জঙ্গল কি আবর্জ্জনা নাই—সব পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, যেন তাহারা হাস্‌তেছে। আজ আর রাজা প্রজা নাই—ধনী দরিদ্র নাই—সকলেই যেন আনন্দে মাতিয়াছে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গৃহস্থের কুলবধূ—ছেলে মেয়েরা অবস্থানুযায়ী নববস্ত্রে, নবালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে—আনন্দে গাইতেছে—আনন্দে ছুটাছুটী করিতেছে। কই আগে ত এমনতর দেখি নাই? মা আনন্দময়ী, সত্যই তবে তুমি আসিলে কি?

মা আনন্দময়ী; সত্যই তবে তুমি আসিলে কি? কিন্তু কই মা, তোমার আগমনে প্রাণে

তেমনতর ভাব জাগে কই? আনন্দে প্রাণ তেমন মাতে কই? এ আনন্দ যে মেঘের কোলে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিকে উঠিয়াই ক্ষণিকে মিলাইয়া যায়—এ আনন্দ যে আসন্নকালপ্রাপ্ত রোগীর মলিন মুখের ম্লান হাসি-রেখার ন্যায় চকিতে উঠিয়া চকিতেই অদৃশ্য হইয়া যায়—প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে যে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে অন্ধকারে মিশিয়া যায়—এ আনন্দ যে তাই। মা আনন্দময়ী যদি সত্যই তুমি আসিলে তবে তোমার সন্তানদের মুখ এত ম্লান কেন? আনন্দময়ীর সন্তান কেন রোগেদুঃখে, শোক-তাপে জর্জ্জরিত? আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে কেন অকালমৃত্যু, রোগশোক করালবদন ব্যাদানকরতঃ তোমার কুসুম-সুকোমল সন্তানদিগকে গ্রাস করিতেছে? কেন তাহারা ভীষণ বাত্যাতাড়িত সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুম-কলিকার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে!—তোমার সাধের সংসারকানন হইতে অকালে বিদায় নিতেছে? মা যার আনন্দময়ী তার সন্তান কেন নিরানন্দের জীবন্তমূর্ত্তি! আজ মা আনন্দ-ময়ী অন্নপূর্ণার সন্তান অনাহারে ক্লিষ্ট—মুষ্টি-ভিক্ষার প্রার্থী। বল দেখি মা কেন এমন হ'ল।

মা এ তোর দোষ নয়—এ যে আমাদেরই দোষ। তুই আসিবি বলিয়া জড়দেহ চৈত-ন্যের সঞ্চার করিয়া দিস্—তুই আসিবি বলিয়া নীরস প্রাণ সরস করিয়া দিস্—তুই আসিবি বলিয়া ঘুমের ঘোরে আনন্দের স্বপ্ন দেখাস্—অলসতা ছাড়িয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিস্। মাগো, তুই ত আসিবার জন্য সদাই ব্যাকুল। সন্তান মন্দ হইতে পারে, তাই বলিয়া মা কি কখন মন্দ হইতে পারে? মা, তুই ত আমাদিগকে ভুলিস নাই; কিন্তু বহুদিন হইল আমরা তোকে ভুলিয়াছি। কাঞ্চনের স্থান কাচ দিয়া পূর্ণ করিয়াছি। দেবীর সিংহাসনে দানবীকে বসাইয়াছি। অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পান করিয়াছি, তাই আজ বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, আমরা বিষে জর্জ্জরীত হইয়া আসন্নমৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছি। কিন্তু তুই মা ব্রহ্মময়ী, তোর রক্ত এখনও আমাদের শিরায় শিরায়—ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে তাই এখনও বাচিয়া আছি, মরিয়াও মরিতেছিনা;—এখনও বাঁচিবার আশা আছে। তাই মা তুই মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া থাকিস্।

মা আমরা কর্ম্মের ফেরে—অদৃষ্টের দোষে সুপথ ছাড়িয়া কুপথে চলিয়াছি। তুই আমাদিগকে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, প্রেম, সরলতা প্রভৃতি সত্য নিত্য পোষাক-অলঙ্কারে সজ্জিত হইতে ইঙ্গিত করিস্, আর আমরা কিনা নিত্য ছাড়িয়া অনিত্য—সত্য ছাড়িয়া মিথ্যায় ভুলিয়া আছি। আমরা বিবেকের পরিবর্ত্তে আসক্তি—জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা;—দয়ার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা—প্রেমের পরিবর্ত্তে হিংসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি—তুচ্ছ বসন ভূষণে মজিয়াছি। তুই মা কর্ম্মরূপিণী আর আমরা কি না তোর সন্তান হইয়া তমগুণাশ্রয় করতঃ দিন দিন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। মা তুই কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু তোর চরণে বলি দিতে ইঙ্গিত করিস্, আর আমরা কি না তুচ্ছ রসনাপরিতৃপ্তির জন্য তোরই সন্তানরূপী অজশিশুগুলিকে বিনাদোষে বলি দিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-

করতঃ নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। মূর্খ আমরা ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখি না ইহাতে যে পাপের বোঝা ভারী করিতেছি—দিন দিন তোমা হইতে দূরে সরিয়া পরিতেছি—অধঃপাতের চরম সীমায় যাইতেছি।

মাগো, তুই চাস্ শুধু প্রাণ; মনে প্রাণে তোকে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে ঢাক ঢোল বাজাইয়া অহংত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাহ্য-পঞ্চমকারে তোমার পূজা করিলে হৃদয়ের মলা কাটিবে না—চিত্তশুদ্ধি না হইয়া অশুদ্ধ চিত্ত আরও অপবিত্র, অশুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে এ হৃদয়ে তোমার স্থান হইবে না। কিন্তু তা পারি কই মা, কোন সুত্রে যে কপটতা, কুটিলতা, হিংসা দ্বেষ, হৃদয় অধিকার করিয়া বসে তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি না। তেমনতর শক্তি দাও মা, যেন, তোমার চরণে হিংসাদ্বেষ, কপটতা কুটিলতা, কামক্রোধাদি বলি দিয়া এ নশ্বর জীবন ধন্য করিতে পারি—মায়ের সন্তান বলিয়া জগতের সম্মুখে বুক উঁচু করিয়া দাড়াইতে পারি। আজি এ শুভদিনের শুভ মুহূর্ত্তে এমন অক্ষয় অব্যয় বীজ রোপন কর মা, যেন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে তোমার সন্তান জানিয়া দোষী পাপী না ভাবিয়া—আপন ভাই বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে পারি—পরার্থে এ জীবন উৎসর্গকরতঃ মায়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয় মা মা ডাকিয়া সরল শিশুর মত তোমার কোলে ঝাপাইয়া পড়িতে পারি—অন্তিমে যেন তোমায় আমার মনোময় মূর্ত্তিতে দেখিতে দেখিতে—তোমার ঐ রাতুল চরণ ধ্যান করিতে করিতে এ জীবনের অবসান করিতে পারি। **জয় মা আনন্দময়ী!**

—:0:—

পাগলের-দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

সাত্ত্বিক অহংকারে তিনটী অবস্থাভেদ বর্ত্তমান আছে। প্রথমাবস্থার স্পন্দনের গতি প্রথমাবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্থুল, দ্বিতীয়াবস্থার গতিতে প্রতিহত হইয়া মনরূপে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সংযোগস্থল আজ্ঞাচক্রের স্থূলশক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। মনেরও তিনটী অবস্থাভেদ বর্ত্তমান আছে। প্রথমাবস্থা মননকারণশক্তি, ইহার গতি দ্বিতীয়াবস্থাস্থিত অন্তকারণ শক্তির কিঞ্চিৎ স্থূলশক্তিতে প্রতিহত হইয়া যকৃতের স্থূলশক্তি রূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। ইহার স্পন্দনের গতি পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া যকৃতে প্রকাশিত হয় এবং ফলাফল এই নাড়ীর মধ্যদিয়াই প্রকৃতিতে যুক্তহয়, তথা হইতে তাহার স্থূলভাবে চরম প্রকাশিত অন্তঃকরণের স্থুল শক্তিতে যুক্তহয়।

মনের দ্বিতীয়াবস্থা অন্তকারণশক্তি (Discussion powers) ইহা ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলেই স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত গতি তৃতীয়াবস্থাস্থিত চিত্তের স্পন্দ-

নের কিঞ্চিৎ স্থূল গতিশক্তিতে প্রতিহত হইয়া প্লীহার স্থূলশক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। ইহার স্পন্দনের গতিশক্তি—ইড়া নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতিতে যুক্ত হয় এবং তথা হইতে তাহার ব্যক্ততার চরম সীমাস্থ অন্তঃকরণের স্থূলশক্তিতে যুক্ত হয়। মনন-কারণশক্তি অন্তকারণশক্তি দ্বারা মীমাংসিত হইলে, শুদ্ধফল উভয়ের ব্যক্ত স্পন্দনের সাম্য সূক্ষ্ম শক্তিতে যুক্ত হইয়া মূল প্রকৃতিতে এবং তথা হইতে সূক্ষ্ম চৈতন্তে যুক্ত হয়। ইহাই মনের তৃতীয়াবস্থা এবং ইহাই চিত্তনামে অভিহিত।

সূক্ষ্ম মনের প্রত্যেক কার্য্যই স্পন্দনের গতির সাহায্যে প্রকৃতিতে যুক্ত হয় এবং তথা হইতে ক্রমে বিকশিত হইয়া প্রকৃতির স্থূল-শক্তিপ্রকাশক অন্তঃকরণের স্থূলশক্তিতে যুক্ত হয় এবং তথাহইতে মহত্তত্বে, মহত্তত্ব হইতে অহংকারের শক্তিতে যুক্ত হয়। অহংকারের সহিত যুক্ত হইলেই তাহার বহির্ম্মুখী বিকর্ষণ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া আজ্ঞাচক্রে নিবদ্ধ হয়। এই স্থানে স্থির হইলেই আমাদের কোন অভিলষিত বিষয়ের মীমাংসিত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

মনের শুদ্ধফল প্রকৃতিতে যুক্ত হইলে, প্রকৃতির স্থূল কার্য্যকারিণী শক্তির আধার অন্তঃকরণে বিশেষভাবে প্রতিহত হয়। প্রতিহত হইলেই এই স্থানীয় ব্যক্ত স্পন্দনের গতি মনের স্থূল কার্য্যকারিণী শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন শুদ্ধফলের গতিতে বিশেষরূপে প্রতিঘাতিত হইয়া থাকে। মনের প্রত্যেক কার্য্যেরই চরম ফল প্রকৃতিতে যুক্ত হইয়া এই আধারটীতে বিশেষরূপে আঘাত করে, পরে স্পন্দনের গতির সাহায্যে অন্যান্য স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। অনেক সময় মনের কার্য্যাদির বাহুল্যবশতঃ এই অন্তঃকরণ অত্যধিক রূপে স্পন্দিত হওয়ার দরুণ বিকৃত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে; এই অবস্থায় সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কোন কারণ-বশতঃ অত্যন্ত ভীত হইলে মনের কার্য্য বড় চঞ্চল হইয়া পড়ে, সুতরাং অন্তকারণশক্তি সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম না হইয়া, সমস্ত শক্তিসমূহকে আলোড়িত করিয়া অশুদ্ধ ফলাফল প্রকৃতিতে যুক্ত করে, ইহাতে প্রকৃতির স্থূল কার্য্যকারিণীশক্তির আধার অন্তঃকরণ বিশেষরূপে প্রতিঘাতিত হইয়া অসাম্য হইয়া পড়ে। এই প্রকার অত্যধিক অত্যাচারের দরুণ অবশেষে নিস্তব্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

সাত্বিক অহংকারের প্রথমাবস্থা, মন চরম ব্যক্তাবস্থায় পৌছিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম শক্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম শক্তির স্পন্দনের গতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল, সুতরাং প্রথমাবস্থার স্পন্দনের গতি দ্বিতীয়াবস্থাস্থিত কিঞ্চিৎ স্থূল গতিতে প্রতিহত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থূল শক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত।

সাত্বিক অহংকারের দ্বিতীয় স্থানীয় স্পন্দনের গতি বর্দ্ধিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্থূলাবস্থায় তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় স্থানীয় স্পন্দনের গতি তৃতীয় স্থানীয় কিঞ্চিৎ স্থূল গতিতে প্রতিহত হইয়া ক্রমে স্থূলাবস্থায় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্থূলশক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। এই একাদশ ইন্দ্রিয় শক্তি সূক্ষ্ম-বস্থায় রজোগুণাত্মক।

সাত্ত্বিক অহংকার এই রজোগুণের সহিত যুক্ত হইলেই তামস অহংকারের প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ স্থূলাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্ত-রজোগুণাত্মক অহংকারের স্পন্দনের গতি বিস্তৃতিহেতু কিঞ্চিৎ স্থূলাবস্থায় তামস অহংকারে পরিণত হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যক্তরূপে প্রকাশিত স্থূল শক্তির স্পন্দনের গতি তাহাহইতে তামস অহংকারের ব্যক্ত কিঞ্চিৎ স্থূলস্পন্দনের গতিশক্তিতে প্রতিহত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রের স্থূলশক্তিরূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। এই পঞ্চ তন্মাত্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধচক্রের স্থূল শক্তিরূপ দেহের পঞ্চস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া স্পন্দনের বহির্ম্মুখী গতিশক্তি দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া ক্রমে স্থূল হয় এবং স্থূলরূপে প্রকাশিত স্থূল পঞ্চভূতের প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রকার শক্তির ক্রিয়া হইতে আমাদের দেহস্থিত স্থূল মাংসাদির সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতের পঞ্চমহাশক্তি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের সামঞ্জস্যে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই কাঠিন্যের অব্যক্তাবস্থা। ইহা ক্রমে স্পন্দনের গতির বিকর্ষণ শক্তির সাহায্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া ব্যক্তরূপে লৌহ, কাষ্ঠ ইত্যাদির কাঠিন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের উপযোগী হয়। এই স্থানই চৈতন্যের স্পন্দনের গতির পঞ্চমস্থান এবং ইহার অব্যক্ত সূক্ষ্মাবস্থাই চতুর্থ স্থান।

সগুণ-ভূমা ব্রহ্মের চৈতন্যের ভূমা স্পন্দনের গতির বহির্ম্মুখী স্বভাবাপন্ন সর্ব্বব্যাপক বিকর্ষণ-শক্তি বর্ত্তমানহেতু পঞ্চ স্তর ভেদ করিয়া স্থূলভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে।

দেহস্থিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শক্তির ক্ষমতা উপযোগী পরমাণু সমষ্টি সংযোজিত হইয়া সৃষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের শক্তিসহ সংযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মক্ষম হয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় মূলাধারস্থ সূক্ষ্ম পৃথ্বীমণ্ডলের সূক্ষ্মশক্তি সহ যুক্ত থাকিয়া শক্তিসম্পন্ন। রসনেন্দ্রিয় স্বাধিষ্ঠানস্থ সূক্ষ্ম-রাগ-রসময় সংযোগ-কারণশক্তিতে যুক্ত থাকিয়া—শক্তি প্রকাশে সক্ষম। দর্শনেন্দ্রিয় মণিপুরস্থ সূক্ষ্মতেজে সংযুক্ত থাকিয়া দর্শন ক্রিয়ার শক্তি প্রকাশে সক্ষম। ত্বগেন্দ্রিয়ের স্পর্শশক্তি অনাহত সূক্ষ্মবায়ুতে যুক্ত থাকিয়া প্রকাশিত। শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের শ্রবণশক্তি বিশুদ্ধচক্রস্থিত অনন্ত দেশ ও কাল বিস্তার-কারণশক্তিতে অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকাশে যুক্ত থাকিয়া কর্ম্মক্ষম হয়। এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে সংযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মক্ষম হইয়াছে।

হস্ত স্থূলভাবে সূক্ষ্মদেশ ও কালের বিস্তার-কারণশক্তির ক্রিয়াপ্রকাশক; ইহার শক্তি বিশুদ্ধচক্রস্থ সূক্ষ্ম আকাশে যুক্ত থাকিয়া প্রকাশিত। পদ সেই দেশ ও কালের সূক্ষ্ম গতিকারণ-শক্তির ক্রিয়াপ্রকাশক; ইহার শক্তি অনাহতস্থ সূক্ষ্ম বায়ুতে যুক্ত থাকিয়া প্রকাশিত। উপস্থ স্থূলভাবে সেই দেশ ও কালের সূক্ষ্ম খণ্ডকারণশক্তির গুণের ব্যক্ত ক্রিয়ার প্রকাশক। ইহা মণিপুরস্থ সূক্ষ্ম তেজে যুক্ত থাকিয়া প্রকাশিত।

ইহার শক্তি সূক্ষ্মাবস্থায় স্বাধিষ্ঠানস্থ সূক্ষ্ম রসে সংযুক্ত থাকিয়া ব্যক্তরূপে প্রকাশিত।

উহা স্থূলভাবে এই চতুর্ব্বিধ শক্তির

সামঞ্জস্যে স্থূলরূপে প্রকাশ কারণশক্তিসম্পন্ন। ইহার শক্তির ক্রিয়া মূলাধারস্থ পৃথ্বীমণ্ডলে যুক্ত থাকিয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপে আমাদের দেহটী প্রকাশিত হইয়া, আবশ্যকানুযায়ী কর্ম্মাদি সমাপনান্তর এই শক্তির অন্তর্মুখী কেন্দ্রানুকূল শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটিয়া সূক্ষ্মাবস্থায় লইয়া যায়।

ভূমা-চৈতন্যের স্পন্দনের সূক্ষ্ম মূল শক্তিতে সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় বর্ত্তমান আছে। সত্বগুণ ব্যক্তরূপে চৈতন্যের স্পন্দনের গতির বহির্মুখী বিকর্ষণ শক্তি। ইহাই জগৎ প্রকাশের কারণ। বহির্মুখী শক্তি স্থিতিকারণ-শক্তির আশ্রয় ভিন্ন প্রকাশিত হইতে পারে না; সুতরাং বিকর্ষণ শক্তির ব্যক্তাবস্থা প্রকাশিত হইলেই স্থিতিকারণ-শক্তি উদ্ভূত হয়। এই স্থিতিকারণ-শক্তিই রজোগুণাত্মক। অনন্তকাল ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত বলিয়া ব্রহ্মেই লীন রহিয়াছে। ভূমা বহির্মুখী বিকর্ষণশক্তি এই অনন্ত-পথে ধাবিত বলিয়া পুনঃ ব্রহ্মেতেই লয় হয়। যে স্থান হইতে কেন্দ্রের প্রতিকূলে ধাবিত বিকর্ষণ শক্তি পুনঃ লয় হইতে কেন্দ্রানু-কূলে ধাবিত হয়, সে স্থান হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত বহির্মুখী বিকর্ষণ শক্তির যে অবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তাহাই কেন্দ্রানুকূল অন্তর্মুখী আকর্ষণ শক্তি নামে অভিহিত। ইহা তমো-গুণাত্মক এবং ইহা হইতেই প্রলয়কার্য্য সাধিত হইতেছে।

এই ভূমা-চৈতন্যের স্পন্দনের কর্ম্মকারিণী ব্যক্ত শক্তিই স্থূলরূপে তাড়িত শক্তি। তাড়িত শক্তির দুইটী গুণ আমরা সর্ব্ব সাধারণতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকি একটী বিকর্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন; অন্যটী ইহার বিপরীত ক্রিয়াপ্রকাশক আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন। বিকর্ষণের মূলস্থান হইতে আকর্ষণের চরম স্থান পর্য্যন্ত অবস্থাটীই স্থিতি।

আমাদের অন্তঃকরণে (heart) এই অবস্থাত্রয়ের ব্যক্তক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়। দেহস্থিত চৈতন্যযুক্ত আত্মার স্পন্দনের গতি-শক্তি স্থূলভাবে তাড়িত শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া অন্তঃকরণের স্পন্দন জন্মাইয়া থাকে; এবং এই স্পন্দনের গতির সাহায্যে মস্তিষ্ক ও ফুস্ফুস্ কর্ম্মক্ষম হইয়া দেহটী অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশিত অবস্থাটী বর্ত্তমান থাকে।

এই স্থূল শক্তিটীর ব্যক্তাবস্থা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেই আমাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সূক্ষ্মাবস্থায় মহাপঞ্চভূতে লয় হইয়া থাকে। এইরূপেই আমাদের জীবন মরণ কার্য্য সাধিত হইতেছে।

পুরুষ ও স্ত্রী জাতিতে তাড়িত শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা, চৈতন্যের স্পন্দনের গতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণদ্বয় স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। পুরুষ বিকর্ষণ-শক্তিসম্পন্ন, স্ত্রী আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন, পুরুষ-চৈতন্য, স্ত্রী-শক্তি, পুরুষ (পুরুষ), স্ত্রী-প্রকৃতি এই উভয়ের সংমিলনে গুণের প্রকাশ। পুরুষ চৈতন্য সুতরাং ইচ্ছা-ময়, স্ত্রীকর্ম্মকারিণী শক্তি সুতরাং প্রকৃতি। প্রকৃতির আশ্রয় ব্যতিরেকে পুরুষ শক্তিসম্পন্ন নয়; সুতরাং এই অবস্থায় আংশিকরূপে নির্গুণ।

তাড়িত শক্তির অবস্থাদ্বয় সর্ব্বদাই সাম্যার্থে সংযোগ স্বভাবাপন্ন; তাই স্ত্রীর প্রতি পুরুষের, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর আসক্তি জন্মিয়া থাকে।

উভয়ের সংযোগের সাম্যাবস্থায় প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দের চরম বিকশিতাবস্থায় কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কামাতুর হইলেই শক্তিদ্বয়ের সাম্যতা আর থাকে না; সুতরাং কাম বিকৃতাবস্থায় বিকর্ষণ শক্তিদ্বারা ব্যক্ত হইয়া চরম স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কামের ব্যক্ত বহির্ম্মুখী-শক্তি চরমাবস্থায় পৌছিলেই অন্তর্ম্মুখী পথে ধাবিত হইয়া পুনরায় সাম্যতা লাভ করিয়া থাকে; তাই এই অবস্থায় দেহ ও মনের কোন প্রকার উত্তেজনা থাকে না। যতক্ষণ প্রেমানন্দ ততক্ষণ শক্তিদ্বয়ের মিলিত সাম্যাবস্থার স্থিতি। এই অবস্থায় গুণ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বেশ্যাসক্ত পুরুষগণ সংসারিক যাবতীয় বিষয়ে উদাসীন হইয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক গভীর নিশীথে, নিশাচররূপে ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পথ অতিবাহিত করিয়া সুদূর বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শান্তিলাভ করে কেন? বেশ্যাগণের চিত্তে সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকে। পরপুরুষই তাহাদের স্থূলতঃ ধ্যান, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম। চিত্তবৃত্তির অধিকাংশ বিষয়গুলি এইরূপ একটী জঘন্য বিষয়েতে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া সাধারণ অসংযমী পুরুষের প্রতি তাহাদের একটী বিশেষ আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাদ্বারা আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। যে সকল পুরুষের সংযমশক্তি তাহাদের আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন ইচ্ছা শক্তির তুলনায় হীন তাহারাই চিত্ত স্থির রাখিতে সমর্থ না হইয়া বেশ্যার ইচ্ছানুযায়ী চালিত হয় এবং পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়া গভীর নিশীথে, নিশাচর বাবুরূপে পরিণত হইয়া সুদূর বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক মিলিত হয়। ইচ্ছা শক্তির আধিক্যহেতু ক্রমে বেশ্যার এমন অনুগত হইয়া পড়ে যে তাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা আর থাকে না।

বেশ্যা স্ত্রীজাতি সুতরাং আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন, সে সর্ব্বদাই বিকর্ষণ শক্তির ধ্যান করিতে করিতে সাধারণ সাম্য শক্তির অতীত হইয়া অসাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। আকর্ষণের শক্তি হইতে স্বল্প শক্তিসম্পন্ন, বিকর্ষণশক্তি (পুরুষ) আকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে স্থির থাকিতে সক্ষম না হইয়া আকৃষ্ট হয় এবং মিলিত হইয়া সাম্যতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। সাম্যাবস্থায়ই বিবেক চৈতন্য হয় এবং শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ সচ্চরিত্র হইতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে বিকর্ষণ শক্তির আধিক্য ঘটিতে আরম্ভ হয়। এইরূপে আকর্ষণের ক্ষমতার অতীত হইয়া অবাধে বেশ্যার মায়াপাশ ছিন্নকরিয়া মুক্ত হইতে সক্ষম হয়। তাই বেশ্যাসক্তগণ কালে সচ্চরিত্র হইতে সক্ষম হইয়া থাকে।

ধর্ম্মানুশীলনকারীর চিত্ত সর্ব্বদা শুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া, অসীম, ভূমা-শক্তি সহ স্থূলরূপে সংযুক্ত থাকে সুতরাং বিকৃতাবস্থাপন্ন খণ্ডশক্তি তাহাতে লয় ভিন্ন ব্যক্তক্রিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না; তাই প্রকৃত ধর্ম্মাচারীব্যক্তিগণ বেশ্যাসক্ত, স্ত্রৈণ এবং এমন কি পার্থিব কোন বিষয়েই অত্যাসক্ত হইতে সক্ষম হয়েন না।

যদিও খণ্ডশক্তি অসীম, ভূমা-শক্তি সহ সূক্ষ্মভাবে সংযুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে তথাপি অহংকারের বিকৃত শক্তির আশ্রয়ে

অবস্থিত হইয়া পরাধীনা। পরাধীনা বলিয়াই সাময়িকরূপে অসাম্যাবস্থায় অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। ভূমা-শক্তিতে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী অবস্থাদ্বয় বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জন্ম মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে।

কাষ্ঠখণ্ডের শুষ্কাবস্থায় সংযোগ কারণ শক্তি, কেন্দ্রানুকূল, আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন এবং ইহা অন্তর্মুখী অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। ক্রমে ইহা কেন্দ্রাভিমুখী আকৃষ্টা হইয়া যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, কাষ্ঠখণ্ডও মহা পঞ্চভূতে মিশিবার জন্য খণ্ড কারণশক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া সংযোগ শক্তির সেই পরিমাণ লয় সাধন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে অবশেষে মহা-পঞ্চভূতে লয় হইয়া যায়।

যে স্থান হইতে খণ্ড কারণশক্তি—সংযোগ কারণশক্তিকে অব্যক্তাবস্থায় পরিণত করিতে আরম্ভ করে, সেই স্থান হইতেই কাষ্ঠখণ্ডের কাঠিন্য লঘু হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে উভয়ের চরম ব্যক্ত ও অব্যক্তাবস্থায় অর্থাৎ খণ্ড কারণ শক্তির চরম ব্যক্তাবস্থা ও সংযোগ কারণশক্তির চরম অব্যক্তাবস্থা উপস্থিত হয়; তখনই অনন্ত পরমাণু অনন্তে মিশিয়া নামের অতীত অবস্থায় অনন্তে লয় হইয়া যায়।

এই অনন্ত পরমাণু সগুণ ব্রহ্মের স্পন্দনের স্থূল ব্যক্তাবস্থা। স্থূলাবস্থায় সংযোগ কারণ শক্তির বিকাশ হেতু স্পন্দনের স্থূল গতি শক্তি সংযোগিত হইয়া অনন্ত পরমাণু সংযোজিত হয় এবং ক্রমে স্থূলত্বের চরমাবস্থায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়।

কাষ্ঠখণ্ড অনন্ত পরমাণু দ্বারাই খণ্ড রূপে স্থূলভাবে প্রকাশিত। ইহাতে চৈতন্য সূক্ষ্ম অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া, সংযোগ কারণশক্তি প্রকাশকরতঃ কাষ্ঠের কাঠিন্য-রূপে ব্যক্ত হইতেছেন। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোই ব্রহ্মের গুণ এবং ইহাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকাশক ও ইহাই ব্যক্তরূপে শক্তি। ইহাদের সহিত সংযোজিতাবস্থায় তিনি নির্গুণ ও জগতপ্রকাশক।

কস্যচিৎ পাগলস্য।

——:0:——

দীনেশের স্মৃতি।

[৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের" সেবক-সম্প্রদায়ের অন্যতম সভ্য ছিলেন, গত ২৫শে আষাঢ় বুধবার বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুপাট কুতুবপুরে (নদীয়া) তাহার নশ্বর দেহের অবসান হয়। বয়স আনুমানিক ২০।২২ বৎসর হইয়াছিল। তাহার অকালমৃত্যু উপলক্ষ করিয়াই নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত হইয়াছিল।]

(১)

দীনেশ,

জনমের তরে ভাই লয়েছে বিদায়,
তাই বুঝি গুরুসনে গিয়েছিলে নদীয়ায়;
পুণ্যভূমি নদীয়ায় পূত রজঃ মাখি গায়;
অনিত্য মাটীর দেহ মাটীতে মিশালে,
ভাইরে দীনেশ! আজি কোথা চলি গেলে।

(২)

আজি ভাই মনে পড়ে অতীতের কথা,
তোমার কাহিনী যত স্মৃতিতে রয়েছে গাথা;
প্রথম যে দিন তোরে, দেখেছিনু মম ঘরে,
সেই দিন মন প্রাণ চুরী করেছিলি।
(আজি) না কয়ে বিদায় হয়ে প্রতিদান দিলি।

(৩)

অমিয় মূরতি তোর আঁকা হৃদিপটে।
হাসিমাখা মুখখানি চোখে ভেসে উঠে।
সরল, বিনয়, ধীর, অচঞ্চল মতিস্থির,
তোর মত আমাদের আর কেবা ছিল,
(জানিনা) অকালে জীবন তোর কেন যে ফুরাল!

(৪)

রূঢ়কথা একদিন শুনি নাই মুখে।
রেখেছ সকল কথা হাসি হাসি মুখে;
যুগ যুগান্তর হতে, আমি বাধা তোর সাথে,
পিতা মাতা ছেড়ে তাই মোর পিছু এলে,
পাছে এসে তুই ভাই আগে চলি গেলে।

(৫)

পরাণে পরাণ দিয়ে বেসেছিলি ভাল,
পলকের মাঝে ভাই সকলি ফুরাল;
কোথায় নরেন তোর, কোথা নরসিংবীর,
কোথা লক্ষ্মী, কোথা শৈল, সকলি ভুলিলি,
আসি বলে চলে গেলি আর না আসিলি।

(৬)

দেখিলে আমার দুঃখ ব্যথা ত পেয়েছ,
মোর বোঝা হাসিমুখে মাথা পেতে নিয়েছ;
দেখিলে দীনের দুঃখ, ফাটিত তোমার বুক
দীনেশ "দীনেশ" নাম করেছ সফল,
আজি রে তোমার সাথে ফুরাল সকল।

(৭)

সেদিনের কথা ভাই মনে পড়ে হায়,
"ওউনার"* পারে যবে দিনু রে বিদায়,
তোমার গলাটী ধরে, বলেছিলু কত করে,
কেবা বাচে কেবা মরে কে বলিতে পারে,
নিজগুণে তোরা সবে ক্ষমা করো মোরে।

(৮)

স্মরিলে বিদায়-কথা বুক ফেটে যায়,
কেন রে এমন কথা বলেছিনু হায়,
কালের কুটিল ফেরে, তুই ভাই গেলি সরে,
দুর্ম্মুখের দুষ্টবাণী ফলিতে চলিল,
একটী কুসুম আজ ঝরিয়া পড়িল।

(৯)

দেবতার ফুল তুই দেব কাজে গেলি,
দেহ দানে "আশ্রমের" মঙ্গল সাধিলি;
তোমায় হইয়ে হারা, ঠাকুর পাগলপারা,
তোর মত সেবানন্দ কেবা দিবে বল,
তোরে ছেড়ে প্রিয়নাথ হয়েছে বিকল।

(১০)

ছিল তোর মাখামাখি প্রিয়নাথ সনে,
একসূতে গাথা ছিলি পরাণে পরাণে;
আজি সে সূতাটী ছিড়ে, কেন রে পালালি দূরে,
সন্ধ্যসনে লুকোচুরী ভাল না দেখায়,
পালাসনে দীনেশ ভাই, আয় আয় আয়।

---

* "ওউনা" শান্তি-আশ্রমের পাদদেশ ধৌতকরতঃ আশ্রমের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

(১১)

নবদ্বীপ হ'তে তুমি ফিরিয়া আসিবে,
কত না সন্দেশ আনি প্রিয়মুখে দিবে;
আশাপথ পানে চেয়ে, প্রিয়নাথ আছে চেয়ে,
কিন্তু বিধি একি হায় কি বাদ সাধিল;
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথায় হানিল;

(১২)

"শান্তি-আশ্রমের" তুই ছিলি ফোটা ফুল,
সহাস্য আনন সদা প্রেমে ঢল ঢল;
সলজ্জ বিনম্র দৃষ্টি, কত যে লাগিল মিষ্টি,
এই কথা কত দিন ঠাকুর বলেছে,
আজি ভাই তোর সনে সব ফুরায়েছে।

(১৩)

চিদানন্দ ভাই আর বোধানন্দ সনে,
জনমের শেষ দেখা ছিল তোর মনে,
গুরুপাটে গিয়ে তাই, কাছে রেখে গুরুভাই,
হাসিমুখে গুরুপদে লয়েছ বিদায়
তোর মত পুণ্যবান্ কে আছে ধরায়।

(১৪)

গুরু-কোলে মাথা রেখে গুরুপদ দেখে;
ফুরালে জীবন-লীলা আঁখির পলকে,
অতি শ্রান্ত হয়েছিলি তাই দেরী না করিলি
গুরুপাটে গুরু-পদে শুয়েছ রে ভাই,
তোর সম ভাগ্যবান্ আর দেখি নাই।

(১৫)

শ্রান্ত দেহলতা তোর ঢলিয়া পড়েছে হায়,
যাও তবে, হাসি মুখে দিতেছি বিদায়;
আনন্দকাননে গিয়ে, শান্তি-সুধা জল খেয়ে,
ক্লান্ত দেহলতা তব লভুক বিরাম,
শ্রীগুরুচরণে মিশে করগে আরাম।

(১৬)

দীনেশ,

কিন্তু ভাই এ দীনের আছে এই সাধ,
তব সম গতিলাভে করো আশীর্ব্বাদ,
কর্ত্তব্য সাধিয়ে ভাই, যেন হেসে চলে যাই,
গুরুনাম নাহি ভুলি জীবনে মরণে,
অনন্ত-সমাধি লভি শ্রীগুরু-চরণে।

—:০:—

প্রেমে-সমাধি

৫ম পরিচ্ছেদ।

পাঠক, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের যুবককে বোধ-হয় চিনিতে পারিয়াছেন; যুবক কৃষ্ণধন। কৃষ্ণনগরে বাসা করিয়া থাকে ও কলেজে অধ্যয়ন করে। পূর্ব্বে যে স্বপ্ন ও ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা তাহার এই বাসাবাড়ীতে ঘটিয়াছিল। এখন সে কৃষ্ণধন আর নাই, সে নাস্তিকতা ও পরলোকে অবিশ্বাস কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ব্যাকুলতা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কলেজের ছাত্রমণ্ডলী তাহাকে বড় ভালবাসে। পূর্ব্বে কেবল ভালই বাসিত, এখন সে

ভালবাসায় আবার ভক্তির সংযোগ হইয়াছে। কৃষ্ণধন বড় সুন্দর। সেই সৌন্দর্য্যেই অনেকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই সৌন্দর্য্যপিপাসু। কেন যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আকৃষ্ট হই তাহা জানি না; ভগবান্ বড় সুন্দর, তাঁহার সেই মধুময় সৌন্দর্য্যের এক বিন্দুর বিকাশে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সৌন্দর্য্যেই মাধুর্য্যের বিকাশ; মাধুর্য্যকে আমরা সকলেই বুকে জড়াইয়া রাখিতে চাই, তাই সৌন্দর্য্যকেও বড় ভালবাসি; নিজের অজ্ঞাতসারে সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমাদের প্রাণ স্বাভাবিকই বড় মধুময়,—বড় কোমল; সংসারের কালিমা-বিহীন করিয়া রাখিলে চিরকালই মধুময় থাকে, তাই শৈশবকাল ও শিশু বড় মধুর, বড় প্রাণারামদায়ী। সেই শৈশবকালকে যে যৌবন ও বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত রাখিতে পারিয়াছে, যে চিরকাল শিশুর মত কোমল হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তাহার প্রাণ বড় মধুময়। দুই বস্তুর সমান আকার ও সমান প্রকৃতি হইলে একে অন্যকে আকর্ষণ করে। সৌন্দর্য্য মধুময় আমাদের প্রাণও মধুময়। অজ্ঞাতসারে তাই আমাদের মন সৌন্দর্য্যের প্রতি ধাবিত হয়; বস্তুতঃ যার প্রাণ যত মধুর—যত সরল—যত শিশুর মত কোমল সে তত সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট।

কলেজের ছেলেরা কৃষ্ণধনের প্রতি সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি কিসে হইয়াছিল, জানিনা; তবে এই মাত্র বলিতে পারি তাহারা কৃষ্ণধনকে বড় ভালবাসিত।

আজ শনিবার, কলেজ সকালে ছুটী হইয়াছে। কোনও বন্ধুর বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কৃষ্ণধন আজ তাহাদের বাড়ী গিয়াছে।

কৃষ্ণধন তাহাদের বাড়ীতে বসিতেই, কৃষ্ণনগর স্কুলের একজন শিক্ষক তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শিক্ষকটীর, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তিনি নিজে কোন জাতি তাহা বুঝিবার যোগাড় নাই। আমরা জানিতাম যে যজ্ঞোপবীত না দেখিয়াও ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিক্ষক মহাশয়ের মুখে, চোখে, বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এমন কোনও চিহ্ন পাইলাম না যদ্দ্বারা অনুমান করিতে পারি যে তিনি ব্রাহ্মণ; অধিকন্তু যজ্ঞোপবীত দেখিবারও সুবিধা পাই নাই, কারণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে একটী ময়লা দুর্গন্ধবিশিষ্ট অঙ্গরাখা ছিল। তাঁহার নাম তিনকড়ি বন্দোপাধ্যায়। এই বাড়ীতে থাকিয়া দুই একটী ছাত্রকে 'প্রাইভেট' পড়ান ও স্কুলে মাষ্টারী করেন। কৃষ্ণধন বসিবামাত্রই তাহাকে তিনি প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। —বাপু হে, তোমরা এত ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর কেন বল দেখি? কৃষ্ণধন নিরীহ ভাল মানুষের মত কহিল,—কেন মহাশয় ধর্ম্মই তো জগতে সার জিনিষ, সেই ধর্ম্মকে ফেলিয়া অসার সংসারে মজিয়া থাকা কি মানুষের কর্ত্তব্য?

মাষ্টার,—অত বুঝি সুজি না, ধরিতে গেলে তোমাদের ছেলে মানুষই বলিতে হইবে; এই অল্পবয়সে তোমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্ম করাটা কি অস্বাভাবিক নয়? আর কথাই তো আছে,—পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ",—পঞ্চাশ বৎসরের পরে, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। আর তোমরা কি না এই ছেলে বয়সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পরিয়াছ।

এটা কি দোষের নয় ?

কৃষ্ণ,—বলিতে পারেন দোষের, কিন্তু মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ প্রশ্নের আশা আমি করিতে পারি নাই। মহাশয় বোধহয় ব্রাহ্মণ; আর ইহাও বোধহয় জ্ঞাত আছেন যে ব্রাহ্মণ কুমারের অষ্টম বৎসর বয়সেই উপনয়ন হইয়া থাকে। যে বেদ ও প্রণবের অধিকার অন্য কোন জাতি বৃদ্ধ বয়সে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়াও লাভ করিতে পারে না, তাহা অষ্টম বর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার অনায়াসে লাভ করে। ইহাও জানেন ব্রাহ্মণ দ্বিজ, এক জন্ম নশ্বর জগতে পদার্পণ, আর অপর জন্ম ধর্ম্মের জগতে প্রবেশ। ব্রাহ্মণকুমার আশৈশব ধার্ম্মিক,—জিন্মিয়াই ধর্ম্মের সোপানে পদার্পণ করে। তবে আমরা বিংশতি বর্ষ বয়সে, ব্রাহ্মণকুমার হইয়া আমাদের কর্ত্তব্যের পথে একটু ধাবিত হইব তাহা কি দোষের ? যৌবনকালে মনের যে শক্তি যে তেজ ও যে ক্ষমতা থাকে, বৃদ্ধকালে কি তাহা সেই রূপ থাকে ?

যে বিরাট ভগবানের নিরাকার চৈতন্যময় স্বরূপ যৌবনকালের প্রস্ফুটিত মস্তিষ্কের ধারণা করাই সুকঠিন, তাহা জরাজীর্ণ বৃদ্ধের শীর্ণ মস্তিষ্ক কি প্রকারে ধারণা করিবে ? প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল পুষ্পের যে মনোরম সৌরভ, তাপক্লিষ্ট মলিন শুষ্ক কুসুমে কি সেই প্রকার সৌরভ সম্ভবে ? আপনার কথায় আমি সুখী হইতে পারিলাম না। আরও, বড় দুঃখের বিষয় আপনি ব্রাহ্মণসন্তান, আপনার মুখে আমাকে এরূপ কথা শুনিতে হইল ! ব্রাহ্মণ শিশু ধার্ম্মিক হইবে, ব্রাহ্মণশিশু ব্রাহ্মণ হইবে;—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে, এটা প্রশংসার বিষয় নহে। ব্রাহ্মণকুমার যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করে, তবে কর্ত্তব্যের অবহেলাজনিত তাহার মহাপাপ হইবে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তাহার নরকেও স্থান নাই।

মাষ্টার মহাশয় তখন বেগতিক দেখিয়া একটু নরম সুরে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন—আজ কাল ছেলেদের সঙ্গেও পারিয়া ওঠা দায়, কি লম্বা কথা ! যেন ওঁরা একেবারে ধর্ম্মটা 'একচেটে' করিয়া লইয়াছেন। তা, বাবা, তোমরা ধর্ম্ম করিবে তা' কর। কিন্তু পাঠাবস্থায় এইটা কি ভাল ? একটা সময় অসময় আছে তো ?

কৃষ্ণ। ধর্ম্মের জগতে আবার সময় অসময় কি ? যখনই সে ভাব উদিত হইবে তখনই সময়,—তখনই অমৃতযোগ,—তখনই মাহেন্দ্রক্ষণ। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যখন আমার সে ভাব জাগিয়াছে, তখন আর চাই কি ? সমস্ত জগতও যদি আমার বিপক্ষ হয়, আমি সহস্রলোকের বাধাবিঘ্নকেও চরণ ঠেলিয়া হুহুঙ্কার করিয়া বলিব,—ধর্ম্ম আমার দেহ, ধর্ম্ম আমার মন, ধর্ম্ম আমার প্রাণ; আমি ধর্ম্মের, ধর্ম্ম আমার।

মাষ্টার।—আচ্ছা বাপুহে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তো খুব লম্বাকথা বলিতেছ; গায়ত্রীটা মনে আছে তো ? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া তো বড় লম্ফঝম্প আরম্ভ করিয়াছ,—জিজ্ঞাসা করি,—ত্রিসন্ধ্যাটা পড়া হয় কি ? মদ মাংসে দেশ প্লাবিত, কুক্কুট মাংস ছাড়া বাবুদের আহার হয় না ! এরা আবার ব্রাহ্মণ !

কৃষ্ণ।—দেশের দুর্ভাগ্য, মা আমার এমন ব্রাহ্মণ সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন। কিন্তু

মাষ্টার মহাশয়, দেখিতে গেলে, মদ্য-মাংসের ভিতর দিয়াও ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। ব্রাহ্মণত্ব মনে,—আমার প্রাণ ব্রাহ্মণ,—আমার আত্মা ব্রাহ্মণ। আহারে মন গঠিত হয়, তাই সাত্বিক আহার ব্রাহ্মণত্ব লাভের পথে সহায়। মদ-মাংস না খাইয়া চলিলেই ভাল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, আমাদের শাস্ত্রটা একটা পশারী দোকান। দোকানী যেমন সকল জিনিষই রাখে, কোন গ্রাহকই প্রায় ফিরিয়া যায় না; সেই রূপ আমাদের এই বিশাল হিন্দু-শাস্ত্র গ্রাহক ফিরায় না। মাতাল আসিয়া বলিল, মদ ছাড়িতে পারিব না, কিন্তু ধর্ম্ম-চাই। আমাদের শাস্ত্র কহিল, পাইবে, এখানে আইস। হিন্দুশাস্ত্র বলে, যে যাহা আছে তাহাই থাকুক, সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহাকে ধর্ম্মের জ্যোতি দেখাইয়া দিব। ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানুষ, একটা পথ করিলে চলিবে কেন?

আর ত্রিসন্ধ্যার কথা বলিয়াছিলেন। কি জানেন মাষ্টার মহাশয়, একটু উপরে উঠিলে, ব্রাহ্মণ আর ত্রিসন্ধ্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। ব্রহ্মের চন্দন-শীতল অঙ্গের বাতাস পাইয়া ব্রাহ্মণ তখন কেবল 'ত্বংহি' 'ত্বংহি' করে। তার নামে প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়। তখন আর কেবল তিনবার সন্ধ্যার কথা মনে থাকে না প্রতিক্ষণে 'ওঁ' কারের ভিতর দিয়া বেদের মধুর ঝঙ্কার বাজিয়া ওঠে। ব্রাহ্মণ তখন শয়নে স্বপনে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সন্ধ্যা করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এ অবস্থা লোকের না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যা পড়িতে হইবে, না পড়িলে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইবে। অনেকে আবার আপত্তি করেন "অর্থ বুঝি না ছাই ও পড়িয়া কি হইবে?" আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—ভারতে কি এমন লোক নাই যে সন্ধ্যার অর্থটা করিতে পারে? এখনও অনেক আছে। ইচ্ছা করিলেই অর্থ পাওয়া যায়। কি বলেন মাষ্টার মহাশয়, আপনি সন্ধ্যার অর্থ করিতে পারেন না?

মাষ্টার। তা,—তা,—তা পারি বৈ কি। তা আর পারি না!

মাষ্টার মহাশয় কৃষ্ণধনের কথা শুনিয়া বাস্তবিকই বড় খুসী হইয়াছেন। কিন্তু সন্ধ্যার অর্থের কথা জিজ্ঞাসা করাতেই যেন কেমন হইয়া গেলেন। হা, দুরদৃষ্ট তোমার ভারতবর্ষ, তুমি না ব্রাহ্মণের দেশ, বেদের অর্থ ইংরাজের মুখ দিয়া না বাহির হইলে, তোমার সন্তান আজ তাহা বুঝিতে পারে না!

কৃষ্ণধন যে ছেলেটীর বাসায় আসিয়াছিল, তাহার নাম জীবনকুমার। কৃষ্ণধনের সমবয়সী, ও তাহাকে বড় ভালবাসে। আমোদ প্রমোদে অনেকক্ষণ কাটাইয়া জীবনকুমার কৃষ্ণকে বিদায় দিল।

কৃষ্ণধন মধুরকণ্ঠে গাহিয়া চলিল,—
তার তরে কার কাঁদে সদা প্রাণ,
তার গাথা কে গো গায়,—
সে আজ ডেকেছে মধুর আহ্বানে,
তোরা আয়,-তোরা আয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

——:0:——

সাধক-সঙ্গীত।

[৭]

বল্ বল্ ও পাষাণের মেয়ে।
তাতেও আমি ভয় না করি,
কেবল এই আক্ষেপে মরি,
কাল-ভয়-হারিণী নাম তোর,
বিফল হ'ল মোরে দিয়ে॥
দশ শতদলে তুমি, অসতের দলে আমি,
ভ্রমি ভ্রমি ভূমিতলে, পড়ি ভ্রমি হয়ে,—
ঘুচাইতে ভবে আসা
পুনরায় উঠিতে আশা
কিন্তু বাবা দিগ্‌বাস আমারে—
উঠ্‌তে বলেন সুধা খেয়ে॥
নিজে মহাবিদ্যা তুমি, পিতা মহাবিদ্যার স্বামী,
তবে কেন রই মা আমি অবিদ্যায় মাতিয়ে;—
পিতা কুলের চূড়ামণি—
তুই যে কুল-কুণ্ডলিনী
তবে কেন গোবিন্দ তোর—
অকুল ভবে যায় ভাসিয়ে॥

———:০:———

মা ও তাঁহার স্নেহ।

করুণাময়ী বিশ্ব প্রসবিনীর ত্রিবিধ খেলার মধ্যে দুইটী খেলার সঙ্গে এই দৃশ্যমান জগৎ আজ পরিচিত; একটী স্থূল অপর সূক্ষ্ম। তৃতীয় খেলা পরামূর্ত্তি। এই পরা-মূর্ত্তির খেলা জগৎ দেখিতে পায় না; জগৎ তাহার ভোগসুখ-কল্পনা করিতেও অক্ষম। স্থূলখেলা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসার; সূক্ষ্ম খেলা পঞ্চ মহাজ্ঞানেন্দ্রিয়গম্য আত্মবোধ; আর পরা খেলা অতীন্দ্রিয়,—'তত্ত্বমসির' সেই তৎপদ বাচ্য নিত্য শুদ্ধ মুক্তাবস্থা। তাই যোগিগণ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সহিত এই পরম মহৎ খেলাত্রয়ের তুলনা করিয়া

মহাশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন স্থূল—জাগ্রত, সূক্ষ্ম—স্বপ্ন ও কারণাবস্থা—সুষুপ্তি।

স্থূল সংসার পঞ্চমহাভূতময় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য-হেতু বিপরিণামধর্ম্মী,—সূক্ষ্মাবস্থা চিন্তনীয় বলিয়া মানসপ্রত্যক্ষ, উপচয় অপচয় ছায়াময়ী; আর পরামূর্ত্তি অতীন্দ্রিয় জন্য অবাঙ্মনস গোচর। বিপরিণামধর্ম্মী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্থূলসংসার যেন মায়ের পাঞ্চভৌতিক দেহ, শুদ্ধ জ্ঞানৈক-গোচর চৈতন্যময় সূক্ষ্মাবস্থা যেন সেই দেহে জীবাত্মা, আর বিকারপরিবর্জ্জিত, নিষ্কল সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অতীন্দ্রিয় পরামূর্ত্তি যেন মায়ের পরমাত্মা। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মহিমময়ীর সেই আনন্দরাজ্য হইতে বহুদূর অন্ধ কারাগারে আবদ্ধ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার দৃঢ় উচ্চ শৈলমালা প্রাচীর পরিবেষ্টিত সৌধ-তোরণ দ্বারে প্রতিহত; কেবল পরামূর্ত্তির মলয় হিল্লোল আবার করুণাময়ী মায়ের চূর্ণ-কুন্তলচুম্বিত চরণসরোজের পরাগভার শিরে বহন করিয়া দিগন্তের মহাশূন্য-গর্ভ বিশাল নিভৃতরাজ্যে চিরপ্রবাহিত। দেহ সম্বন্ধ-শীল বিপরিণামধর্ম্মী পাঞ্চভৌতিক এই ব্রহ্মাণ্ড-বপুতে অবাঙ্মনসগোচর সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণী আদ্যাশক্তি সচ্চিন্ময়ী অম্বিকার সূক্ষ্ম ও পরা অবস্থারূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অধিষ্ঠান কালে, পূর্ণ প্রকটলীলা বিলাসময় যে সকল ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়—তাহাই যে মহামায়ার দশ মহাবিদ্যা মূর্ত্তি, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সংসার-খেলা আরম্ভ করিলেই আমার সেই চির নিথর, নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ মাতৃহৃদয়-সাগরে যদি এত ভাবতরঙ্গের উদ্ভব সম্ভব হয়, তবে মোহ-ঝটিকা সংক্ষুব্ধ মায়া-পবন-সন্তাড়িত তুমি আমি অচিরস্থায়ী চঞ্চল ভবজল বুদ্বুদের যে সাময়িক ভাবছায়ার হস্তহইতে অব্যাহতি আছে ইহা অসম্ভব। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রখর সৌরকর-মালায় সমুদ্ভাষিত সেইজলে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বুদ্বুদ তুমি, তোমার ঐ বায়ুগর্ভ ব্যষ্টি ক্ষুদ্রত্বের তামস-বিন্দু সেই অপার অনন্ত অপ্রমেয় জলসহ সৌরকিরণে নিমজ্জিত করা ভিন্ন আর কোথায় লুক্কায়িত অথবা প্রকাশিত করিবার স্থান আছে? সংযোগ বিয়োগ, বিচ্ছেদ মিলন, ঘাত প্রতিঘাত আমার লীলাময়ী মায়ের সংসার খেলার চিরন্তন প্রথা; তুমি আমি সেই প্রথা রক্ষা করিতে অপারগ ও অনিচ্ছুক হইলেও বাধ্য। প্রথা স্থাপন না করিলে মায়ের আমার খেলা করা হয় কৈ? মায়ের খেলায় যদি আপত্তি না থাকে, তবে এ খেলার প্রথায় এত আপত্তি অসন্তুষ্টি, অনিচ্ছা কেন? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার প্রতিকূলে ইচ্ছা প্রকাশ করিও না, তোমার ক্ষুদ্র বাসনা শবাসনার বাসনাস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে চলিয়া যাও, সসীম প্রেম-যোজক অসীম অনন্ত চরণ চুম্বন করিয়া রত্নাকর নামে অভিহিত হউক।

তোমার আমার মনোমত নয় বলিয়া এই সুখদুঃখময় খেলায় তোমার আপত্তি। বেশ, আপত্তি কর দেখি? এ সংসারস্রোত বিপরীত দিকে ফিরাও দেখি? যদি তাহাতে অক্ষম হও তবে নির্ব্বাকে ইহা ভোগ কর, পোড় খাইয়া খাঁটী সোণা হও। অত বড় তেঁতুল গাছে চিড়ার মত ছোট ছোট পাতা তোমার ভাল লাগিল না, তা বলিয়া কি

করা? কে এখন তেতুল গাছ মান পাতায় পল্লবিত করিয়া তোমাকে দেখাইবে! আর দেখাইলেই বা তোমার তাহাতে উপকার অপকার কি? এ সমস্ত বাহিরের খোলস; সুখদুঃখ, বিচ্ছেদমিলন বাহিরের খোলস, বাড়ী আর বাড়ীর কর্ত্তা কিছু এক জিনিষ নয়। বাহিরের খোলসে তোমার প্রয়োজন? সংসারে যখন আসিয়াছ, তখন এখানকার নিয়ম যেমন দেহধারণ হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি সেইরূপ অবস্থার গুণও সুখদুঃখ সংযোগবিয়োগ ইত্যাদি; তাহাতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? সংসারে জন্মিবে তুমি আর নিয়ম রক্ষা করিবে গৌরীসেন? এ কেমনতর কথা? যাহার স্বামী মরে সেই একাদশী করিবে—একাদশীতে আপত্তি থাকিলে আর্য্যরমণী না হইলেই হইত—বিবাহ না করিলেই হইত—স্বামীকে মরিতে না দিলেই হইত,—অথবা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ—স্বামী মরিয়া শেষে বিধবা করিয়া রাখে এরূপ অকিঞ্চিৎকর নারীজন্ম গ্রহণ না করিলেই হইত। নারীজন্মে যদি তোমার হাত না থাকে তবে তাহার সংস্পর্শে উৎপাদিত ভোগেও তোমার হাত নাই; এখন ধীর, স্থির, অচঞ্চল ভাবে তাহার ফলাফল ভোগ কর এবং সেই দাবদাহের ভিতর হইতে তারস্বরে তাঁহাকে সরল ব্যাকুল ভাবে ডাকিতে থাক, তবেই তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, তবেই তাঁহার প্রতি তোমার গূঢ় দৃষ্টি প্রকাশ পাইবে; এইজন্যই তো অন্ধকারের সৃষ্টি, সুখময়ের সুখরাজ্যে নিত্য হাহাকার ধ্বনি। সংযোগ বিয়োগ সংসারের ধর্ম্ম। একদেশ প্রকাশক উপমান ও উপমেয় তাবৎ অবস্থার সম্যক্ পরিস্ফুরণে অসমর্থ; উপরোক্ত উদাহরণে কেবল জগতপ্রসূতির জগৎ সৃষ্টিবাসনার বিরুদ্ধে আমাদের দুর্ব্বল-হৃদয়-সঞ্জাত ক্ষুদ্র বাসনা যে কতদূর অকৃতকার্য্যকারী তাহাই প্রকাশ স্থলে ব্যবহৃত হইল। পক্ষান্তরে সংযোগবিয়োগ নামে জগতে বাস্তবিক দুইটী অবস্থা আছে কিনা ইহা বড়ই বিচারসাধ্য। দৃশ্যতঃ থাকিলেও তাহাতে যে আমাদের আবশ্যকতা কেন আছে, তাহার উত্তর মা জানেন। তবে মায়ের প্রতি যাহার ভালবাসা আছে, যিনি মাকে মা বলিয়া চিনিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া সরল ব্যাকুল অন্তরে কাতরকণ্ঠে লোক-চক্ষুর জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়ত যিনি প্রাণে প্রাণে মাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে পারেন, কাঁদিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার এ সম্বন্ধে কিছুই বিচার্য্য নাই; তিনি প্রতিকার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট আনন্দে ও তীব্র শোকে মায়ের বিভিন্ন রকমের দুইটী প্রকট মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে বিভোর হন, মাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ধরিয়া ফেলেন। তিনি প্রতিকার্য্যে মায়ের খেলা দেখেন, প্রতি ব্যাপারে মায়ের প্রকাশ্য ব্যবস্থা দেখেন, মায়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতেছে চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত রিপুদলের সম্মুখে আত্মানন্দ ভোগ করেন। তিনি নিজ কৃতিত্ব, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অবস্থা, সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুরাগের কুসুমদামে ঐকান্তিক নির্ভর-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃচরণে প্রেমাঞ্জলী দান করতঃ নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপের দাবদাহ ক্ষতহৃদয়ে করুণাময়ীর শান্তোজ্জ্বল কোমল শীতল হস্ত মার্জ্জনায়

আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন; তুচ্ছ মনুষ্য-প্রেম, মনুষ্যপ্রীতি, মনুষ্যের বিরহমিলন সেই মহাপুরুষের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর—অতি তুচ্ছ। তিনি জানেন প্রেমের যাহা উৎস—প্রীতির যাহা অফুরন্ত সুখ প্রস্রবণ, বিরহমিলনের যাহা, চিরবিশ্রামবারিধিগর্ভ, তাহাই মাত্র আকণ্ঠ পিপাসিত সংসারদগ্ধ আত্মার লোভনীয়; তাহাই মাত্র সংসার অপার-জলধি-গর্ভে একমাত্র দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। তিনি জানেন সন্তান শত অপরাধী হইলেও পিতামাতার অপরিত্যজ্য। তিনি বলিবেন "আমার আগমনের কত পূর্ব্বে জানিন (বহুপূর্ব্বে হয়তঃ বা জননীর শৈশব সময়েই) যে মা আমাকে পুত্ররূপে কামনা করিয়াছেন, যে মা গর্ভে ধারণ করিয়া আমার বর্ত্তমান আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সম্বন্ধ সূত্র সংস্থাপন হইবার বহুপূর্ব্বে কোন এক বিঘোর অন্ধ নরকে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছেন, যে মা আজ ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, রোগে আরোগ্য, বন্ধনে মুক্তি, বিপদে ধৈর্য্য, ব্যাকুলতায় আশা, শোকে শান্তি দান করিয়া আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন, আমাকে লালন-পালন করিতেছেন সে মা কি আমার পর? সে মা কি রাক্ষসী? সে মা কি আমার শত্রু? সে মা কি এত দিন পরে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আশুপ্রাণঘাতীহলাহল বিষ আমার হাতে দিতে পারেন? যিনি প্রতি-নিয়ত আমার ধূলি ধুসরিত অঙ্গযষ্টি নিজ স্নেহাঞ্চলে মুছাইয়া দিতেছেন, যিনি ভালবাসার,—প্রেমের,—সৌন্দর্য্যের,—ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বাৎসল্যের শান্তিময় তৈল ধারায় আমাকে অভিসিঞ্চিত করিতেছেন, তিনি কি আমার হৃদয়ের পরতে পরতে আগুণ জ্বালাইয়া দিয়া তামাসা দেখিতে পারেন? আমাকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষেপ করিয়া পলায়নপরা হইতে পারেন? তাহা কখনই সম্ভব নয়। যে তাহা মনে করে জানিতে, হইবে মাতৃত্বে তাহার অবিশ্বাস আছে; এ বিশ্ব সংসার যে মায়ের নিজহস্ত রচিত তাহাতে তাহার সন্দেহ আছে, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রীর কার্য্য প্রণালী ভ্রমসঙ্কুল এই ধারণা আছে। তবে একটী কথা আছে—যে মা এত স্নেহ মমতা করিয়া থাকেন, যে মা নিজে উলঙ্গ থাকিয়াও (মাতৃস্নেহের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্যই বোধহয়) তোমার আমার লজ্জা নিবারণ ছলে দিব্য বেশভূষায় (মনুষ্য পরিচ্ছদে) এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন, সন্তান যাহাতে লোকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এই আশায় পরাবিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) শিক্ষা দিতেছেন, যে মা নিজে স্বামীসহ শ্মশানবাসিনী হইয়াও তোমাকে আমাকে "সোঽহং" সৌধমালার অধিকারী করিয়াছেন, সে মা তোমার আমার দুর্ব্যবহারেও কি কোন শাসন করিবেন না? সন্তানের অবাধ ক্রতপতন দেখিয়াও কি তাড়না করিবেন না? তাহাই কি তাহার মাতৃত্বের পরিচায়ক নহে? নিশ্চিন্ত থাকিলেই কি সন্তানের প্রতি মায়ের যাবতীয় কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করা হইত? এই শাসন কি অন্যায়? ঐ শাসনের মূলে কি সন্তানের প্রতি বাৎসল্যপূর্ণ পূর্ণদৃষ্টি লক্ষিত হইতেছে না? যদি থাকে তবে নিরাশ হইও না; হতাশের কোলে মস্তক রাখিয়া বিঘোর অজ্ঞান সুষুপ্তিতে আত্মাকে বিমোহিত রাখিও না। মাতৃইচ্ছার বিরুদ্ধে নিষ্ফল আত্মমত পরিচালন

করিও না, মায়ের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দাও। সন্তানের উন্নতিকল্পে মায়ের আকাঙ্ক্ষাময় শাসন পূর্ণ হইতে দাও। মা যে যন্ত্রনা দিতেছেন তাহা কি বড়ই তীব্র? বড়ই কঠোর? তাহা কখনই না। এই কঠোরতা, এই তীব্রতা উপলব্ধির পূর্ব্বে একবার চিন্তা কর তুমি কত ক্ষুদ্র, মা কত মহীয়সী. তুমি কত দুর্ব্বল, মা কত বলসম্পন্না—মা আমার রাজরাজেশ্বরী, তাই তাঁহার হাতের মুষ্টিদান তোমার রাখিবার স্থানাভাব, তাই তুমি পর্ব্বতের উপর উঠিয়া তবে তাহার কতকাংশ দেখিতে পাও—তাঁহার অঞ্চলের এতটুকু বাতাস তোমার পৃথিবী ব্যাপিয়া চিরপ্রবাহিত—তাঁহার দাপটে কত কত সৌর-জগৎ চূর্ণীকৃত; তাঁহার প্রদত্ত এক অঞ্জলী জল তোমার সপ্ত-মহাসমুদ্র প্লাবিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে উচ্ছ্বসিত প্রলয় জলে বসুধা মুহুর্মুহু নিমজ্জিত। মায়ের হাতের সামান্য দান যেরূপ অজস্র, অনন্ত, অপ্রমেয়—মায়ের হাতের যৎসামান্য সাজাও তাই এত তীব্র—এত কঠোর। বাস্তবিক মা তোমাকে এত সাজা দেন নাই, যত তুমি কাতর! অত অত্যাচার করেন নাই, যত তুমি মর্ম্মাহত! ভালদান লইবার সময় তো আর "চাই না" বলিয়া নিরস্ত হও না, "এত দিয়াছ" বলিয়া এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না; তবে সাজার সময় "আর পারি না" বলিয়া এত রোল উঠাও কেন? হৃদয়জুড়া ধন দিয়া কাড়িয়া লইলেন বলিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে নিজে কাঁদিয়া কাঁদাও কেন? মায়ের নিকট তুমিই কেবল ধন পাইবার অধিকারী? না আর কেহ কিছু চাইতে পারে? যদি পারে, তবে তাহার কথা ভুলিয়াও একবার বল না কেন? নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও যোগ করিয়া দেও না কেন? মায়ের নিকট হইতে ভাল মন্দ জিনিষ লইবার সময় তোমারই কি কেবল একচেটিয়া অধিকার?—অবাধ দখল! যদি তাহা না হয় তবে তাহার অবস্থা চিন্তা করিয়াও না হয়, দু' কথা বলিলে তোমার ক্ষতি কি?—যদি বলিবার অধিকার কিছু জন্মিয়া থাকে তবে মা তোমার কথা শুনিবেন। সহজে না শুনিলে নদীতীরে এরূপ নীরব—নিস্তব্ধ-নৈশবায়ু বেপমান পল্লব-স্বননের সহিত অন্ধকার বিজড়িত রজনীর কোলে মস্তক রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া দীর্ঘ উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে পাগলের মত প্রলাপ বাক্যে মা মা বলিয়া কান্দিতে থাক! কাঁদ আর বল, মা আমরা তোমার সন্তান—তোমার বন্ধ্যা-দোষনষ্টসূচক পুত্র স্থানে অধিষ্ঠিত—আমাদিগকে রক্ষাকর মা, যে পথে দাড়াইলে তোমার আনন্দ রাজ্যে পহুঁছিতে পারি সেইপথে পরিচালিত কর মা! আমাদের শক্তি নাই, ভক্তি মলিনা, একাগ্রতা বড়ই দুর্ব্বল—প্রাণে ভক্তি দে মা! একাগ্রতার উত্তেজক মাদকতায় মস্তিষ্ক পূর্ণ কর মা! যদি সক্ষম হও, তবে মাতৃ নামে অভিমন্ত্রিত বিবেকের ব্রহ্মাস্ত্র হৃদয় শরাসনে সংযোগ করিয়া স্থির, ধীর, অচঞ্চল ভাবে একবার মায়ের চারু চরণ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ কর। মা-নাম জগৎ বশীকরণ মহামন্ত্র। মহাশক্তির সন্তান আমরা, মোহমার্জ্জারের ভ্রূকুটীতে ভীত হইব কেন? যদি সময়, সুযোগ ও সংসর্গ অভাবে হৃদয় দমিত হইয়া থাকে—যদি অজ্ঞান, অবোধ

হও, তাহা হইলেও ভীত হইবার কারণ নাই—আইস আধজড়িত জিহ্বায়—আধ জড়িত কণ্ঠে—আধ জড়িত ভাষায় একবার আমরা সেই ভাবে—সেই স্থানে—সেই মনে মা বলিয়া ডাকি। সেই দুই দেহ একত্রীভূত করিয়া তোমার অর্দ্ধেক ও আমার অর্দ্ধেক দিয়া মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই। প্রতি পদার্থেই মায়ের বিভূতি-অঙ্কন দেখিয়া একবার পূর্ণ আবেগভরে তাহা দৃঢ় বদ্ধমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলি; সঙ্গে সঙ্গে মা, মা বলিয়া ডাকি,—মা, মা বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেই। কাঁদিবার ভাষা আমাদের মা শব্দ হউক; কাঁদিবার ডাক মা-ময় হউক, প্রার্থনা মা হউক, মায়ের সন্তান প্রাণ ভরিয়া বলি মা, মা, মা।

শ্রীতারাক্ষেপা।

—0—

রাস-পূর্ণিমা।

আজ কার্ত্তিক-পূর্ণিমাতিথি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। যিনি "পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" গীতার এই মহাবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিবার জন্য—প্রেমে জীব-জগৎকে মাতাইবার জন্য, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী রজনীর ঘোর দুর্য্যোগে কংশকারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—আজ সেই প্রেমময় প্রেমস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। আজ তিনি বালক নন, যুবা নন, বৃদ্ধও নন, আজ তিনি কিশোর; আজ কিশোর কিশোরীর প্রেমের মিলনের প্রথম দিন। আজ সেই মধুর—অতি মধুর রজনী, যে রজনীর নিশীথকালে যমুনাপুলিনস্থিত নিকুঞ্জকানন হইতে উত্থিত রসিকসাগর রসশেখর কালাচাদের বংশীধ্বনি শ্রবণকরতঃ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া—কুলমান বিসর্জ্জন দিয়া—পতি পুত্র ভুলিয়া, এমন 'কি আমার আমিত্ব', পর্য্যন্ত ভুলিয়া মধুলুব্ধ ভ্রমরীর ন্যায়—অদূর নিঃসৃত বংশীধ্বনি, শ্রবণমুগ্ধাহরিণীর ন্যায় ব্রজগোপীগণ বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা হইয়া বংশীধ্বনি লক্ষ্যকরতঃ উর্দ্ধশ্বাসে নিকুঞ্জকাননাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন—ব্রজগোপীগণ প্রেমের জলন্ত দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন—বৃন্দাবন প্রেমসাগরে ভাসিয়াছিল;-আবার বেশীদিনের কথা নয়, সেদিনকার কথা,—যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়া প্রেমাবতার গোরাচাঁদ, প্রেমের রাজা নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া—ত্রিতাপদগ্ধ জীবদুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া প্রেমের স্রোতে নদীয়া, নদীয়া নয় সমগ্র বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন—জগাই মাধাইর মত কতশত পাষণ্ড নাস্তিককে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে হরিনাম সুধা বিলাইয়া কলির জীবের প্রেমরাজ্যে পহুঁছিবার সুগম পন্থা দেখাইয়াছিলেন,—যে পন্থা অবলম্বন করতঃ যবন হরিদাস ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ঘৃণিত বারবিলাসিনী রমণী প্রেমিকার শিরোমণি হইয়াছিলেন—যে প্রেমে মত্ত হইয়া এখনও কত শত লোক নরজীবন সার্থক করিবার প্রয়াস পাইতেছে—আজিকার নিশির শুভ মাহেন্দ্র-

যোগে সেই প্রেমের বীজ বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনস্থিত নিভৃত নিকুঞ্জকাননে মধুর পূর্ণিমা রজনীর মধুর স্নিগ্ধালোকে কিশোর কিশোরীর মধুর ভাবের মধুর মিলনে উপ্ত হইয়াছিল। ত্রিতাপদগ্ধ, অহংজ্ঞানবিমূঢ়, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্য-চ্যুত জীবের নীরস মরুহৃদয় প্রেমের অমৃতধারাসিঞ্চনে সরস করিবার জন্য আজ কিশোর কিশোরীর মধুর মিলন। এ মিলন গোলোকের নিত্যধন—এ মিলন যোগীজনেরও দুর্লভ; তাই ভগবান্ কৃপা-পরবশ হইয়া অজ্ঞানান্ধ মায়ামুগ্ধ জীবকে প্রেমের আস্বাদ দিবার জন্য ধরাধামে অব-তীর্ণ হইয়া এই রাসলীলার অভিনয় করিয়া ছিলেন। জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া কিরূপে কামকে প্রেমে পরিণত করা যায়, কামান্ধ জীবকে তাহা শিখাইবার জন্য কিরূপে ভাদ্র মাসের ভরাবর্ষায় দুকূলপ্লাবিত নদীর ন্যায়, যুবক যুবতীর ভরা যৌবনের প্রথম উদ্দামে কামের অদম্য উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত ভরা-হৃদয়ে কামের পরিবর্ত্তে প্রেমের বিকাশ—কামের নয় প্রেমের মিলন হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য—যুবক যুবতীর বেশে নয়—কিশোর কিশোরীর বেশে আজ কিশোর কিশোরীর মধুর মিলন। এ মিলন কামগন্ধ বিবর্জ্জিত, কেননা এযে কিশোর কিশোরীর মিলন—এ যে প্রেমের মিলন। এ মিলনে শুধু প্রেমের বিকাশ—প্রেমের স্ফূর্ত্তি; তাই আজ পূর্ণিমা তিথি; তাই রজনী আজ স্নিগ্ধ শুভ্রালোক-বসনে সজ্জিত হইয়া, হাসি হাসি মুখে মধুর হাসি হাসিয়া, কিশোর কিশোরীর প্রেমের মিলনের প্রেম সঙ্গীত গাহিতেছে—প্রেমের অমৃত ধারা জগৎময় ছড়াইয়া মোহান্ধ জীবের আঁধার হৃদয়ে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলো বিকাশের ন্যায় অতীতের প্রেমের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। কামমুগ্ধ জীবের পঙ্কিল হৃদয় সেই ক্ষণস্থায়ী আলোকরেখায় ক্ষণিক স্তম্ভিত হইয়া কি যেন ছিল—কি যেন নাই—কি যেন হারাইয়াছি ভাবিয়া হৃতবস্তু পুনঃ প্রাপ্তির আশায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে; কিন্তু মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া ক্ষণিকেই আবার আত্মবিস্মৃত হইয়া যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে। আজ এই পূর্ণিমা তিথির প্রেমের শুভ সম্মিলন সংবাদকে কবির কল্পনা বা বিকৃতমস্তিষ্কের অসার জল্পনা বলিয়া নিজকে জ্ঞানী বিবেচনা করতঃ নিজেরই মূর্খতার পরিচয় দিতেছে; বিষ্ঠা ভোজনে রত আকস্মিক মিষ্টান্নের সুগন্ধে চকিত শূকরের ন্যায় স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া মিষ্টান্ন-লাভ লালসায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ স্বভাবের দোষে পুনরায় বিষয়-মদে মত্ত হইয়া, মানব জীবনের লক্ষ্য—কর্ত্তব্য,—প্রেম লাভের কথা,—প্রেমের পরি পুষ্টি সাধনের কথা—সমগ্র জগৎ টাকে প্রেমের বিকাশ—প্রেমের সাকার মূর্ত্তি ভাবিয়া তাহার প্রীত্যর্থে আপনাকে উৎসর্গ করিবার কথা—মানব হইতে মানবেতর পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত চরাচরকে প্রেমের শৃঙ্খলে গাঁথিয়া সচ্চিদানন্দময় প্রেমের যুগল মিলনের যুগল চরণে প্রেমোপহার দিবার কথা ভুলিয়া যাই-তেছে। কিন্তু অন্যদিকে আজ প্রেমিকের হৃদয়—সাধকের হৃদয়—ভাবুকের চিত্ত হইতে প্রেমের উৎস হর-শির-নিবাসিনী, ত্রিতাপ নাশিনী, কলুষ হারিণী, পতিত পাবনী গঙ্গার—শত নয়, সহস্র নয়,—সগর বংশ উদ্ধার

কামনার পাতাল মুখগামী অনন্ত ধারা প্রবাহের ন্যায় অনন্ত ধারায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রেমিক আজ প্রেমে আত্মহারা হইয়া প্রেমসাগরে হাবু ডুবু খাইতেছেন, প্রেমিক আজ গোলোকের নিত্যবস্তু—বৃন্দাবনের প্রেমের খেলা—প্রেমের লীলা উপলব্ধি করিয়া—প্রত্যক্ষ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেছেন। আজ তিনি প্রতি জীবে—প্রতি নরনারীতে, এমন কি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গে প্রেমের যুগল মিলনের কিশোর কিশোরীর প্রেমালিঙ্গনের প্রেমাস্বাদ উপভোগ করতঃ নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন। কিশোর কিশোরীর রাসলীলা প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার চোখের সাম্নে ভাসিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন এ রাসলীলা শুধু আহ্নিক নয়, এ লীলা নিত্য; ধরিতে পারিলে,—বুঝিতে পারিলে পূর্ণিমা কেন—ঘোর ঘনাচ্ছন্ন অমানিশার তমসাবৃত রজনীতে, অতল জলধি-গর্ভ নিহিত গিরি গুহায়ও দিবালোকোদ্ভাসিত বস্তুজাতের ন্যায় সুস্পষ্ট দেখা যায়। এইটুকু উপলব্ধি করা—এইটুকু বুঝাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য,—লক্ষ্য—কর্ত্তব্য। যিনি এ যুগল মিলনের রসাস্বাদ উপভোগ করিতে পারেন নাই, তিনি আজও অপূর্ণ;—আজও তিনি সচ্চিদানন্দ চিদ্ঘন কিশোর কিশোরীর চরণ প্রান্তে পহুঁছিবার উপযুক্ত হন নাই, তাঁহার মানব জীবন এখনও সার্থক হয় নাই। এখনও তিনি আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চসীমায় আরোহণ করিতে সক্ষম হন নাই।

আজি কার মিলনাভিনয়ের অভিনেত্রী শ্রীমতী রাইকিশোরী; তাঁরই কৃপালাভ-লালসায় নবনিরদ-কান্তি নন্দদুলাল রসিকশেখর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ নিভৃত নিকুঞ্জে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন; রাই এলনা,' 'রাই এলনা' ব'লে রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজাইয়া কিশোরীকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। প্রেমময়ী রাধারাণী প্রেম বন্যা, কৃষ্ণসনে প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, তিনি কি বংশীধ্বনি শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন! প্রেম ভিখারীকে প্রেম দানই যে তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য। প্রেমদিবার জন্য—প্রেম শিখাইবার জন্য তাঁর অবির্ভাব; তাই তিনি বংশীধ্বনি শ্রবণে উদ্ভ্রান্তা হরিণীর ন্যায়, প্রেমময় কিশোরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, নিকুঞ্জ কাননাভিমুখে সখীগণ সঙ্গে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছেন। আজ আর কিশোরীর লজ্জা, ঘৃণা, মান, অপমান বোধ নাই। কিশোরী আজ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা—কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা; প্রেমের কিশোরী আজ আপনাকে কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছেন। কিশোরীতে আজ কিশোরী নাই; প্রেম শতবাহু-শৃঙ্খলে আজ কিশোরীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—কিশোর আজ প্রেমময়ী—প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা! আত্মবিস্মৃতা, প্রেমমুগ্ধা কিশোরী কি যেন কি ভাবে—কিসের আবেশে অবিষ্ট হইয়া প্রেমময় রাসেশ্বর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে ভুজযুগে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। আহা, এ মিলন যে কতদৃষ্টি-সুখকর—কত মধুময়, উহা যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন মেঘের কোলে সৌদামিনীর যে শোভা—নীলাকাশে অস্ত গমনোন্মুখ সান্ধ্য রবির যে শোভা—এ শোভা তাহা হইতেও শত শত—কোটি কোটি গুণে মনোরম্য, চিত্ত প্রফুল্লকর ও সুখদায়ক! তাহার সে রূপের বর্ণনা

হয় না। আজ রাসলীলায় কিশোরীর মধুর মিলনে সবই মধুময়;—আজিকার রজনী মধুময়—জোৎস্না মধুময়,—গৃহপ্রাঙ্গন,—কানন—পর্ব্বত বন-উপবন,—সকলই মধুময়। আজ যমুনা মধুময়,—বৃন্দাবন মধুময়—সমগ্র জগৎ মধুময়, কেননা আজ যে কিশোর কিশোরীর প্রেমের মিলন—প্রেমের উৎসব।

আয় ভাই, তোরা কে কোথায় আছিস একবার ছুটে আয়। আজ তোদের প্রেম দিবার জন্য—প্রেম শিখাইবার জন্য কিশোর কিশোরী তোদের হৃদয় বৃন্দাবন আলোকরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভ্রাতৃগণ! চেয়ে দেখ্ তো আজ তোদের ভিতর বাহির প্রেম-পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ প্রেমালোকে কেমন উদ্ভাসিত। আজ নয়ন ভরিয়া প্রেমময়ের কিশোর-কিশোরী বেশী যুগল রূপ দেখিয়া নয়ন সার্থক কর—জীবন ধন্য কর। ঐ দেখ রস রাজ রসিক-চূড়ামনির শিরে শিখী পাখা বিনির্ম্মিত মোহন-চূড়া কেমন শোভা পাইতেছে! চূড়া কেমন আবার বামে হেলিয়াছে, যেন সেও আজ প্রেমে ঢলঢল হইয়া রাই অঙ্গে অঙ্গ মিলাইতে লালায়িত। অন্যদিকে প্রেমময়ী রাইকিশোরীর শিরোপরে মণিমুকুতাময় মুকুট কেমন মানাইয়াছে। ভাই! দেখ, দেখ, কালাচাঁদের চাঁচর চিকুর কেশ শিখিপাখা-চূড়ায় শোভিত হইয়া কেমন দেখাইতেছে! রাই কিশোরীর আগুলফলম্বিত বেনী ফণিণীকে লজ্জা দিতেছে। রসরাজের উজ্জল ললাটে চন্দনের বিন্দু কিসুন্দর দেখাইতেছে, কিশোরীর ললাটে সিন্দুর বিন্দু গোধুলী ললাটে শোভিত তারকার ন্যায় জ্বলিতেছে। ভাই, প্রেমময়ের চাঁদবদনের শোভা একবার চেয়ে দেখ।

আহা কি সুন্দর! আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় বঙ্কিম চাহনীতে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় যেন প্রেমময়ী কিশোরীকে হৃদয়মধ্যে টানিয়া লইতেছেন। এদিকে প্রেমময়ী কিশোরীরও চোখের পলক পড়িতেছেনা। চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় প্রেমময় কিশোরের বিধুবদনপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কিশোরের মুখে বাঁশী 'রাধা' 'রাধা' রবে বাজিতেছে—কিশোরী আবার বাঁশী শুনিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছেন; গণ্ডস্থল ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। রসরাজ বামবাহুতে প্রেমময়ী রাধাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন; কিশোরী আবার দক্ষিণ বাহুতে রসিকশেখর কালচাঁদকে জড়াইয়াছেন। উভয়ের করধৃত বাঁশী অপরূপ শোভা ধারণ করতঃ শ্রীমুখে সংলগ্ন হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। একের গলায় বনমালা, অন্যের গলায় গজমুক্তার হার গঙ্গা-যমুনা মিলনের ন্যায় দেখাইতেছে। কিশোরের পরিধানে পীতবাস আর কিশোরীর পরিয়াছেন নীলাম্বরী সাড়ী;—আহা কি সুন্দরই না দেখাইতেছে!!! আজিকার যুগলমিলন দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন একই দুই হইয়াছেন; এ যে প্রকৃত পক্ষেও তাই। যেমন একই বুটের খোসার ভিতর দুইটী দল থাকে, প্রকৃতি পুরুষের মিলনও তদ্রূপ। যতক্ষণ গুণাতীত ততক্ষণ এক—অভিন্ন দুই নন,—গুণে আসিলেই সাকার—গুনে আসিলেই দুই,—গুণে আসিলেই কিশোর কিশোরীর যুগল মিলন, যিনি এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁরই সুরে আজিকার এই রাসলীলার কিশোর কিশোরীর শুভ সম্মিলন গাহিয়া জীবন ধন্য করি—

"বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখ রে নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে,
রাধার পাশে মদনমোহন॥
নয় ত এ অনুভবে,
দেখবে যখন—নীরব রবে;
এমন সাধের রতন সাধ করিস্ নি
নাজানি রে তুই কেমন।
(ক্ষ্যাপ্‌) তেমি করে মোহন বাঁশরী,
তেমি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী;
তেমি গোপী; তেমি খেলা,
শুনে ছিলি রে যেমন॥"

৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন রাসলীলা কি? কিশোর কিশোরীর মিলন কি? বিল্বমঙ্গল প্রেমিক ছিলেন—তিনি প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন; কিন্তু কর্ম্মবশে,—দৈব দুর্ব্বিপাকে বেসুরে তান ধরিয়া ছিলেন, তাই কিশোর কিশোরীর মধুর ভাব—মিলনের মধুর ভাব ভুলিয়া—চিন্তামণিকে ভুলিয়া চিন্তার চিন্তা সার করিয়া ছিলেন—চিন্তার চরণে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ছিলেন। আবার শুভ মুহূর্ত্তে চিন্তার মুখেই চিন্তামণির কথা শুনিলেন—সত্যের সংবাদ পাইলেন—জল নিমগ্ন ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় জীবনের লক্ষ্য পাইলেন—জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন—নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কি করিতে কি করিয়াছেন,—কাহার জিনিষ কাহাকে দিয়াছেন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মোহ-পাশ ছিন্ন হইল—অজ্ঞানান্ধার ঘুচিয়া গেল—জ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে হৃদয়-বৃন্দাবন আলোকিত হইল—হৃদয়-বৃন্দাবনে রত্ন সিংহাসনে যুগল রূপে চিন্তামণিকে দেখিতে পাইলেন,—জীবন ধন্য হইল—আত্মবিস্মৃত বিল্বমঙ্গল প্রেমিক বিল্বমঙ্গলে পরিণত হইলেন!

ভ্রাতৃগণ! একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখ আমরাও কি আত্মবিস্মৃত হই নাই? আমরা কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি। একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম কিসে ব্যয় করিতেছি। আমরাও ত কেহ ধনে কেহ বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনে, কেহ বা বিষয় সম্পদে আসক্ত হইয়া চিন্তামণিকে ভুলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া চিন্তামণি কি আমাদিগকে ভুলিয়াছেন? না তিনি ভুলেন নাই,—তিনি আমাদিগকে ভুলিতে পারেন না, কেন না আমরা যে তাঁর—তিনি যে আমাদের; তাঁহাকে স্মরণ করাইবার জন্যই আজ এই রাসলীলার অভিনয়—নিকুঞ্জ-কাননে আজ এই বংশীধ্বনি। এস ভাই, আজিকার এই শুভ নিশিতে একবার উচ্চৈঃস্বরে মনে প্রাণে ঐক্য করতঃ "জয়রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া যুগল কিশোরের উদ্দেশে এ জীবন উৎসর্গ করিয়া দেই। মান অপমান ভুলিয়া—আপন পর ভুলিয়া—স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করতঃ প্রেমময়ী রাধারাণীর প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দেই; প্রেমের শত সহস্র বাহু প্রসারণ করতঃ 'আমার' বলিয়া সমস্ত জগৎ-টাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মানবজীবন সার্থক করি। বিল্বমঙ্গল প্রেমিক ছিলেন----চিন্তাকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাই চিন্তামণিকে ভুলিয়া মোহবশে চিন্তাকে আপনার ভাবিয়া চিন্তাকে সার ভাবিয়া চিন্তার চরণে যথা-সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছিলেন; এদিকে আবার চিন্তা মোহান্ধতাবশতঃ প্রেমিক বিল্বমঙ্গলের হৃদয় বুঝিতে পারেন নাই,—বিল্বমঙ্গলকে

চিনিতে পারেন নাই। চিন্তা মাথারমণি পায়ে দলন করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া সেই প্রেমময়ী রসময়ী রাসেশ্বরী তো কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। যে মুহূর্ত্তে বিল্বমঙ্গল আপন ভ্রম বুঝিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে আপনার অমৃতময় অভয় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন—বিল্বমঙ্গল ধন্য হইলেন। পরশমণির সংযোগে লৌহও কাঞ্চন হইল, চিন্তাও ধন্য হইলেন। যুগল কিশোরের চরণ প্রান্তে তিনিও স্থান পাইলেন। প্রেমের সংস্পর্শ—প্রেমের সংযোগ বিফলে যায় না। জগতে প্রেমিক ধন্য—প্রেমিক যাহাকে আশ্রয় করেন সেও ধন্য। ভ্রাতৃগণ! যে যে বিষয়ে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, তাহাই কিশোর কিশোরীর বিকাশ ভাবিয়া কিশোর কিশোরীর সাকার মূর্ত্তি ভাবিয়া কিশোর কিশোরীর ভাবে—কিশোর কিশোরীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া যাও, তাহার ভিতর যুগল কিশোরের ধ্যান কর। একদিন নিশ্চয়ই প্রেমময়ী রাধারাণীর কৃপালাভে কৃতার্থ হইবে। হৃদয়-বৃন্দাবনে প্রেমের যমুনা উজান বহিবে প্রতি নরনারী—পশুপক্ষী—কীট পতঙ্গ, এমন কি সামান্য তৃণখণ্ডেও প্রেমের যুগল মিলন দেখিতে পাইবে। দেখিবে এই জগৎ প্রেমের রাজ্য—শুধু প্রেমের ছড়াছড়ি—প্রেমের পুষ্প বৃষ্টি—প্রেমে জগৎ ভরপুর,—দেখিবে প্রেম রাজা,—প্রেম প্রজা, প্রেম প্রভু,—প্রেম ভৃত্য প্রেম দাতা—প্রেম গ্রহীতা, প্রেম পীড়ক,—প্রেম পীড়িত, প্রেম খাদ্য,—প্রেম খাদক, প্রেম পূজ্য,—প্রেম পূজক। দেখিবে প্রেমের উজ্জ্বল স্নিগ্ধালোকে জগৎ আলোকিত, অনন্ত প্রেমের অনন্ত প্রবাহে জগৎ প্লাবিত। প্রেমের জীব-জগৎ প্রেমসাগরে প্রেমের সাঁতার কাটিতেছে—কেবল দেখিবে—প্রেম,—প্রেম, প্রেম; প্রেম ভিন্ন কিছুই নাই। ঊর্দ্ধঅধঃ, অগ্রপশ্চাৎ, পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ যে দিকে চাহিবে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কেবল প্রেমের যুগল মিলন দেখিতে পাইবে, তুমি আপন সত্তা হারা হইয়া প্রেম সাগরে ডুবিয়া প্রেমময় হইয়া যাইবে।

আজি এই শুভনিশির শুভ মুহূর্ত্তে রাস-রসময়ী প্রেমময়ী রাই কিশোরী এক বার যুগল কিশোরকে সঙ্গে নিয়া এদীনের হৃদয়-কুটীরে উদয় হও; তোমার প্রেম সাগরের এক বিন্দু প্রেম দান করতঃ এ নীরস মরুভূমিকে সরস করিয়া দেও, এ হৃদয়-মরুভূমি মরূদ্যানে পরিণত হউক। তোমার প্রেম-পরশমণির সংযোগে আমার তুচ্ছ হৃদয়-পর্ণকুটীর বৃন্দাবনে পরিণত হউক। আমি তোমার সাধের জীব-জগৎকে, তোমার প্রেমের বিকাশ—প্রেমের লীলা—প্রেমের খেলা বুঝিতে পারিয়া বুকের ভিতর পুরিয়া লই। আপামর বালকবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ, সাধুঅসাধু, পাপী-তাপী, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ সমস্তকে প্রেমের শৃঙ্খলে গাঁথিয়া যুগল রূপের যুগল চরণে প্রেমোপহার প্রদান করতঃ দুর্লভ মানব জীবন সফল করিয়া,—সকল সাধ পূর্ণ করিয়া তোমাদের যুগল চরণে অনন্ত সমাধি লাভ করতঃ এ জীবনের অবসান করি।

দীন—স্বরূপানন্দ।

—:০:—

সিন্ধু-তীরে।

১

পাড়ি তোরে দিতে হবে ক্ষুব্ধ জলনিধি,
কেন আজো বসি' তবে সৈকত প্রাঙ্গণে;
সাথীরা যে চলে যায় দেখ্ আঁখি মেলি,'
কি মোহে রে বসি তুই শঙ্কাহীন মনে!

২

ঘিরে আসে ধীরে ধীরে নিশার আঁধার,
দিবসের আলো ওই ম্লান হ'য়ে আসে;-
একা তুই, আজো বসে সুপ্ত নির্ব্বিকার,
পাপের আপাত মধু আলিঙ্গন-পাশে!

৩

এ কিরে অবোধ! আজি কি আত্ম বিস্মৃতি.
কে তুই? গেছিস্ ভুলে গন্তব্য কোথায়!
কবে রে ভাঙ্গিবে তোর মোহ নিদ্রাঘোর?
মুগ্ধ হ'য়ে বসি' কেন সিন্ধুর বেলায়?

৪

তারে ছাড়ি' এলি যবে, দেখ্ মনে ক'রে,
কেঁদেছিলি কত হায়! বিরহ ভাবিয়া;-
আজ এ কি! অর্দ্ধ পথে বিস্মরিলি সব
ডেকে ডেকে ম্লান মুখে যায় সে চলিয়া!

৫

এখনো সময় আছে,—ওঠ্ রে জাগিয়া—
শোন্ "কে যাবিরে পারে" ডাকে কর্ণ ধার;
আঁখি মুছি' ওঠ্ জেগে এখনো অবোধ!
ডাক্ কর্ণ ধারে,- "ও গো! আমি হব পার!"

৬

পশ্চাতে অতীত; ক্ষুব্ধ সিন্ধু সন্মুখে,
নেমে আসে তিমিরের ভীম যবনিকা;-
কোথা যাবি রে অভাগা! নিশার আঁধারে?
কে শুনিবে? কান্দিবি রে যবে তুই একা!

৭

ওঠ্ এবে অভাগারে! সময় থাকিতে,—
এখনো ফুকারে মাঝি, "কে যাইবি আয়!"
ছুটে আয় ছিন্ন করি পাপবাহু-পাশ,
পারে যদি যাবি আয়, বেলা ব'য়ে যায়!

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

—0—

এগিয়ে যাও।

"এগিয়ে যাও" অর্থাৎ "অগ্রসর হও" এই সামান্য কথাটীতে যে কি মহান্ সত্য নিহিত আছে, তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মত মহাপুরুষগণই জানিতেন, সেজন্য তিনি তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদিগকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন "এগিয়ে যাও"। এগিয়ে যাও অর্থাৎ পশ্চাৎপদ না হইয়া অগ্রসর হও, যে যে কাজেই প্রবৃত্ত হওনা কেন' পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করতঃ শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হও, তোমার পুরোভাগ সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইবে—অন্ধকার দূরে চলিয়া যাইবে,- তুমি

নব জীবন লাভ করিবে। সমুদ্র মণিমুক্তা প্রভৃতি নানা রত্নে পরিপূর্ণ, তাই তাহার নাম রত্নাকর, সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে হইলে রত্ন উত্তোলনকারীকে ডুব দিয়া সমুদ্রের তলদেশে যাইতে হয় এবং তথায় অনুসন্ধান করিয়া রত্ন সংগ্রহ করিতে হয়। যে সকল ডুবারী সমুদ্রের তলদেশে পঁহুছিতে না পারে, কিম্বা দুই একবার ডুব দিয়া বিফলকাম হইয়া রত্ন সংগ্রহে প্রতিনিবৃত্ত হয়; তাহাদিগকে আর রত্নের মুখ দেখিতে হয় না; সুতরাং সত্যলাভ করিতে হইলে—কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছুক হইলে প্রত্যেককেই বাধা বিঘ্ন না মানিয়া—নিরাশ না হইয়া—'নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব' এই ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ে পোষণ করতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে "এগিয়ে যাওয়া" কর্ত্তব্য; এ সম্বন্ধে মহাত্মা কুবীরের গভীর তত্ত্বোপ-দেশ মূলক একটী গান আছে; গানটী এই:—

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্ন ধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোনজন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

অর্থাৎ যিনি প্রেমে রত্ন লাভ করিতে চান—যিনি প্রেমে আত্মহারা হইতে চান—যিনি সমগ্র জীব জগতকে প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিতে চান—যিনি জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইতে চান, তিনি সর্ব্ব প্রকার বাধা বিঘ্ন নৈরাশ্য অতিক্রম করিয়া একাগ্র চিত্তে আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হউন, অবশ্যই সফল কাম হইবেন ইহা ধ্রুব। উপরোক্ত গানটী পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অতি প্রিয় ছিল; তিনি প্রায়ই এই গানটী গাহিয়া শিষ্য ও ভক্তদিগকে কায়মনোবাক্যে একনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেন।

"এগিয়ে যাও" এই মহামূল্য উপদেশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা, ইহা যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মানব জীবনে পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তিনিই সাধারণের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—জগতের সকলের শরণ্য বরেণ্য হইয়াছেন—তিনিই দেখাইয়াছেন যে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই—মানুষ দুর্ব্বল বা অক্ষম নহে—মানুষ শক্তির আধার; "আমি ইহা করিব" এই দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করতঃ একাগ্রচিত্তে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, শক্তির বিকাশ আপনিই হইবে—সময়োপযোগী সাহায্য ও উপকরণ আপনিই জুটিবে—মানুষকে কিছুই করিতে হইবে না; চাই শুধু তাহার একাগ্রতা, চাই শুধু তাহার ধৈর্য্য—চাই শুধু তাহার বুকভরা সাহস—চাই শুধু তাহার প্রাণ ভরা বিশ্বাস আর চাই তাহার কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ। যিনি সম্পূর্ণ রূপে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার আর ভাবনা কিসের—,সেত আপন কাজ গুছাইয়া বসিয়াছে। ভাবাতীত ভগবানই যে তাঁহার কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তব্য এদিক্ ওদিক না চাহিয়া শুধু

"এগিয়ে যাওয়া"। যিনি ভগবানে সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি নিজের বোঝা—নিজের দায়ীত্ব তাঁহার (ভগবানের) ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—নিত্যানন্দের অধিকারী হইয়াছেন—সমগ্র জীব-জগৎ আনন্দময়ের আনন্দের খেলার—প্রেমের খেলার লীলাভূমি উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

সতীরতেজ।

বিগত আষাঢ় মাসের ১৩ই তারিখে সূর্য্যোদয়কালে মণিপুরের অন্তর্গত জারাউলি গ্রামে রামলাল নামক এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁহার যুবতীভার্য্যা জয়দেবী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করেন, তখন জয়দেবী একখণ্ড প্রজ্বলিত কর্পূর লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবামাত্র তাঁহার চক্ষুতে এক অলৌকিক জ্যোতিঃ দেখা দিল। একটী বালিকা সেই সময় জয়দেবীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেক চেষ্টার পরও বালিকার চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া তাহার পিতা জয়দেবীর কৃপা ভিক্ষা করিলে, বালিকার চৈতন্য সঞ্চার হইল। এই সকল ঘটনাদৃষ্টে সহমরণে বাধাদিতে পারিবেন না ভাবিয়া রামলালের আত্মীয়গণ পুলিশে সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রাতঃকালে যখন মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, জয়দেবী সিকি, দুয়ানী, ও নানা প্রকার পুষ্প শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্মশানাভি-মুখে গমন করেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে না পড়িয়া শূন্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া জয়দেবী একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, "এই স্থানে চিতা প্রস্তুত কর।" যথা-সময়ে চিতা প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণের শব সেই চিতার উপর স্থাপন করাহয়। তখন জয়দেবী সেই চিতার উপরে আরোহন পূর্ব্বক স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করেন এবং স্বীয় অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। সতী সহমরণে যাইতেছেন, এই কথা প্রচারিত হইলে প্রায় দুইসহস্র ব্যক্তি সেই শ্মশানে সমবেত হয়। তখন জয়দেবী এক ব্যক্তিকে কিছু ঘৃত ও ফল আনিতে বলিলেন এবং ঘৃত আনীত হইলে সে ঘৃত চিতার উপর স্থাপন করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই সতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; বরং সমবেত জনতার মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিলেন, "যদি তুমি সত্য সত্যই সতী হও তাহাহইলে আগুণ চাহিতেছ কেন, তোমার তেজে চিতা জ্বালিয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া সতী মৃত স্বামীর কাণে কাণে কি কথা বলিয়া একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করতালিধ্বনি করিলেন, আর সেই মুহূর্ত্তে সহসা চিতাটী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইহার অল্পপরেই পুলিশ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ব্রাহ্মণের এবং তাঁহার সতী-

স্ত্রীর দেহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মণিপুরে এই সতীর সহমরণে সহায়তা করার অপরাধে কয়েকব্যক্তি রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মণিপুরের দায়রার জজের রায়ে উপরি লিখিত ঘটনার সকল কথাই লিখিত হইয়াছে। দায়রার জজ উভয় পক্ষের সাক্ষীর মুখেই এই সকল অত্যাশ্চার্য্য বিস্ময়কর ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃপর অবিশ্বাসী কি বলিতে চাহেন?

—:0:—

বঙ্গের অবস্থা ও ব্যবস্থা।

রুদ্রবিংশতির শেষবর্ষে পশ্চিম বঙ্গে প্রকৃতির রুদ্রতাণ্ডব হইতেছে। দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদের বন্যায় বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া ও মেদনীপুর জেলার অধিবাসীবর্গের কি বিপদ হইয়াছে, সকলেই অবগত আছেন। বহুলোকের জমিজমা, ঘরবাড়ী, গরুবাছুর, আসবাবপত্র, শস্য সকল গিয়াছে; তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিকট বদন ব্যাদান করিয়া এই জলপ্লাবনের পিছু পিছু আসিতেছে। ইতোমধ্যে অনেকস্থানে কলেরা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদিগের "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের" সেবকগণ ভিক্ষাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তথাই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে "আর্ত্ত-সহায় সমিতির" সম্পাদকের নিকট সামান্য অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর প্রকাশিত পত্রে তথায় রোগের প্রকোপ অবগত হইয়া অত্র আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ একজন সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার (শান্তি-আশ্রমের ম্যানেজার স্বামী স্বরূপানন্দজী) এবং পাঁচজন সেবককে ১২ই ভাদ্র তারিখে বন্যাপীড়িত স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ১২৪৲ টাকা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আনন্দে সেবাব্রত সার্থকতা করিতে চলিয়া গিয়াছেন।

সেবকগণ আর্ত্তের সেবা করিবেন বটে, কিন্তু যাহাতে বিপন্নগণ খাইতে পারিতে পারে, আবার ঘর বাঁধিতে পারে, চাষকরিতে পারে, গরুবাছুর কিনিতে পারে, দেশবাসীর (সদাশয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সত্বেও) তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। দেশের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কে হেন নির্দ্দয়-নির্ম্মম আছে যে, এই দুর্দ্দিনে বিপন্ন ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ হস্ত প্রসারণ না করিবেন। যাঁহারা নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, নিরন্ন, বিপন্ন, নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় দরিদ্রগণের মর্ম্ম-পীড়া হৃদয়ে অনুভব করেন—যাঁহারা দরিদ্র নারায়ণ রূপী শ্রীভগবানের পূজাকরিতে ইচ্ছুক; তাঁহারা সাধ্যমত যে যাহা দিতে ইচ্ছাকরেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাহা পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহিত হইবে।

প্রেসিডেণ্ট—শান্তি-আশ্রম, পোঃ কোকিলামুখ (জোরহাট)

—:0:—

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

তীর্থ-যাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

অঘোরী-কাপালিক।

গোরক্ষনাথ শৃঙ্গের পূর্ব্বদিকে ওঙ্কারশঙ্কর বা অঘোর শিকরা শৃঙ্গ; সম্ভবতঃ অঘোরী-সম্প্রদায়ের কোন কাপালিকের নামে এই শিকরা শৃঙ্গের নামকরণ হইয়াছে। কালকা-শৃঙ্গের নিম্নে গভীর জঙ্গলে অঘোরীরা বাস করে; ইহারা নরমাংস ভক্ষণ ও নরবলি দিয়া শব-সাধনা করিত।

দত্তাত্রেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, মহর্ষি কর্দ্দম মহর্ষি মনুর কন্যা দেবহুতিকে বিবাহ করেন। কর্দ্দমের ঔরসে ও দেবহুতির গর্ভে সাংখ্যাচার্য্য মহামুনি কপিল ব্যতীত আরও নয়টী কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে অনসূয়া অন্যতমা। ব্রহ্মার নেত্রসম্ভূত অত্রি ঋষি এই অনসূয়াকে বিবাহ করেন; ব্রহ্মার আদেশে, মহর্ষি অত্রি পত্নী অনসূয়া সহ ঋক্ষ নামক কুলাচলের রমণীয় কাননে একশত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুত্রকামনায় উৎকট তপস্যা করিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া ত্রিমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন ও তিন অংশে তিন পুত্র রূপে আবির্ভূত হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যথাসময়ে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা ও বিষ্ণুর অংশে দত্ত জন্মগ্রহণ করিলেন। অত্রিদম্পতী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রার্থনা করায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন;— "আমি আমাকেই দান করিলাম।" এই জন্যই বিষ্ণু অংশে জন্ম-প্রাপ্ত পুত্র (দত্ত) এবং অত্রির পুত্র (আত্রেয়) অর্থাৎ দত্তাত্রেয় নাম হইল। যদু এবং হৈহয়-বংশীয় রাজগণ দত্তাত্রেয়ের কৃপাবলে সর্ব্বার্থ

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, হৈহয়াধিপতি ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের সেবা-করতঃ সহস্রবাহু, অজেয়ত্ব, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অতুল সম্পদ, প্রভাব, বলবীর্য্য ও যোগেশ্বরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই রেবতাচলেই মহামুনি দত্তাত্রেয়ের পবিত্র পুণ্যাশ্রম ছিল। এখনও শিলাখণ্ডে মহামুনি দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

পঞ্চপাণ্ডব।

দত্তাত্রেয়ের পাদুকার সন্নিকটে পাঁচটী দেবস্থান আছে; কয়েকটী প্রস্তর স্তম্ভের উপর একটী ক্ষুদ্র গম্বুজ, এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাঁচটী। কোন সময়ে পঞ্চপাণ্ডব নাকি এখানে বাস করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদিগের স্মৃতি-রক্ষার্থ এই পাঁচটী দেবস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরও মন্দির এবং দেবস্থান আছে; যথা—কুমারপাল-মন্দির, মনিনাথ, হিড়িম্ববন, বলিস্থান, বামনস্থলী, কপিলাশ্রম, ভাল ইশার দরগা, কুন্তীনগর, বরাহরূপ, জালেশ্বর-মহাদেব ইত্যাদি মঠ, মন্দির ও প্রাসাদাদি,-অদ্যাপি রৈবতকে বিদ্যমান আছে।

সমাধি-স্মৃতি।

দামোদরকুণ্ডের পার্শ্বস্থ পথের অপর পার্শ্বে উপত্যকাভূমিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। প্রবাদ আছে—যে, ইহাই যাদবদিগের শ্মশানভূমি ছিল। রেবতাচলে অবস্থানকালে বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক ও কুকুরবংশীয় কাহারও দেহান্তর ঘটিলে, এই স্থানে তাঁহার সমাধি দেওয়া হইত। চূড়সুমা বংশীয় রাজপুতদিগের রাজত্বকালেও ঐ স্থানে অন্তিমক্রিয়া সম্পন্ন হইত। একটী স্তম্ভে চূড়সুমাবংশীয় শেষ রাজা রাওমণ্ডলিকের একটী প্রাচীন লিপি খোদিত আছে, তাহাতে মহী, সাগর, তুরঙ্গ ও রাম এই কয়টী কথা লিখিত আছে। অনেকে ব্যাখ্যাকরেন মহী,=পৃথিবী (১), সাগর=দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, লবণ (৪), তুরঙ্গ=সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (৭), রাম=পরশুরাম, দাশরথি রাম, বলরাম (৩) অর্থাৎ তৎকালীন প্রচলিত বল্লভী ১৪৭৩ সনে রাওমণ্ডলিক গিরণার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন।

জুনাগড় সহর।

জুনাগড় কাথিয়াবাড়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সহর। ইহার আয়তন ৩২৮৩ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা তিন লক্ষ অর্থাৎ পঁচানব্বই হাজার চারিশত আটাশ জন। জুনাগড়ের নবাব-সাহেবের বাড়ীটী দেখিতে অতি সুন্দর। তথায় একজন পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট্ আছেন। যদিও নবাবসাহেব নিজ রাজ্যের অপরাধী প্রজার প্রাণদণ্ড করিতে সক্ষম, কিন্তু পলিটিক্যাল্ এজেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ব্রিটিশ্-প্রজার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন না। ব্রিটিশ্-গবর্ণমেণ্ট নবাবসাহেবের সম্মানার্থ ১১বার তোপধ্বনি করিয়া থাকেন। রাজ্যের আয় ২৬লক্ষ ২৫হাজার টাকা। জুনাগড় রাজ্যে ৯টী জেল, একটী পাগলা গারদ, একটী শিল্পবিদ্যালয়, একটী উচ্চ ইংরেজীবিদ্যালয়, ১৪৪টী নিম্ন বিদ্যালয়, একটী মেডিক্যাল্ স্কুল ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সমগ্র জুনাগড় রাজ্যে ১৮টী মিউনিসিপালিটী আছে; তন্মধ্যে জুনাগড়ই সর্ব্বপ্রধান। ইহার আয় ১৮০০০, টাকা। এখানে ইংরেজী মুদ্রার প্রচলন আছে। এখানে একটী

টাকশাল আছে। ১৮৮০খৃষ্টাব্দে দেওয়ান অমরজীর নামে মুদ্রা প্রচলন হয়। রৌপ্য-মুদ্রাকে কড়ি ও অর্দ্ধকড়ি বলে; কড়ির মূল্য এক টাকার চতুর্থাংশ। তাম্রমুদ্রা তিন প্রকার;—ধিংলা, ধোকড়া ও ত্রাম্বিয়া। সহরে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে চাউল, ডাইল, ঘৃত, দুগ্ধ, আলু ও অন্যান্য তরকারী যথা-সম্ভব পাওয়া যায়।

৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—আহারাদি সমাপনান্তে বেলা ১১টার সময় প্রভাসক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেলা ১২টার সময় গাড়ী জুনাগড় হইতে প্রভাসাভিমুখে রওনা হইয়া বেলা ৪½টায় প্রভাস পঁহুছিল। প্রভাসে পঁহুছিয়া অবস্থিতি-স্থান নির্ণয় করিতে আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই; কারণ প্রভাসের পাণ্ডা শ্রীযুত বিষ্ণুভগবান, শ্রীযুত জেঠালাল ও প্রাণশঙ্কর পাণ্ডা জুনাগড় হইতেই আমাদের সঙ্গে প্রভাসে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্যে সহরস্থিত একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ রাত্রিবাস করিলাম। আমরা যে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়াছিলাম উহা বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ভাটিয়া বণিক কোমপাল-বানজী ও নন্দজী ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্মশালার নিকটেই প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির অবস্থিত।

প্রভাসক্ষেত্র।

আমরা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানকরতঃ পাণ্ডা শ্রীযুত প্রাণশঙ্কর পুছাওয়া মহাশয়ের সঙ্গে প্রভাসের পবিত্র ত্রিবেণীগঙ্গায় স্নান-তর্পণ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতে রওনা হইলাম। প্রভাসক্ষেত্রে হিরণা, ব্রজনি, ন্যঙ্কাবতী, কপিলা, সরস্বতী এই পাঁচটী পুণ্যতোয়া নদীর সঙ্গমস্থল। এখানে উপস্থিত হইবা-মাত্র অতীতের পুণ্যকাহিনী মনে পড়িল। এই স্থানে লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাস্-যজ্ঞস্থলে শতবর্ষব্যাপী বিরহবিধুরা প্রেমময়ী কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন—এই স্থানে ভগবান্ প্রভাস-যজ্ঞোপলক্ষে ব্রজবাসীদিগকে নিমন্ত্রন না করিয়া ত্রিলোকবাসীকে আপন পরের পরীক্ষা দেখাইয়া ছিলেন—এইখানেই ত ব্রহ্মশাপে আত্মকলহের বশীভূত হইয়া ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই স্থানেই ত ভগবান সোমদেব বহুকাল একপদে উর্দ্ধমুখে মৌনা-বলম্বনকরতঃ ঘোরতর তপস্যা করিয়া-ছিলেন—তাই তীর্থের নাম সোমতীর্থ। ভগবান্ সোমদেব এইস্থানে শাপমুক্ত হইয়া কান্তিযুক্ত ও প্রভান্বিত হইয়াছিলেন, তাই ইহার নাম প্রভাস। ইহাকে দেবপত্তন, সোমনাথপত্তন এবং প্রভাসপত্তনও বলিয়া থাকে।

এই তীর্থতীরে সুবিস্তৃত বটবৃক্ষমূলে তীর্থনাথ মঙ্কেশ্বর মহাদেবের বহু প্রাচীন মন্দির আছে; আমরা স্নান-তর্পনাদি ক্রিয়া যথারীতি সমাধান্তে তীর্থনাথ মঙ্কেশ্বর মহা-দেব দর্শনকরতঃ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারাদি ক্রিয়া সমাপন করিলাম।

ভালকাকুণ্ড।

প্রভাসপত্তন ও ভেরোয়াল বন্দরের মাঝা-মাঝি পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর-মধ্যে বট বৃক্ষাদি

শোভিত একটী নির্জ্জন রমনীয় স্থান। এই বটবন মধ্যে মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত অক্ষয় অশ্বত্থ-মূলে মৃণ্ময়বেদী,—ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমাধিস্থান। ইহার নিকটেই ভালকাকুণ্ড অবস্থিত। আমরা ভালকাকুণ্ডের পবিত্র জল স্পর্শকরতঃ মস্তকে দিলাম।

পদম্‌কুণ্ড।

ভালকাকুণ্ডের পরই পদম্‌কুণ্ড। ভগবান্ যদুপতি এই কুণ্ডে রক্তাক্ত চরণ কমল ধৌত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম পদম্‌-কুণ্ড। কুণ্ডটী অতিক্ষুদ্র, চারিদিকে প্রস্তর সোপানে বেষ্টিত। কুণ্ডমধ্যে ভগবান্ ও লক্ষীদেবীর বিগ্রহ এবং কামধেনু ও জরা-ব্যাধের মূর্ত্তি আছে।

শশীভূষণ মহাদেব।

উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত সুন্দর মন্দির; বরদার মহারাজ গায়কবাড়ের প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যে মহাদেবের প্রকাণ্ড লিঙ্গমূর্ত্তি; একটী পিত্তলের বৃহৎ সর্প লিঙ্গদেহ বেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণাবিস্তার করিয়া অবস্থিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বিনাশন গণপতির এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। এস্থানের পূজা-হোমাদির সমস্ত ব্যয়ই বরদার মহারাজ বহন করিয়া থাকেন।

সোমনাথ। এতদ্ব্যতীত প্রভাস ক্ষেত্রে দৈত্যসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি, প্রস্তর ময়ী মহালক্ষ্মী কপর্দ্দিন বিনায়ক গণপতি, নূতন সোমনাথ প্রভৃতি নানা বিগ্রহের মন্দির আছে। প্রাচীন সোমনাথের ধ্বংশের পর পুণ্যবতী মহারাষ্ট্র-রমণী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই এই নূতন সোমনাথ-মন্দির নির্ম্মান পূর্ব্বক লিঙ্গ স্থাপন করতঃ পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মন্দির মধ্যে পাতাল-গহ্বরে সোমনাথ লিঙ্গ স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে গঙ্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী ও নন্দিকেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। এই মন্দির ধ্বংশাবশিষ্ট প্রাচীন সোমনাথ-মন্দিরের নিকটে—সমুদ্রতীর হইতে অল্পদূরে পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। যে বিশ্ব-বিশ্রুত মন্দিরের সহিত প্রভাসের নাম সুগ্র-থিত, সেই প্রাচীন সোমনাথ-মন্দিরের ভাগ্যের সহিত যুগে যুগে প্রভাসেরও ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যদুবংশের ধ্বংশের পর ১০২৪ খৃষ্টাব্দে গজনির সুলতান মামুদ এই প্রভাসে আসিয়া মন্দির ধ্বংশ পূর্ব্বক অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তৎপূর্ব্বে প্রভাসের সৌভাগ্য ও সোমনাথের ঐশ্বর্য্যের কথা জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল। মহম্মদ গোরী মন্দির লুণ্ঠন করিলে পর কিছুদিন প্রভাস মুসলমানের অধীন ছিল; পরে আবার তথায় হিন্দুরাজত্বের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দিনের খিলিজির সেনাপতি আলাগ খাঁ আবার সোমনাথ ধ্বংশ করিয়া প্রভাসে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাহার পর প্রভাসের নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চুড়-সুমা রাজপুত বংশীয় হিন্দুরাজার শাসনাধীনে থাকে; এই বংশের শেষ রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আমেদাবাদ-গুজরাটের সুলতান মহম্মদ বেগারা তাঁহা-দিগের অন্যান্য রাজ্যের সহিত প্রভাসও দখল করিলেন। পরে গুজরাটের সুলতান

মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হইলে এই রাজ্য সম্রাট্ আকবরের অধিকারে আইসে। তদপর সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব আর একবার সোমনাথ ধ্বংশ করেন। অনন্তর ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের পর গুজরাটের নবাব স্বাধীন হন। তখন সের খাঁ বাবি নামক এক মুসলমান সেনানী মোগল শাসন কর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া প্রভাসাদি দখল করিয়া লইলেন। জুনাগড়ের নবাব সেরখাঁর বংশধর; বর্ত্তমানে প্রভাস ক্ষেত্র প্রভৃতি ইহাঁদিগের অধিকারে রহিয়াছে। হায়!—হায়!—যেখানে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ দেব দেব মহাদেবের সেবায় ব্রতী ছিলেন, সেই থানে আজ সর্ব্বশুদ্ধ সাত হাজার লোকের বসতি,—তাহার মধ্যে আবার অতি অল্প সংখ্যক হিন্দু। যে সোমনাথের অগাধ ঐশ্বর্য্যের কথা দিগ্ দিগন্তে বিঘোষিত,—যে মন্দিরের ধনৈশ্বর্য্যের কথা শুনিলে বিস্ময়-পুলকে অবিভূত হইতে হয়,—যে মন্দিরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিগাথা শুনিলে আনন্দে-গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হয়, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর আজ সেই অতুল কীর্ত্তির শোচনীর পরিণাম দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হায়!—কালের প্রভাব কি অপ্রতিহত।

প্রভাসের তীরে মহাহোম। আশ্বিন মাসের শুক্লা মহা নবমীর রাত্রি নয়টার সময় প্রভাসের তীরে মহাহোম হইয়া থাকে। সমুদ্র বেলার সমভূমি হইতে প্রায় চতুরঙ্গুলি উচ্চ চতুরস্র বালুকা বেষ্টনে হোম ভূমি সীমাবদ্ধ। সেই হোম ভূমির পরিমান ২০বর্গ হস্ত হইবে। এই হোম নগর বাসী দিগের মঙ্গলের জন্ত প্রতি বৎসরের মহা নবমীর রাত্রে সম্পাদিত হয়। নগরের লোক চাঁদা করিয়া হোমের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। হোমে তিনমন ঘৃত এবং তদুপযুক্ত ইন্ধন ও তিল যবাদির আয়োজন হয়। জুনাগড়ের নবাব বাহাদুর প্রতি বৎসর হোমের জন্ত অর্দ্ধমন ঘৃত বা তাহার মূল্য দিয়া থাকেন। প্রভাসে একটী কথা আছে যে,—

প্রভাস কা পাঁচ রত্তন;
সরস্বতী নারী, সোমনাথ বাজী,
হরি কি চরণ।

আমরা প্রভাসে তিনরাত্রি বাস করিয়া দ্বারকাধামে যাইবার জন্য পাণ্ডার নিকট হইতে "সাঁকা" লইয়া বৈকালে ধর্ম্মশালা হইতে রাওনা হইলাম। পাণ্ডাকে সন্তুষ্ট করিতে কিছু বেগ পাইতে হইল। যাহাহউক আমরা দুই খানা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া ভেরোয়াল জাহাজ ঘাটে উপনীত হইলাম। তথায় কোনরূপ বিশ্রাম-স্থানের সুবিধা না থাকায় বাধ্য হইয়া সমুদ্র-তীর-স্থিত টিকিট বিক্রয়ের ঘরের বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। তদনন্তর কিছু জল যোগ করিয়া শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম; কিন্তু ঘুম আর হয় না। সঙ্গের যাত্রিগনের ইচ্ছা নহে যে, তাহারা কেহ জাহাজে যায়; অধিকাংশের ইচ্ছা গরুর গাড়িতে দ্বারকা যায়। এই স্থান হইতে গরুর গাড়িতে দ্বারকা যাইতে পাঁচ ছয় দিন লাগে। সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া ও গর্জ্জন শুনিয়া কেহই জাহাজে যাইতে সম্মত নহে; বিশেষতঃ জাহাজে উঠা সেও অত্যন্ত বিপদজনক ও ভয়াবহ। রাত্রি ১০টার সময় ইন্দ্রাবতী নামক জাহাজ কষ্টম হাউসের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। জাহাজ তীর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত

রাত্রি নানা চিন্তায় একবারও নিদ্রা আসিল না; বিষম উদ্বেগে রাত্রি যাপন করিলাম। ভগবান্‌কে আত্মনির্ভর করিয়া তাঁহার নাম জপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

মুরলী ধ্বনি।

ফুকারী বাঁশরী,
মন প্রাণ হরি,
অই শুন হরি ডাকিছে।

ভুলে রসরাজে,
ছিনু গৃহ কাজে,
তাই মোর খোঁজে এসেছে।

তিনি প্রেম পারাবার,
আমি যে তটিনী তাঁর,
মিলন আশায় তাই প্রাণ নেচে উঠেছে।

আমি তার, সে আমার,
প্রেমে হব একাকার,
প্রেমের তরঙ্গ মোর তাঁরি পানে ছুটেছে।

শুনিলে বাঁশীর গান,
থাকে না আর কুল-মান,
প্রেমের এমনি টান; সে জানে যে মজেছে।

আমি আর আমাতে নাই,
সর্ব্বত্র শুনিতে পাই,
প্রেমময় বুকে নিতে যেন মোরে ডাকিছে।

(শ্যাম দরশনে)
তোরা কে কে যাবি আয়,
তোরা যাবি যদি আয়,
শ্যামের মুরলী ধ্বনি অই শুনা যায়।

প্রাণ বঁধু ছেড়ে,
বিষয়েতে জ'ড়ে,
ঘরে থাকা দায়; তোরা আয়, আয়, আয়।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়,
তিন থাকৃতে নয়,
বাঁশী শুন কয়—"তোরা আয়, আয়, আয়।"

তার কি আমিত্ব রয়,
যারে নাথ টেনে লয়,
তটিনীর হয় লয়, সাগরের পায়;
অই শুন ডাকে হরি "আয়, আয়, আয়"।

একি হ'ল দায়,
তোরা ত্বরা করে আয়;
বাঁশী শুনে আর কিলো ঘরে থাকা যায়?

কাটি সব মায়া পাশ,
চল ত্বরা বঁধু পাশ,
শমন হইবে দাস, কারে বল ভয়?
আপনি শ্রীহরি সবে দিবেন অভয়।

শ্যাম দরশনে তোরা কে কে যাবি আয়,
দেখিতে দেখিতে কিন্তু বেলা ব'য়ে যায়।
কি মোহন সুরে অই বাজিছে বাঁশরী;
আয় সবে সাথে সাথে সকল পাশরি।

শ্রীমতী ননীবালা বসু।

—:0:—

রাসোৎসব।

পূর্ণিমার রাত্রি। হৈমন্তী পূর্ণশশধরের রজত কিরণে দিগন্ত ভাসিয়া গিয়াছে;—পাপিয়াকুল কলনাদে প্রাণের মধ্যে কোন্ অজানা আকাঙ্ক্ষার ঘুমন্তভাব জাগাইয়া দিতেছে, শত শত নৈশ ফুল্ল কুসুমের সুবাস দিক্ হইতে দিগন্তের কোলে ছুটিয়া যাইতেছে,—নীল-আকাশের কোলে চিরসাক্ষী তারকাকুল প্রোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, সুধাকরের সুধার আশায় চকোরী ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া আছে,—জাতজীব মাত্রেরই হৃদয়ে কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষা—কোন্ আনন্দের অনুভূতি আসিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে।

সহসা জলদপটলকে স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে মুহুর্মুহুঃ চমৎকৃত করিয়া, সনন্দাদি তাপসকুলকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, ব্রহ্মাকে বিস্মিত করিয়া, পাতালে বলিরাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, ভুজগপতি অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ভিত্তি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সকল দিকে বিস্তারিত হইল। জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, জীবের সুখসুপ্ত হৃদয়ে পূর্ণ সুখের রসধারা ঢালিবার জন্য—প্রাকৃত কাম-পীড়িত হৃদয়ে অপ্রাকৃত মদনোন্মাদ সুধার কলসীনিঃসৃত রসধারা ঢালিবার জন্য সেই মনোহর বেণু নিনাদিত হইল। জীব সে রসের ধ্বনিতে মোহিত হইল, কিন্তু সকলে তাহার পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইতে পারিল না। যাহারা গোপী, যাহারা ভক্ত, তাহারাই সে রসে রসিক হইয়া প্রাণ ভরিয়া পূর্ণানন্দ পুরিয়া লইল;—কেহ অনুভূতিতে রসের জন্য ধাবিত হইল।

এইরূপে সেই আনন্দময় ভগবান্ আপনার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিয়া জীবকে সেই রসোপভোগ-জন্য মোহন বেণু বাদন করিতেছেন। তিনি সকলকেই ডাকিতেছেন,—তাঁহার মোহন মুরলীর আনন্দধ্বনি সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু, যাহারা গোপী হইয়াছে,—যাহারা কামনা-বাসনা লাজ-শীল-কুলমান সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহারাই সে আনন্দমাখা স্বর শুনিতে পায়,—তাই সেই রাস-রস-বিহার দেখিতে ছুটিয়া যায়; আর যাহাদের অহঙ্কার আছে, যাহারা ভাবে—আমরা গোপ,—অর্থাৎ আমরা পুরুষ, এইরূপ অহঙ্কার বিজড়িত হৃদয়,—তাঁহারা সে বাঁশী শুনিতে পায় না, সে হাসি দেখিতে পায় না—সে রাসে আনন্দের মিলন বুঝিতে পারে না। অহংভাব দূর না-হইলে, আমিত্ব দূর করিতে না পারিলে,—প্রকৃতির-বাহুবন্ধন ঘুচাইতে না পারিলে, সে বাঁশীর ডাক শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহারা শুনিতে পায়, তাহারা গোকুলাখ্য মহাধামে উপস্থিত হইয়া সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস-রস-বিহার দর্শন করিয়া প্রাণের আশা পরিতৃপ্ত করে,—সুখের অভিলাষ পূর্ণ করে,—রসোপভোগে আত্মা কৃত-কৃতার্থ করিয়া থাকে।

রাসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পুরুষ-প্রকৃতি ও জীবেশ্বর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা চাই। সাধারণে জানিয়া রাখুন যে, যিনি পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর;—যিনি প্রকৃতি, তিনি জীব। বস্তুতঃ মূলে, সকলেই পুরুষ,—পুরুষ অবিদ্যা-প্রকৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীব। অতএব

যখন জীব, তখন প্রকৃতি—প্রকৃতিত্ব ঘুচিয়া গেলেই জীব পুরুষ। অতএব জীব মাত্রেই প্রকৃতি বা রমণী, আর যিনি প্রকৃতির অতীত —প্রকৃতি যাঁহার ভোগ্যা, তিনিই পুরুষ। জীব আর শক্তি লইয়া তাঁহার সকল। গোপী অর্থে সাধু প্রকৃতিক জীব। গো=পৃথিবী+ পা=যে পালন করে। সাধু গণই পৃথিবীর পাতা। অতএব সাধুগণ,—ভক্তগণই গোপ আর প্রকৃতিস্থ বলিয়া ইহাঁরাই গোপী। এই গোপিগণকে আনন্দ বা রসোপভোগ করণ জন্য ভগবান্ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত ব্রজধামে যে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, হিন্দুগণের নিকট তাহাই রাসোৎসব নামে অভিহিত-হইয়াছে।

ভগবানের যে অখণ্ড ভাব জীবকে সর্ব্বদা অনন্ত উন্নতির পথে—পূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই কৃষ্ণ। আর যে শক্তির দ্বারা জীব তাঁহার দিকে—অনন্ত আনন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে অবৃত থাকে, তখন তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু আবরণ উন্মুক্ত হইলেই মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেম সচ্চিদানন্দ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ মাত্র। ভগবানের তিনটী শক্তি। যথাঃ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

বিষ্ণুপুরাণ।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বৎ এই তিন শক্তি ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে হ্লাদিনী প্রেম স্বরূপা; ইনিই শ্রীরাধা নামে কীর্ত্তিতা। যথা :—

হরতি শ্রীকৃষ্ণ মনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী।
অতোহরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥

সাধনতত্ত্বসার।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হরা; কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী রাধাই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব রাধা ও কৃষ্ণ একই আত্মা। তাঁহারা অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায় ভেদাভেদ রূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া আনন্দের রাস-রসলীলায় মত্ত রহিয়াছেন। যে রূপ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, সমুদয় ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কার্য্য হইয়া, তাহাদিগের অন্তর্ব্বাহিঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণ একমাত্র সমগ্র প্রাপঞ্চিক জীব সমূহের অন্তর্ব্বাহ্যে বিরাজ করিতেছেন। জীবকে প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে ও তৎসাধনা শিক্ষা দিতে ব্রজধামে তাঁহারা উভয় দেহ ধারণ করিয়া, আনন্দের রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

দ্বাপর যুগের শেষ সন্ধ্যায়—যখন জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানের কর্কশ সাধনায় অলিতকণ্ঠে ভগবানের কৃপাবারির আশায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়াছিল,—বাসনাবিদগ্ধ হইয়া আনন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, ভগবান্ সেই সময় মনুষ্যর ঊর্দ্ধগতি দান জন্য—পরানন্দ দান-জন্য—পিপাসিতকণ্ঠে মধুর প্রেমরসের পূর্ণধারা ঢালিয়া দিবার জন্য হ্লাদিনী শক্তির সহিত রাধাকৃষ্ণ রূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের প্রধান ভাব প্রেম,—সেই প্রেম দান করিতে, প্রেম-শিক্ষা প্রদান করিতে, প্রেমে জগৎকে জাগাইতে ভগবান্ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত বৃন্দাবনে মাধুর্য্যের রাসলীলা করিয়াছিলেন। যথাঃ—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতং।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কঃ।

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিকাশার্থ মানুষদেহ আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যাহা শ্রবণ করিয়া মানবগণ—ভক্তগণ তাহা করিতে পারে। সেই ক্রীড়াই রাসলীলা। সেই রাসলীলার রাধাই প্রাণ। যেহেতু রাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনী শক্তি—রাসক্রীড়ার সহায়। ভগবানের যে রস-প্রাপ্তি কামনা, সেই রস পূর্ণভাবে শ্রীরাধায় বিরাজিত;—সুতরাং রসের বিকাশ রাধাতত্ত্বে। শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে রাসলীলা, তাহাই রসের আশ্রয় বা রসসাধনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাধা আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে রসতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে বৃন্দাবনে উভয়দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই রাধাকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে অর্থাৎ আত্মারূপে প্রতি জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জীব সেই আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে জলভ্রান্ত মৃগের মরীচিকায় ছুটিয়া যাওয়ার ন্যায়—এই সংসার-মরু-ভূ-খণ্ডে এতব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। জীব সুখ চায়, সুখের আকাঙ্ক্ষায় জীব বাসনার দাস হইয়া পড়ে, কিন্তু পার্থিব পদার্থে সুখ নাই, সে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, বা মরণ-ধর্ম্মশীল। সুতরাং অপূর্ণ জগতে পূর্ণ সুখের আশা করা বিড়ম্বনা। মায়ামুগ্ধ জীব জানিতে পারে না যে, পূর্ণানন্দ—পূর্ণসুখ যে তাহার আত্মায় অবস্থিত। মৃগ যেরূপ আপন নাভিস্থিত কস্তুরির গন্ধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বনমধ্যে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ জীবও আনন্দের অনুভূতিতে পার্থিব বিষয়ে প্রধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে।

জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিবশতঃ এবং সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় জীব যখন জানিতে পারে যে, তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ তাহার আত্মাতেই অবস্থিত, তখন বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—সে তখন আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনন্তর আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আত্মায় রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বিকাশ করিতে পারিলেই পূর্ণ রস ও আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু তাহা সাধন সাপেক্ষ,—সেই সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিমানের শক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা যায়, কি প্রকারে প্রকৃতির বাসনা-বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়,—আর কি প্রকারে রসের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া রসের ভাণ্ডনিঃসৃত দরধারায় জ্বলিতকণ্ঠ জীবের প্রাণ সুশীতল হয়, তাহাই শিক্ষা দিতে ভগবানের রাধাকৃষ্ণ অবতার,—বৃন্দাবনের রাসলীলা।

রাসলীলা প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার সুরত-কলাতে পর্য্যবসিত নহে। কেন না, মায়িক জগতের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মোহন—মধুর-লীলা-উৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীবৃন্দাবনে হ্লাদিনী শক্তিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর মিলনের অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করিবার যে লালসা, তাহার নাম রাসক্রীড়া বা আনন্দশৃঙ্গার। আবার জীব মাত্রেই রমণী,—ভগবান্ রমণ। এই ভক্ত-ভগবান বা রমণী-রমণের মধ্যে যে অভেদ ভাব, তাহাকেই রাসক্রীড়া বলে। আনন্দশৃঙ্গার বা রাসক্রীড়া

শব্দে প্রাকৃত কামগন্ধশূন্য আনন্দময় প্রেম-বিলাস। অতএব রাসলীলা বা রাধাকৃষ্ণের রতিরস কদর্য্য বা ঘৃণ্য নহে। ভগবান্ স্ব-স্বরূপেই রমমান; তাই তাঁহার নাম আত্মারাম ঈশ্বর। সেই রমণলীলাই রাসলীলা।

সাধক যখন সাধন বলে—নিষ্কামভাবে প্রকৃতির বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে আত্ম-সমর্পণ করে,—তখন ভগবানের স্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হয়। কাজেই সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে পরিব্রাজিত হওয়ার তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। কিন্তু সাধক তখন নিষ্কাম সে তখন ব্রজেশ্বরী লইয়া কি করিবে? তাহার কামনা গিয়াছে—কর্ম্ম গিয়াছে, শক্তির তাহার প্রয়োজন কি? তাই সাধক সে শক্তি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করে। সে শক্তি নিজ শক্তি বলিয়া—আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিয়া মধুরভাবে আলিঙ্গন করতঃ মিলিত হয়েন। এইরূপ ভগবান্ ও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাত্মক মিলনের নাম রমণ;—যোগীর ইহাই সমাধি। তাই ভগবান্ রামনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহা-আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কথা নহে, বেদ-বাক্য।

যথা:—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি
ইতি রামপদে নাসৌপরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

শ্রুতি।

রামশব্দে অদ্বৈত পরমাত্মাকেই বুঝায়, যোগিগণ যে অমূর্ত্ত ব্রহ্মতে ইন্দ্রিয়-নিরোধ পূর্ব্বক রমণ করেন, তিনিই রাম। সুতরাং আত্মা-পরমাত্মা বা ভক্ত-ভগবানের স্বরূপাত্মক অভেদ ভাবে মিলনের নাম রমণ বা রাসলীলা। ভগবান্ ভক্তের সহিত রমণ করিবেন; ভক্ত ও ভগবানের সহিত রমণ করিবেন। এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় নহে, স্বাভাবিক। ভগবান্ এই প্রকারে যে নিজশক্তি বা প্রকৃতির সহিত রমণ করেন,—এ রমণ মায়িক জগতের কেহ জানিতে পারেনা,—ইহাই ব্রজের অন্তর্মুখী গূঢ়লীলা। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার সহিত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন; তাহাই রমণ বা রাসক্রীড়া নামে অভিহিত। আত্মার এই নিত্যভাবের বাহ্য বিকাশ রাসোৎসব।

রাসোৎসবের রসাস্বাদ জীবে প্রদান করিবার জন্যই শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রকট লীলা। জীবের গোপীভাব গ্রহণ করিয়া, রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক আনন্দানুভব করাই পরম পুরুষার্থ। গোপীভাবের সাধনায় গোপ্যনুগতিময়ী ভক্তি লাভ করিতে পারিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রস-রতি জ্ঞান হয় এবং পরিণামে শ্রীশ্রীরাধা শ্যামের মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যায়। এই সময়ের অবস্থা ভক্ত গিরিশ বাবু তদীয় নিমাই-সন্ন্যাসে লিখিয়াছেন;—

গোলোক পাইবে হৃদিমাঝে,
হবে এ জীবন ফুল্ল নিধুবন,
হৃদি ফুল্ল কমল-আসন,
ওহে বাঁকা হয়ে মুরলি বদন,
রাধা-অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়ে,
চোকে চোকে চেয়ে,
করিবেরে প্রেম-বিনিময়,

সে কৌতুক হেরি মত্ত হবে প্রাণ
আস্বাদনে অমৃত করিবে পান,
সখীভাবে মনোবৃত্তি আনন্দে নাচিবে,
যুগলে হেরিবে,
মধুলীলা হবে ধরাতলে,
গোপীভাবে গোপীপ্রেমে বল হরি হরি ।

কস্যচিৎ-পরিব্রাজ কস্য ।

—:০:—

সাধক-সঙ্গীত ।

[৮]

ত্বংহি পরব্রহ্ম পরমারাধ্য পরম কারণ ॥
ত্বংহি কাল কলুষহারী, মুরারি মুরলীধারী
বন-বিহারী হরি নিরঞ্জন ॥
ত্বংহি কালীয়-মর্দ্দন হে জনার্দ্দন জন-পালন
যশোদা-যশো-বর্দ্ধন হে গোবর্দ্ধন-ধারণ ॥
পুরব উক্তি তোমারি নাথ পাপী, তাপী, দীন, অনাথ,
ত্রাণ হেতু নিদান-বন্ধু করিবে জনম ধারণ—
হবে অচির কালে শচীর গর্ব্ভোদক সিঞ্চন,
নদীয়া ধাম করিবে পূত পূতনা-বিঘাতন ॥
চম্পক-হেম-গৌর-অঙ্গে, সৌর-কিরণ খেলিবে রঙ্গে,
রাধিকা-ভাব কান্তি ঢাকিবে মাখি ভস্‌ম ভূষণঃ—
কোপীন পরি ধরিয়ে দণ্ড ত্যজিবে হে স্রক্ চন্দন,
ভুলিবে গাভী বৎস পালন শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ॥
শ্রীহরি নামে ছাড়িবে তান, গলাবে পাষাণ ভুলাবে প্রাণ,
আচণ্ডালে করিবে দান প্রেম ভকতি-কাঞ্চনঃ—
কাঁদিবে কাঁদাবে হাসিবে নাচিবে মাতাবে অখিল ভুবন ।
নাম হবে চৈতন্য পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
এইত সময় ত্রিলোকী কান্ত, কলির তাপে সকলি ভ্রান্ত,
পাপে তাপে অতি অশান্ত, করে না ধরম পালনঃ—
শীঘ্র নাথ, ভরত ভূমে করহে অবতারণ,
শিখাও শীঘ্র শ্রীগোবিন্দে নাম-ব্রহ্ম সাধন ॥

—:০:—

এগিয়ে যাও।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

"এগিয়ে যাওয়া" ই এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলমন্ত্র, সমগ্র জীব-জগৎ এই এক সত্যের সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে; উত্থান, পতন, ভাঙ্গাগড়া, জন্মমৃত্যু এ সকলই "এগিয়ে যাওয়ার" ক্রিয়া। বিশ্বপাতা বিধাতা খেলোয়ার আর আমরা তাহায় ক্রীড়নক মাত্র, তিনি এগিয়ে যাওয়া"র সূত্রাবলম্বনে আমাদিগকে লইয়া খেলা করিতেছেন। এই জগতে কে না অগ্রসর হইতেছে? চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবী অবিশ্রান্ত গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্য্য আর এক বিরাট্ সূর্য্যের চারিদেকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পর্ব্বত-প্রবাহিনী নদী আপন ভাবে বিভোর হইয়া তরঙ্গ হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে কেন? তাহারাও কি অগ্রসর হইতেছে না? আমরা মানব, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, এমন কি ক্ষুদ্র বালুকা কণা পর্য্যন্ত ক্রমবিবর্ত্তনে সেই অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছি। নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল জগতে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সকলই "এগিয়ে যাওয়া"র ক্রিয়া মাত্র, কেননা "এগিয়ে যাওয়া"ই জগতের স্বভাব; সুতরাং "এগিয়ে যাওয়া" ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এই চরাচর সমস্ত জগৎ অনন্তের বিকাশ মাত্র, সুতরাং অনন্ত; যতদিন নাই অনন্তের ব্যষ্টি অংশ অনন্তের সমষ্টিতে বিলীন হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক অগ্রসর হইতেই হইবে।

"এগিয়ে যাও" এই সত্যবানী যাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সে জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে; "এগিয়ে যাও" এই অভয় বানীতে সত্য নিহিত। সত্য যাহার আশ্রয় সত্য যাহার সহায়,—সত্য যাহার লক্ষ্য, তাহার কিসের ভয়? জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সত্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে কর্ম্মক্ষেত্রের চরমসীমা পর্য্যন্ত চলিয়া যাওয়ার নামই "এগিয়ে যাওয়া"। লক্ষ্য স্থির নাকরিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সত্যলাভত হইবেইনা, জীবনও বৃথা ব্যয় হইবে। নদীর লক্ষ্য সমুদ্র; সে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া কত বন, দেশ, নগর, গ্রাম, প্রান্তর অতিক্রম করতঃ নীরবে অবিশ্রান্ত গতিতে—অপ্রতিহত প্রভাবে আপন গন্তব্য স্থানোদ্দেশে ছুটিয়াছে। যতদূরে হউক না কেন—যতদিনে হউক না কেন—যে ভাবে হউক না কেন, সাগরের সঙ্গে মিশিবে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ, কখন একাকিনী কখন অন্য নদীর সঙ্গে মিশিয়া—কখন বা অন্য নদীকে সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রাণে সাগরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, অবশেষে সমুদ্রের অমৃতময় অঙ্গে স্থান লাভ করতঃ প্রান্তিসুখের অধিকারিণী হইতেছে; এই খানেই তাহার বিশ্রাম—এই খানেই তাহার কর্ম্মের শেষ। কেননা তখন যে সে সাগরের সত্তায় মিশিয়া—সাগরের বুকে লুকাইয়া—অনন্ত সাগরের বিরাট্ পাদমূলে আপনাকে বিকাইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব সাগরের বৃহত্তমে ডালি দিয়া

সাগরে পরিণত হইয়াছে—আপন অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়াছে। আমাদের জীবনও নদীবৎ, নদী আমাদের আদর্শ আর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ আমাদের লক্ষ্য। সেই অনন্তের বিরাট্ সত্তায় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব ডুবাইয়া দেওয়াই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। অন্ধ আমরা, অন্ধ আমরা, চক্ষের সম্মুখে সত্যের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত দেখিয়াও দেখিতেছি না—বধির আমরা সত্যের দুন্দুভি বাজিতেছে, শুনিয়াও শুনিতেছি না—মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না, তাই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ কৃপা পরবশ হইয়া সাধু-মহাপুরুষ বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন "এগিয়ে যাও"—"এগিয়ে যাও"। নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া কেহ কি নদীর বেগ রোধ করিতে পারিয়াছেন? নদীর স্রোতে যতই বাধা পড়িতেছে; তাহার বেগ ততই বাড়িতেছে; কেননা নদী সত্যের জোরে বলবতী, সে জানে সাগরের সঙ্গে মিশিতে কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না, সে শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাগরের সঙ্গে মিশিবেই মিশিবে। আমাদের সেই রূপ সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—শত বাধা-বিঘ্ন তৃণের ন্যায় পদদলিত করিয়া অচল—অটল বীরের মত আপন লক্ষ্য পথে ছুটিয়া যাইতে হইবে। বিপদ-আপদ, নিন্দা-গঞ্জনা, অপমান-লাঞ্ছনা, ভগবানের স্নেহাশীর্ব্বাদ—সত্যপথে—লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার উপকরণ বলিয়া অবনত মস্তকে সাদরে গ্রহণ করতঃ—আপন ভাবে ঠিক থাকিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, দেখিও যেন পদস্খলন না হয়, কাহার সাধ্য আমাদিগকে ফিরাইয়া রাখে—কাহার সাধ্য আমাদের একগাছ চুল স্পর্শ করে? সত্যলাভ আমাদের করতলগত।

সূর্য্যবংশাবতংস দিলীপনন্দন ভগীরথ বুঝিয়া ছিলেন "এগিয়ে যাও" কথার অর্থ কি? তিনি বুঝিয়া ছিলেন "এগিয়ে যাও" কথায় কি সত্য নিহিত আছে। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, পাতালে কপিল মুনির শাপে ষাইট হাজার সগরসন্তান ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূত সলিলা গঙ্গার স্পর্শ ব্যতীত তাঁহাদের উদ্ধার নাই, তিনি পিতৃকুল উদ্ধার করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে চলিলেন; তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাকে বহুদিন তপস্যা করিতে হইয়াছিল—তাঁহার একাগ্রতা, এক নিষ্ঠায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণ কালে মহাদেব ব্যতীত কে গঙ্গাকে ধারণ করিবে? তাই তাঁহাকে দেবাদিদেব—গঙ্গাধরের কৃপা লাভের জন্য পুনরায় তপস্যা করিতে হইয়াছিল। গঙ্গাদেবী ব্রহ্মলোক হইতে হিমালয়ে পতিত হইলেন,—এখানে আবার ভগীরথকে দেবরাজ ইন্দ্রদেবের ঐরাবত হস্তীর কৃপালাভের জন্য পুনরায় সাধনা করিতে হইয়াছিল। ঐরাবত দন্ত দ্বারা হিমালয় ভেদ করিয়া দিলেন—গঙ্গোত্রী পথে গঙ্গাদেবী সগর বংশ উদ্ধার করিতে চলিলেন; পথে জহ্নু মুনি গঙ্গানদী গণ্ডূষে পান করিলেন; কিন্তু তিনিও ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় কৃপা পরবশ হইয়া আপন উরুদেশ ভেদ করতঃ গঙ্গানদীকে বাহির করিয়া

দিলেন—এই জন্য গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী। গঙ্গাদেবী সগর বংশ উদ্ধার করিলে; সগর বংশ হইতে সাগরের উৎপত্তি হইল আর ভগীরথের একাগ্রতা—একনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ গঙ্গা, "ভাগীরথী" নামে বিখ্যাত হইয়া অদ্যাপি ধরাধাম পবিত্র করিতেছেন।

"এগিয়ে যাও" এই মহামূল্য উপদেশ যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই; তিনি আপন সঙ্কল্পে হিমালয়ের মত অচল অটল—শত বাধা-বিঘ্নে তাঁহার পদস্খলিত করিতে পারিবেনা; বালক ধ্রুব তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। যে দিন বালক ধ্রুব আপন পিতার কাছে বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিষন্ন বদনে নিজ গর্ভধারিণী সুনীতি দেবীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে রাজত্ব কোনছার—ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, সেই মূহুর্ত্তে ভগবৎ-কৃপা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বালক-হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব নিশি যোগে আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে চলিলেন; জননীর অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি কাহাকেও ভয় করেন নাই কিম্বা কিছুতেই পশ্চাৎ পদ হন নাই; ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিয়াও তাঁহার অমিত তেজ-বীর্য্য দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; কারণ তিনি যে "এগিয়ে যাও" মহামন্ত্রে দীক্ষিত। যে ব্যক্তি "এগিয়ে যাও" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাকে কে বিনাশ করিবে? মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ই যে "এগিয়ে যাও" মন্ত্রের অর্থ; সুতরাং "এগিয়ে যাওয়া"তে যে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে, সে কি আর মৃত্যুর বিকট ভ্রূভঙ্গীতে ভীত—সে যে মৃত্যুঞ্জয়, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার রক্ষক। "এগিয়ে যাও" এই অক্ষয় ধর্ম্ম যে পড়িয়াছে—যাহার প্রতি ধমনীতে—প্রতি শিরায় শিরায়—প্রতি অণুপরমাণুতে "এগিয়ে যাও" মন্ত্রের বীজ মিশিয়া গিয়াছে—যে "এগিয়ে যাও" মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সে কি পশ্চাৎপদ হইতে পারে? তাহা হইলে যে "এগিয়ে যাও" মন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। বালক ধ্রুব ধ্রুব হইয়া একাগ্রতার পুরস্কার স্বরূপ ধ্রুব লোকে স্থান পাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একটী গল্প বলিতেন যে, একদা কোন এক ব্যক্তি তাহার গুরু কর্ত্তৃক এগিয়ে যাইতে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সে গুরু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিল, প্রথমতঃ সে লোহার খনি, পরে তামার খনি, তার পর রূপার খনি, এই রূপে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সে সোনা, হীরা, মণি, মুক্তার খনি দেখিতে পাইল এই কথার অর্থ কি? সত্যই কি সে ক্রমে ক্রমে লোহা, তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতির খনি দেখিতে পাইয়াছিল; তা নয়, তিনি এই উপদেশ দ্বারা আমাদের মত বিষয়াসক্ত অন্ধদিগকে বুঝাইলেন যে, ক্রম সাধনা দ্বারা অধ্যাত্মিক জগতে যতই অগ্রসর হইবে—যতই মায়া মোহ কাটিয়া যাইবে—যতই আবরণ উন্মুক্ত হইবে, ততই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিকাশ প্রস্ফুট হইতে প্রস্ফুটতর ভাবে আপনার ভিতর উপলব্ধি করিতে পারিবে, অবশেষে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া যাইবে—আনন্দে আত্মহারা হইবে—

তোমার তুমিত্ব আনন্দঘন ভগবানে বিলীন হইবে, তুমি ধন্য হইবে। আমরা বিষয়ান্ধ তাই তিনি বিষয় দ্বারা আমাদিগকে ভগবানের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। বিষয় দ্বারা কি তাঁহাকে বুঝা যায়? তিনি যে বিষয়ের অতীত, তিনি যে কি-যাঁহারা তাঁহাকে পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। তাঁহাকে পাইলে তুচ্ছ অনিত্য বিষয়-সম্পদ থাকে না, তাঁহার স্বরূপ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি অনির্ব্বচনীয়, আনন্দ প্রদ, চিরসুখ শান্তির আধার, অমূল্য রত্ন; তাঁহার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হইতে পারে না।

"এগিয়ে যাও" ইহা ভগবৎ বাক্য, ইহার মূলে ভগবানের অনন্ত শক্তি নিহিত; যিনি "এগিয়ে যাও" এইবাক্য ভগবৎ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি ত্রিলোক জয়ী, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাবীর অর্জ্জুন সংশয়াকুলচিত্ত হইয়া "যুদ্ধ করিবনা" বলিয়া হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন;—

"তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।

অর্থাৎ--অতএব মনের অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদ-স্থ এই সংযোগকে জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, হে ভারত! উঠ"। এখানে উঠ, অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে এক-নিষ্ঠ হইয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, ইহাই ভগবদাদেশ। অর্জ্জুন ভগবদাদেশে কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধে ব্রতী হইলেন এবং চরমে বিজয়-লক্ষ্মীর অধিকারী হইয়া-ছিলেন।

"এগিয়ে যাও" এই মহাবাক্যে একাধারে সত্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস, একাগ্রতা, একনিষ্ঠা ও সফলতা পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। এগিয়ে যাইতে হইলেই শতবাধা, শতবিঘ্ন, শত বিপদের ভিতর দিয়া পদক্ষেপ করিতে হইবে; যদিও প্রতি পদ-বিক্ষেপে পদস্খলন হওয়ার খুব সম্ভাবনা, তথাপি সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিপদ-আপদই ভাবী সফলতার পরিচায়ক মনে করতঃ অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া—ধৈর্য্যের সহিত একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠ হইয়া—সত্যলাভ (অভীষ্ট সিদ্ধি) নিশ্চয়ই হইবে—এই বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া ফলাফল তাঁহার চরণে অর্পণ করতঃ আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে; কেন না গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;— "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" সুতরাং ফলাফল তাঁর, শুধু কর্ম্মে আমার অধিকার। "এগিয়ে যাও" যাহার জীবনের মূলমন্ত্র,—"এগিয়ে যাও"—এই মহামন্ত্র যাহার জীবনের সার,—জীবনের লক্ষ্য, সত্যলাভ তাহার করতলগত, ইহা ধ্রুব, সত্য যাচিয়া সাধিয়া আপনিই তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। হইতে পারে তাহার একাগ্রতা একনিষ্ঠার, সহিষ্ণুতার পরীক্ষা স্বরূপ দশদিক হইতে নানা বাধা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে; কিন্তু যদি ঐ শুভ মুহূর্ত্তে সে কিছুতেই দমিত না হইয়া অদম্য তেজের সহিত আপন লক্ষ্যে দৃষ্টি রক্ষা করতঃ অগ্রসর হয়—বিপদ-আপদ ত তুচ্ছ, সমগ্র ত্রিভুবন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও কাহারও সাধ্য নাই যে

তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করে? কেন না তখন সে সত্যের জোরে বলীয়ান, সত্যস্বরূপ ভগবান্ তাহার সহায়—সত্য স্বরূপ ভগবান্ তাহার পৃষ্ঠ দেশ রক্ষা করিবেন, তিনিই তাহাকে সম্মুখদিকে ঠেলিয়া দিবেন; সমস্ত বিপদ-আপদ বাত্যাতাড়িত মেঘের ন্যায় কোথায় উড়িয়া যাইবে—তাহার সম্মুখদেশ সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। "এগিয়ে যাও" এই মহামন্ত্র যিনি জীবনের সার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাহাকে আপন লক্ষ্য লাভের জন্য পাগল সাজিতে হইবে—আপন লক্ষ্যে আত্মহারা হইতে হইবে—আপন লক্ষ্য স্থানে পঁহুছা বা লক্ষ্য বস্তু লাভের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে সে আপন অভীষ্টে সাফল্য লাভ করতঃ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

এ সংসারের কে না পাগল? যে, যে বিষয়ে আপন মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে—যে বিষয় কি যে বস্তু লাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই ত সেই বিষয় বা বস্তুর জন্য পাগল। পাগল ভিন্ন কে "এগিয়ে যাইতে" সক্ষম; পাগলই জানে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ কি? পাগলই জানে "এগিয়ে যাওয়ায়" কত সুখ—কত আনন্দ। তাই পাগল আপন ভাবে বিভোর হইয়া "এগিয়ে যায়"। পাগল আপন লক্ষ্যে না পঁহুছা পর্য্যন্ত কিছুতেই ভোলে না বা পশ্চাৎপদ হয় না। পাগল দেখিলে আমরা কতই না উপহাস—কতই না ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকি; কিন্তু স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি, পাগল নয় কে? এই যে ধনমত্ত যুবক অর্থের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, সে কি পাগল নয়? সে ত অর্থের জন্য পাগল সাজিয়াছে। অর্থ লাভই তাহার জীবনের লক্ষ্য—অর্থ লাভই তাহার জীবনের সত্য—অর্থ লাভই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। সে অর্থের জন্য কি না করিতেছে। সে, অর্থ লালসায় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত, সে অর্থ লালসায় কত কষ্ট-কত যাতনা সহ্য করিতেছে—কত বিপদ মাথায় পাতিয়া নিতেছে। সেও ত আপন অভীষ্ট লাভ-লালসায় দ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাইতেছে।

(ক্রমশঃ।)

ডাক্তার—শ্রীরাজচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

সাধ।

মোরে, সকলে ত্যজেছে একে একে একে,
তুমি দূরে যেতে পারিলে না।
আমি, সব ভুলিয়াছি স'য়ে স'য়ে স'য়ে,
তুমি কেন স্মৃতি ছাড়িলে না।
এত, ঘৃণা অনাদরে ছাড়িলে না যদি,
জোরে সকল দখল লও।
তুমি, সব আবরিয়া সর্ব্ব ময় রূপে,
সদা নয়নে লাগিয়া রও।

শ্রীশান্তি—

প্রেমেসমাধি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে,—দুই বন্ধু হাতে হাতে ধরিয়া সরল শিশুর মত হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে। জীবনকুমার ও কৃষ্ণধন পূত সলিলা ভাগিরথীর তীরভূমি অতিক্রম করিয়া হাসিয়া হাসিয়া চলিয়াছে। উর্দ্ধে সুনীল অম্বর সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত অস্তগামী সূর্য্যের সমুজ্জ্বল কর-সম্পাতে ঈষৎ রক্তাভ, ঈষৎ পীতাভ,—ঈষৎ হরিতাভ সুনীল অম্বর; সে অম্বরে যেন রূপের শেষ নাই, যেন সে অম্বর ভগবানের অপূর্ব্ব চিত্র লইয়া খেলিতেই ভালবাসে, যেন তাহাতেই মুগ্ধ,—তাহাতেই সুখী। মস্তকোপরি সুনীল বিমান হাস্যময়, পার্শ্বে বেগবতী তরঙ্গিণী হাস্যময়ী,—সকলই যেন হাসিতেছে,—সকলই যেন আনন্দে ভরপুর।

রাস্তার ধারে এক বৃদ্ধা,—দারিদ্রের কঠোর পদাঘাতে সে শীর্ণ; তদুপর অন্ধ। অন্ধ চক্ষে জলধারা বহিতেছে, কাতর স্বরে বলিতেছে, "বাবা আমায় কিছু ভিক্ষা দেও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

কৃষ্ণধন ও জীবনকুমার সেই বৃদ্ধার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কাতর-কণ্ঠ,—তাহার অভুক্ত কাতরকণ্ঠ,—তাহার অশ্রু বিগলিত গদগদ কাতরকণ্ঠ,—দারিদ্রের কঠোর নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট কাতর কণ্ঠ—কৃষ্ণধনের হৃদয় বিদ্ধ করিল। সে মনে ভাবিল, হায় আমি যদি এরকম দরিদ্র হইতাম, আমি যদি এমন কষ্টে পড়িতাম, আমার যদি ইহার মত ভিক্ষা লব্ধ চারিটী অন্ন দ্বারা দিনান্তে উদর পূর্ণ করিতে হইত, তাহা হইলে কত কষ্ট হইত। হয়তো সকল দিন খাইতেও পাইতাম না। হায়, এরা কত কষ্ট পায়; ভগবান্, তুমি নাকি দয়াময়, দরিদ্র-দুঃখ মোচনের জন্য যদি তুমি দয়াময় হইয়া থাক, তবে তোমার দয়াময় নামে ত কলঙ্ক স্পর্শিল। আমি তাহা সহিতে পারিব না। লোকে তোমায় নির্দ্দয় বলিবে,—লোকে তোমায় নিষ্ঠুর বলিবে, আমি কিরূপে সহিব? আমি তাহা পারিব না। অথবা তুমি মঙ্গলময়,—এ দরিদ্রতাও হয়তো ইহার মঙ্গলের জন্যই দিয়াছ; কর্ম্মফল খণ্ডনের জন্য, শত লক্ষবার জঠর জ্বালায় কথঞ্চিৎ নিবৃত্তির জন্য, তোমার মঙ্গল বিধানে এ দরিদ্রতাও ইহার মঙ্গলেরই জন্য দিয়াছ! তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমরা মূঢ়, তোমার চির মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তির নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম, তাই তোমায় কত সময় কত কটু কথা বলি! যাহা হউক, ভগবান, আমাকে দরিদ্রের কষ্ট বুঝিতে দিও; আমাকে—"

হায়, একি! কোথা হইতে একটী উন্মত্ত অশ্ব তাহার শকট সহিত বৃদ্ধার উপরে আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কৃষ্ণধন চক্ষের নিমিষে বৃদ্ধাকে জড়াইয়া ধরিল। কৃষ্ণধনের পায়ের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া গেল। রক্তের ধারা ছুটিল;—তবুও

হাসি হাসি মুখে কৃষ্ণধন ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিল; যেন বলিল,—দয়াময় প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ, আজ আমি এই বৃদ্ধাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, আমার কায়মনপ্রাণ দ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক,—তবেই এ দুর্লভ মানব জন্ম সফল। তাই করিও প্রভু, আমার এ অকিঞ্চিৎ কর দেহ যেন আমি পরার্থে উৎসর্গ করিতে পারি।

ধন্য কৃষ্ণধন, ধন্য তুমি, এমন নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে তুমিই শিখাইতে পারিবে; সর্ব্ব জীবে ভালবাসা, এক কথায় যাহাকে বিশ্বপ্রেম বলে তাহা তোমাতেই সম্ভবে।

জীবনকুমার এতাদৃশ অলৌকিক দয়া দেখিয়াই হউক, আর সম্মুখে এরূপ ভয়াবহ আশ্চর্য্য ঘটনার উপস্থিতিতেই হউক, কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নিশ্চল, নিস্পন্দ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল।

অতিরিক্ত ও প্রবল বেগে রক্ত পড়ায় কৃষ্ণধনের শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিল,—যেন সমস্ত জগতে কে কালী ঢালিয়া দিল। ক্রমেই শরীর অবশ, হস্তপদ অসাড় ও মন অচৈতন্য হইয়া পড়িল। জীবনকুমার অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণধনের অচেতন দেহ ক্রোড়ে করিয়া দ্রুত গতিতে কৃষ্ণধনের বাসায় লইয়া গেল।

—আর বৃদ্ধা, বৃদ্ধা স্বীয় অন্ধতা প্রযুক্ত কি হইল বুঝিতে না পারিয়া এতক্ষণ মাটিতেই পড়িয়া ছিল। ঘটনাস্থলে বহুলোক জমিয়াছিলাছে, বৃদ্ধা তাহাদের নিকটে কৃষ্ণধনের অসীম সাহস ও দয়ার কথা শুনিয়া এবং ঘটনার বিষয় বুঝিতে পারিয়া দুই হস্ত তুলিয়া কৃষ্ণধনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা, আজ তোমার বড় সৌভাগ্য, মহাপুরুষ কৃষ্ণধনের কৃপায় আজ তুমি পুনর্জ্জীবন লাভ করিলে; ভগবানের অসীম করুণারাশি কৃষ্ণধনের হৃদয়ে বিকশিত হইয়া তোমাকে আজ এমন দয়া করিল; তাই বলিতেছি আজ তোমার বড় সৌভাগ্য। এমন ধন হৃদয়ে লইয়াছিলে, যাহা সাধ্য সাধনা করিয়াও মিলে-না। —তাহাকে তুমি অযাচিত ভাবে পাইয়াছিলে। তাই বুঝি,—তাই বুঝি বৃদ্ধা এতক্ষণও কিছু বলে নাই, বোধ হয় কৃষ্ণধনকে হৃদয়ে ধরিয়া বড় শান্তি পাইয়াছিল, ভাবিয়াছিল এমন সুখ, এমন শান্তি বুঝি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। হায় বৃদ্ধা, তুমিও আজ ধন্য হইলে; তোমার সেই দরিদ্রতাই তোমায় আজ এমন রত্ন মিলাইয়া দিল। দরিদ্রতা, তুমিও সময়ে সুখপ্রসবিনী। থাক বৃদ্ধা ঐ ভাবেই বসিয়া থাক, বল, আবার বল, "বাবা আমায় কিছু ভিক্ষা দাও।"

পাঠক! লেখকের বড় ইচ্ছা হইতেছে, কৃষ্ণধনকে দেখিতে যায়; আপনি তাহার সাথী হইবেন কি? অন্যের বেদনার সমভাগী হইলে পুণ্য আছে; সে পুণ্যলাভে আমরা বঞ্চিত হইব কেন? বিশেষতঃ এমন মহাপুরুষের সমবেদনার ভাগী হইলে,—যিনি স্বীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার দুঃখে দুঃখ, তাঁহার সুখে সুখ প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই পুণ্য আছে।

জীবনকুমার আহার নিদ্রা ভুলিয়া কৃষ্ণধনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণধন তাহার হাতে হাত রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক কথা বলিতেছে। পাঠক হয়তো ভাবিয়াছেন, কৃষ্ণধন নিদারুণ যাতনায় কাতর হইয়া উপাধান অশ্রুসিক্ত করিতেছে; কিন্তু তাহা নহে, পরের দুঃখে যে দুঃখী, পরের বেদনায় যে ব্যথী, পরের কাতরতায় যে কাতর সে নিজের বেদনা অনুভব করিবার অবসর পায় কি? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত লোকের মানস দুঃখে,—অনন্ত লোকের অনন্ত কষ্ট-সাগরে যে মহাপুরুষ সাঁতার দিয়াছেন তিনি পরের দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত, নিজের দুঃখের কথা তাঁহার মনে হয় না। কৃষ্ণধনও জগতের দারিদ্র-দুঃখে আজ বড় কাতর হইয়াছে, তাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমপ্রাণ ব্যথার-ব্যথী জীবন কুমারকে বলিতেছে, ভাই, আর ভোগ-বিলাসে মন যায় না, আর দুটী সুপক্ক অন্নব্যঞ্জন মুখে দিতে অভিলাষ হয় না। যখনই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বসন খানি পরিধান করিতে যাই, তখনই মনে হয় যেন আমার দিকে এক কালে সহস্র সহস্র দরিদ্রের কাতর নয়ন চাহিয়া চাহিয়া বলিতেছে,— তুমি কেমন করিয়া, কোন্ মুখে ঐ সুন্দর কাপড় খানি পরিধান করিতেছ? দেখ, আমরা প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ রহিয়াছি; ছিন্ন, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট মলিন ধূলি-ধূসরিত এই বসন পরিয়াছি, তুমি কোন সাহসে অমন নব বস্ত্র খানি হাতে লইয়াছ? ফেলিয়া দাও ও কাপড় খানা, আমরা পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করি। যখনই আহার করিতে বসি তখনই মনে হয়, যেন আমি সহস্র দরিদ্র কণ্ঠের কাতর ক্রন্দন শুনিতেছি; কেহ যেন বলিতেছে, আমি আজ তিন দিন অভুক্ত,—কেহ বলিতেছে, আমি আজ দুই দিন অনাহারে,—কেহ বলিতেছে, আমি আজ কিছুই খাই নাই, আমায় দুটী ভাত দাও, আমার প্রাণ শীতল হউক,—আমার এ জ্বালার নিবৃত্তি হউক। বল ভাই, এমন অবস্থায় কাহার আর আহারে প্রবৃত্তি হয়? আমরাতো প্রত্যহই নানাবিধ সুখাদ্য খাইয়া থাকি, তাহারাতো কিছুই পায়না, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও এক মুঠা চাউল পাইতেছে না। আমরা কত মিঠাই মণ্ডা, কত ক্ষীর সর নবনী দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া থাকি; আর তাহারা, একমুষ্টি উদরান্নের জন্য রাস্তায় বসিয়া হাঁকিতেছে,—"বাবা, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও।" আমরা যাহা খাই তাহা কি তাহাদের খাইতে ইচ্ছা করেনা? আমরা যাহা পরিধান করি তাহা কি তাহাদের পরিতে একটুও ইচ্ছা করেনা? হায়, কোথায় পাইবে। মনে ভাবে আমি দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,—অশ্রুনিষিক্ত নয়নে মনে ভাবে, আমি দরিদ্র,—ভগবানের রাজ্যে আমি দরিদ্র,—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে আমি দরিদ্র। নিজেই নিজকে সংযত করিয়া মনে মনে যেন বলে,—নয়ন সংযত হও ওদিকে চাহিওনা,—তুমি দরিদ্র; জিহ্বা সংযত হও উহা আকাঙ্খা করিওনা,—তুমি দরিদ্র; মন উতলা হইওনা স্থির হও,—তুমি দরিদ্র। কৃষ্ণধন আর বলিতে পারিল না কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াবীর, তুমি জগতে প্রকৃত দয়ার আদর্শ। ক্ষণেক পরে সেই বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বলিল, ভাই, আমরা অসম্পূর্ণ কিন্তু তথাপি মনে মনে বড় সাধ হয়, জগতের দারিদ্র-দুঃখ বিমোচন

করিতে চেষ্টা করি। তাইবা বলি কি করিয়া, ভগবান্ সম্পূর্ণ,—কই তবে কেন জগৎ দরিদ্রে পরিপূর্ণ? তিনি কি এদের কষ্ট দেখিয়া কাঁদেন না? কাঁদেন বই কি। কিন্তু কি করিবেন, যাহার যেমন কর্ম্মভোগ। তাঁহার মায়ার সংসারে সাধের জীবকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সঙ্গে দিয়া দিয়াছিলেন মন। যে যেমন বুনিয়াছে, সে তেমনই কাটিয়াছে। তবে যথা সাধ্য কাহারও উপকার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেটাও ভগবানেরই অভিপ্রেত,—সেটাও যাহার যাহার কর্ম্মফল। পরের দুঃখ মোচনে যত আনন্দ এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই নাই। দেখিবে এমন পবিত্র নির্ম্মল আমোদ আর কিছুতেই পাও নাই। কাহারও তৃষিত কণ্ঠে একটুকু বারি প্রদান করিলে, সে যখন তৃপ্তির নির্ম্মল উচ্ছ্বাসে "আঃ" করিয়া সমগ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায়, তাহার জীবন দাতার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে তাকায়, তখন সে আনন্দের কাছে, পার্থিব আনন্দ কোন ছার। ঈদৃশ দরিদ্রের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত যার সম্মতি হয় না, সে নিজকে লইয়াই থাকুক, সে সমাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; আমি তাহাকে মানুষ বলিব না। এই বলিয়াই কৃষ্ণধন বাহিরে গেল, জীবন্‌কুমার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণধন, তুমি না বলিয়াছ তুমি অসম্পূর্ণ, লেখকের সবিনয় অনুরোধ তাহা তুমি ফিরাইয়া লইতে পারিবে কি? ভগবানের কাছে তুমি অসম্পূর্ণ হইতে পার, কিন্তু আমাদের চক্ষে, সমাজের চক্ষে, সমগ্র মানব জাতির চক্ষে তুমি পূর্ণ; ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টিতে তোমাকে সম্পূর্ণ বই আর কি বলিব?

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—:0:—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সতী-শতক। শ্রীমতী নির্ম্মলা বালা চৌধুরাণী-প্রণীত। লেখিকা, হিন্দু শাস্ত্র হইতে একশত সতী রমণীর জীবন চরিত সংগ্রহ-সংকল্প করিয়া "সতী-শতক" ১ম খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে পদ্মা, ধন্যা, সুকন্যা, রেণুকা, চন্দ্রবতী, কালিন্দী, সুশোভনা, মনোরমা, প্রতিব্রতা, বেদবতী, এই দশটী সতীর বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র। আট মাস মধ্যে ২য় সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুসমাজে পুস্তক খানি সমাদরে গৃহিত হইতেছে। সতীর মুখে সতীর কথা—সতীর লেখা সতী-শতক পড়িয়া আমাদের কত আশা জাগিল, পবিত্র হৃদয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে আমরা কি বলিয়া উৎসাহিত করিব। বঙ্গ-মহিলাগণের মধ্যে অধিকাংশের লেখায় জননী হৃদয়ের অমৃত-মধুর ভাব না ফুটিয়া, রমণী হৃদয়ের গু'ড়ে মধুর্য্য ফুটিয়া উঠে, হিন্দু নারীর রুচি ও শিক্ষা দিন দিন বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। এহেন দিনে লেখিকা সতী-জীবনী বাহির করিয়া আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদের পাত্রী হইয়াছেন। "সতী-শতক" হিন্দু নারীদিগের অধ্যয়নোপযোগী সদুপদেশ পূর্ণ একখানি

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রকাশক একটু যত্ন করিলে পুস্তক খানির মধ্যে এত বর্ণাশুদ্ধি দেখিতে পাইতাম না।

———0———

সাধু রামকৃষ্ণ। শ্রীমনোমোহন দাস গুপ্ত-প্রণীত। পাবনাজেলার অন্তর্গত দৈব্যজামতৈল গ্রামে সূত্রধর-কুলে রামকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত হইলেও উদার ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন; লেখক এই গ্রন্থে তাঁহারই পবিত্র জীবনের আলোচনা করিয়াছেন। সাধু-ভক্তের জীবন-চরিত্র আস্বাদ্য;—সমালোচ্যনহে। গ্রন্থমধ্যে যে প্রেমধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, তাহার মতামতের পবিত্রতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার পুত্রের নামে পুস্তক খানি উৎসর্গ করিয়া প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। লিখিবার কায়দাও লেখকের মৌলিক। আমরা সাধু-চরিত্র পড়িয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

———0———

গো, গঙ্গা ও গায়ত্রী। শ্রীজানকী নাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত প্রকাণ্ড পুস্তক, মূল্য এক টাকা মাত্র। দি হোয়াইট্ লোটাস্ পাবলিসিং কোং, ২নং কৈলাসদাসের লেন, পোঃ আঃ বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা; এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

বর্ত্তমান কালে শিক্ষা ও সংসর্গের গুণে আর্য্যজাতি গোসেবা ছাড়িয়াছে, গঙ্গা মাহাত্ম্য ভুলিয়াছে ও গায়ত্রী তত্ত্ব হারাইয়াছে; তাই আজি হিন্দু সমাজের এ দুর্দ্দশা। দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে গো, গঙ্গা ও গায়ত্রী মাহাত্ম্য লিখিয়া গ্রন্থকার ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন। এই পুস্তকে হিন্দুর সদাচার ও নিয়ম-নিষ্ঠার আলোচনা যুক্তি-প্রমাণের সহিত করা হইয়াছে। নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্র হইতেই লেখক আপন বক্তব্য বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি যে সময়োচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষের "আর্য্যশিক্ষা" বা "ব্রহ্ম-চর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধ আর্য্য-সমাজ সংস্থাপনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। হিন্দু মাত্রেরই গো, গঙ্গা ও গায়ত্রীতত্ত্ব জানা একান্ত কর্ত্তব্য।

———0———

আসামবিলাসিনী। যোরহাট তরাজান ধর্ম্ম প্রকাশ প্রেস হইতে প্রকাশিত অসমীয়া সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র। প্রতি বৃহস্পতিবারে বাহির হয়। এই সংবাদ পত্রখানি ভাদ্রমাস হইতে নূতন বাহির হইতেছে। শিবসাগর জেলায় কোন সংবাদপত্র ছিলনা, সহযোগিনী সে অভাব পূর্ণ করিলেন। আমরা নূতন সহ-যোগিনীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

———0———

আশ্রম-সংবাদ।

বন্যার্ত্ত সেবা। অত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতনের ডাক্তার ও সেবকগণ মেদিনী পুর—হাঁড়িয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে কাঁথিতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন

কাঁথির সহযোগী "নীহার" (১৪ আশ্বিন) লিখিয়াছেন,—"আসাম, যোরহাট নিগমানন্দ স্বামীর কোকিলামুখ আশ্রমের 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক সমিতির' কতিপয় সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া বিপুলভাবে কার্য্যারম্ভ করিতেছেন।" সেবকগণের কার্য্য-বিবরণ বঙ্গবাসী, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে। হাঁড়িয়া অঞ্চলে সেবক-গণ কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে একখানি পত্র মুদ্রিত হইল।

পূজ্যপাদ পরমহংস দেব!

আমরা খণ্ড প্রলয়ের জলপ্লাবিত প্রদেশের অধিবাসী। আমাদের এখানকার দীন-দুঃখী প্রজাগণ অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, এমতাবস্থায় বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আপনার "শান্তি-আশ্রম" হইতে আগত ডাক্তার স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী যোগানন্দ স্বামী চিদানন্দ ও সুরেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আগমনে আমাদের দেশ পবিত্র করণান্তর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাগণকে অকাতরে চাউল, কাপড় ও পীড়িত-গণকে শাগু, মিছরী আদি বিতরণে আমাদের হৃদয়ে নানারূপ আশার সঞ্চার আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অদ্যাও চাউল বিতরণ করিতেছেন। মধ্যে কয়েক দিন অন্যান্য অনেক গ্রামে উক্তরূপ বিতরণ করিয়া যারপর নাই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শুনিতেছি; তাঁহারা ২।১ দিন মধ্যে আমাদের দেশের দক্ষিণ, কাঁথি অঞ্চলে গমন করিবেন। তাঁহাদের উক্তরূপ চলিয়া যাওয়ায় আমাদের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতেছে। কারণ আমাদের এ অঞ্চলের প্রজাগণ অন্য কোনও কমিটির নিকট হইতে কোন রূপ সাহায্য পাইতেছেনা এমতাবস্থায় আমাদিগকে উঁহারা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় আমাদের দীন দুঃখী প্রজাগণের কষ্টের অবধি থাকিবে না। যাহাহউক ডাক্তার মহাশয় ও স্বামিজীগণের গুণে আমরা বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। পূজনীয় ডাক্তার স্বামি স্বরূপানন্দ হেঁড়িয়া পোষ্টাফিসের নিকট একটী কলেরা রোগীকে বিনা ঔষধে অত্যাশ্চর্য্য-রূপে আরোগ্য করিয়াছেন; এরূপ মহাত্মা পরম দয়ালু স্বামীজীগণ আমাদের এ অঞ্চলের দীন দুঃখী প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাওয়ায় আমাদের হৃদয়ে বড়ই ব্যথা অনুভব করিতেছি। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও কলেরা, জ্বর প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। আমাদের গ্রামের অনতি দূরে ২॥ মাইল তফাতে "সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটী" অদ্য মাসাতীত হইল কার্য্য আরম্ভ করিয়া চাউল বিতরণ করিতেছেন; কিন্তু আমরা অনেক বার গিয়া নানা রূপ অনুনয় বিনয়ে গরিব-দুঃখীদিগকে এক মুষ্টিও চাউল দেওয়াইতে পারি নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন আরও অনেক গ্রাম রহিয়াছে, তাহারাও কিছুমাত্র সাহায্য পায় নাই; কেবল স্বামিজীগণের নিকট হইতে পাইয়াছে মাত্র। অনেক ভদ্রলোক ও দীন দুঃখী প্রজাগণকে সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর ভলেণ্টিয়ার ও ক্যাপ্টেন প্রভৃতি অযথা গালাগালি করে, সমস্ত দিন বসাইয়া রাখিয়া সন্ধ্যায় রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিয়া থাকে। ইহার বিশেষ

বিবরণ স্বামীজীগণের নিকট অবগত হইবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি; ২৩সে সেপ্টেম্বর।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীশশীভূষণ ভুঁইয়া।

গ্রাম মোহার্টী, পোঃ হড়িয়া।

জেলা মেদিনীপুর।

———0———

সেবা-সমিতির কার্য্যাদি জানাইবার জন্য স্বরূপানন্দ স্বামী মহারাজ স্থানীয় সবডিভিসনাল আফিসার মিঃ হগ সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন; তিনি সেবকদিগের কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মানচিত্র আঁকিয়া দিয়া এবং আবশ্যকমত পরামর্শ দিয়া সেবকগণকে সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় কাঁথি গিয়াছিলেন; তিনি সেবকগণের কার্য্যে প্রীত হইয়া নানা প্রকারে সাহায্য করিতেছেন। ইংলিশম্যান্ ষ্ট্রেটস ম্যান্ প্রভৃতি সংবাদ পত্রে সেবকগণের সেবা-বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। মেদিনীপুরের মাননীয় শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাঁথি অঞ্চল পরিদর্শন করিতে আসিয়া সেবক গণের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যে পত্র দিয়া গিয়াছেন, নিম্নে অবিকল মুদ্রিত হইল।

"Pandit Satya Charan Sastri and Swamy Sharupananda have come to contai to organise gratuitious relief in a portion of the flooded area. They have expressed their desire to work in co-operation with the officials in charge of the various areas, who, I am sure will be very glad to avail themselves of the offer and give them every assistance they can. I very much appreciate the desire to help that they have shown"

Sd. F. B. BRADLEY BART
District Magistrate
Midnapore.
29. 9. 13

———0———

বর্দ্ধমান—কুলগেরিয়া সেন্টারে অত্র আশ্রমের শ্রীসারদাচরণ ব্রহ্মচারী কতিপয় স্বেচ্ছাসেবকের সহিত কার্য্য করিতেছেন। কাঁথিতে সকলে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য স্বরূপানন্দ মহারাজ তাঁহাকে তথায় যাইতে লিখেন; কিন্তু বর্দ্ধমানের সেণ্ট্রাল রিলিফ ক্যাম্পের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তাঁহার কার্য্যে এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চান না এবং সে জন্য কাঁথিতে স্বামীজীকে অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছেন আমরা আসাম ও বঙ্গদেশের সহৃদয় নর-নারীগণকে সানন্দে সেবাকার্য্যে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। যাঁহার যাহা সাধ্য, তিনি তাই লইয়া অগ্রসর হউন। কালের ভেরী বাজিয়াছে; আর কেহ নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবেন না। বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে কলেরা দিন দিন করাল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; অন্ন বস্ত্রগৃহাভাবে এবং রোগ-শোকে তদ্দেশবাসী কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, একবার ভাবুন—চিন্তাকরুন, অনুসন্ধান করুন, তারপর আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া—"আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু" এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

———0———

প্রাপ্তি স্বীকার। আলিপুর-দুয়ারের শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা চৌধুরাণী তত্রত্য মহিলাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষাকরিয়া ৪৩ টাকা পাঠাইয়াছেন। আমরা স্বর্ণমার কর্ত্তব্য পরায়ণতার এবং আলিপুরের মাতৃবর্গের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এতদ্ভিন্ন শ্রীপ্রিয়লাল পাল ২৫ ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় ১০ শ্রীহরকুমার ঘোষ ৩ শ্রীবনমালী সরকার ১ কোকিলামুখ ষ্টেশন ষ্টাফ্ ১॥০ খুচরা ১৫০ পূজার পূর্ব্ব হইতে আমরা বাহির পর্য্যন্ত এই টাকা পাইয়াছি। আর ঐ পর্য্যন্ত সেবকগণের হাতে দুই হাজারের অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। যে যাহা দিবেন, সাদরে গৃহিত হইবে।

———0———

বার্ষিক উৎসব। বর্ত্তমান মাসের ২৩শে (১২ই ডিসেম্বর, দিল্লি দরবারের দিন স্থাপিত) শুক্রবার "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের" ৩য় বার্ষিক উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পূজা, পাঠ, হোম এবং শ্রীশ্রী৺নাম সংকীর্ত্তন হইবে। দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনই এই দিনের বিশেষ ব্যাপার। আমরা সাধু-ভক্ত, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি। ২৮শে রবিবার কার্য্যকারিণী সভার অধিবেশন হইবে।

———0———

পুস্তকাগারের চাঁদা। আশ্রমের লাইব্রেরীর জন্ত যাঁহারা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাঁহারা প্রতি বর্ষের কার্ত্তিক মাসেই দিয়া থাকেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া দাতাগণ স্ব স্ব দেয় চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া দিবেন।

———0———

সেবা বিভাগ। সন ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে পাঁচিয়া নাম্নী একটী কুলিরমণী এবং ফাগুয়া নামক এক ব্যক্তি "গৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতনের" সেবা বিভাগে আশ্রয় লইয়া ছিল। ফাগুয়া দুষ্ট ক্ষত রোগে এবং পাঁচিয়া গর্ভাবস্থায় নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা সেবক-সেবিকাগণের সেবাশুশ্রূষায় এবং নয় মাস কালের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করতঃ গত আষাঢ় মাসে দেশে গমন করিয়াছে। এক্ষণে সেবাবিভাগে একটী মহারোগী, একটী ক্ষয়রোগী এবং একটী জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ অবস্থান করিতেছে। অন্য যে তিন জন কুষ্ঠরোগীকে সাহায্য করা হইতেছিল, তন্মধ্যে যেড়হাটের রামকলিতার মৃত্যু হইয়াছে।

———0———

মহাপূজা। বন্যার্ত্ত সেবকগণের পক্ষ হইতে স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, ৺শারদীয়া মহাষ্টমীর দিন কাঁথিতে মহামায়ার বিরাট্ ভোগের আয়োজন হইয়াছিল। প্রায় ১৬ শত নর-নারায়ণের পূজা হইয়াছিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আগমন করিয়াছিল। এই সময়ে ১টী শিশু মারা যায় এবং একটী গর্ভিণী প্রসূতা হইয়াছিলেন। দশমন ডা'ল চা'লের খিচুড়ীতে ১৬ শত লোকের আকণ্ঠ হওয়া আশ্চর্য্যের কথাবটে; জগন্মাতা অন্নপূর্ণার আবির্ভাব ব্যতীত এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারেনা। বঙ্গবাসি! আদর্শ মায়ের পূজার এ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত আর কি আছে? মায়ের দোলায় গমণের পর উক্ত দেশে রোগাদি করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ভায়েরা ভাইগণকে রক্ষা কর।

———:0:———

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

এগিয়ে যাও।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই যে কামান্ধ যুবক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কত শত উপায় কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছে—সতীর সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য কত প্রকার ফাঁদ পাতিতেছে,—কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছে—গুরু লঘু মানিতেছে না,—আপন পর ভুলিয়া যাইতেছে—পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ভগবান্‌কে চিরতরে অন্তর হইতে বিদায় দিয়া অহংত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছে—সতীর কাতর ক্রন্দনে উপহাসকরতঃ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, আর কামভাবে সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ হাসিমুখে আপন পাপবাসনা জ্ঞাপন করিতেছে কেন? সে কি কামে আত্মবিস্মৃত হয় নাই? কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কি তাহার জীবনের লক্ষ্য—জীবনের মূলমন্ত্র হয় নাই? সে ও তৎকামে আত্মহারা হইয়া সমাজের নিন্দা, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, এমন কি অপমান গ্রাহ্য করিতেছে না এইরূপ এই সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে দেখিবে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে পাগল সাজিয়াছে।

আবার এই যে মহাপুরুষ আপন স্ত্রী-পুত্র ধন সম্পত্তি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানকে লক্ষ্য করতঃ ধ্যানস্তিমিত-লোচনে বসিয়া আছেন, তিনি কি পাগল নন? তিনিই ঠিক পাগল, লোকে তাহাকেই পাগল বলে। কিন্তু এরূপ পাগল হওয়ায় যে কি সুখ, কি আনন্দ, তাহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবই বুঝিয়াছিলেন পাগল হওয়া কি সুখ—এগিয়ে যাওয়া কাহাকে বলে। তাই তিনি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য দেবতাদিগকে বিলাইয়া শ্মশানে

আপন আবাস ভূমিকল্পিয়াছেন—মণি মুক্তার মালা অনিত্যবোধে পরিত্যাগ করতঃ হাড়-মালা আপন অঙ্গের ভূষণ—সুগন্ধ চন্দনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্মদ্বারা অঙ্গ লেপন—দিব্য বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ বাঘছাল পরিধান করিয়া তিনি আপন ভাবে পাগল সাজিয়াছেন; তাই তিনি পাগলা ভোলা। কিন্তু এ পাগল কি আপন লক্ষ্য ভুলিয়াছে? আপন লক্ষ্যে বিভোর না হইলে—পাগল না সাজিলে এ সংসারে কেহই "এগিয়ে যাইতে" সক্ষম হইবে না। যদি সত্যলাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য হয়—যদি "এগিয়ে যাওয়াই" জীবনের মূলমন্ত্র হয়, তবে আপন ভাবে পাগল হইতে হইবে—আপন ভাবে ডুবিয়া যাইতে হইবে—আপন ভাবে আত্মহারা হইতে হইবে। সমগ্র জগৎ তুচ্ছ করতঃ পাগলা ভোলার ন্যায় আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। যে পাগল, "এগিয়ে যাওয়া" তাহার স্বাভাবিক; আবার "এগিয়ে যাওয়া" যাহার জীবনের মূল মন্ত্র, তাহাকে পাগল সাজিতে হইবে,—পাগল না সাজিয়া তাহার উপায় নাই। অহো! পাগল ভোলার মত ভাগ্যবান্ কে গো! ভোলা ত সব ভুলিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া কি ভোলা আপন লক্ষ্য ভুলিয়াছে? ভোলা সত্য-লাভের জন্য ত্রিজগৎ ভুলিয়াছে তাই সে ভোলা—তাই সে পাগল; ভোলা জগৎ ভুলিয়াছে, জগতের নিকট পাগল সাজিয়াছে বটে; কিন্তু জগৎ কি তাহাকে ভুলিয়াছে? তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিবার জন্য প্রকৃতি মোহিনী বেশে তাঁহার অঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। ভোলাও আবার আপন ভাবে ভুলিয়া প্রকৃতিকে আপন বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া ভোলা আপন ভাব ভুলেন নাই, কিম্বা প্রকৃতির মোহিনী বেশে মুগ্ধ হন নাই। আহা এ দৃশ্য কত সুন্দর! কত মধুর! এ ভাব কত উচ্চ যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য! এ পাগলের পাগলামীতে যে কত মধু তাহা পাগলেই জানে। পাগলা ভোলা পাগল বলিয়াই তাহার নাম দেবাদিদেব মহাদেব—তাঁহার আসন সকলের উচ্চে।

ভ্রাতৃগণ! ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক এগিয়ে ত সকলেই যাইতেছ,—পাগল ত সকলেই সাজিয়াছ, তবে এ ভুল কেন? সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বলিয়া তোমার অভিমান—মানুষ বলিয়া তোমার অহঙ্কার; বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তি তোমার অঙ্গের ভূষণ; তুমি ভাল মন্দ সব বিচার করিতে পার, তবে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লও না কেন? কেন বিপথে ঘুরিয়া সময় হারাইতেছ? যাহা আজ করিতে পার তাহা কেন আগামীর জন্য রাখিয়া দিতেছ? হা'ল একটু ঘুরাইয়া ধরি-লেই ত সব ঠিক হইয়া যায়—অতি সহজেই লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতে সক্ষম হইবে। তুমি ঠিক পথে যতই অগ্রসর হইবে, ততই পথ কমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিবে। তুমি যতই অগ্রসর হইবে ততই সত্যের উজ্জ্বল আলোক তোমার নয়নপথের পথিক হইবে, গন্তব্য স্থানের সুশীতল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোল তোমার শ্রান্ত অঙ্গের ক্লান্তি অপনোদন করিবে—গন্তব্যস্থানের নিদর্শন তোমার চোখে পড়িবে। তুমি সত্যের রাজ্যে প্রবেশ

করিতেছ, গন্তব্য স্থান তোমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে ইহা তুমি যতই বুঝিতে পারিবে ততই তোমার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে—হৃদয়ে নূতন বল পাইবে—নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইবে। আহা! সে সময়ে যে কি আনন্দ, সে আনন্দ ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিতে অক্ষম। আমাদের ক্ষুদ্রজীবনের সামান্য সামান্য ঘটনা দ্বারা এ আনন্দ সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু কখনও কি কেহ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি? যখন সুদূর প্রবাস হইতে প্রবাসী আপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাহার মনে কত আনন্দ, সে কত আশাই না হৃদয়ে পোষণ করে? সে যতই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হয় ততই বাড়ীর নানারূপ নিদর্শন তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়; আর যখন সে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীতে পঁহুছে, তখন তাহারই বা কত আনন্দ আর তাহার পিতামাতা ভাই ভগ্নীরই বা কত আনন্দ! সে মিলন কত মধুর তাহা প্রবাসী জানে! এ'ত গেল স্থূল জগতের কথা, অন্তর্জ্জগতের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। কেননা অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত জগতই একসূত্রে একভাবে গাঁথা; কাহার সঙ্গে কাহার অমিল নাই। বাজাইতে জানিলে সমস্তই এক তানে বাজিয়া উঠে। সেই বাজানই মানব জীবনের লক্ষ্য এবং সেই বাজনা বাজাইতে মানুষ ক্রমপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। আমরাও এ ধরাধামে প্রবাসী। আমাদের পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী আমাদের জন্য সোৎসুকনয়নে পথপানে চাহিয়া আছেন। কিন্তু ভ্রান্ত আমরা, আপন পিতা মাতা ভাই ভগ্নীকে ভুলিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে গমন করতঃ ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া পড়িতেছি। ভ্রাতৃগণ! যদি আপন মঙ্গল চাও, যদি পিতামাতার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান পাইতে চাও—যদি আপন ভাই ভগ্নীর স্নেহালিঙ্গনসুখ আস্বাদ করিতে চাও তবে আপন লক্ষ্য স্থির করতঃ "এগিয়ে যাও", ক্রমে যতই আপন গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই তোমার মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিবে, আর পিতা মাতার অমৃতময় অঙ্কে স্থান পাইলে যে কি আনন্দ কি সুখ তাহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। ভাষা দ্বারা কেহ বুঝাইতে সক্ষম হইবে না। যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আপন ভাবে বিভোর হইয়া পাগল বেশে পুরীধামাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তগণ সে অবস্থা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তিনি যতই অগ্রসর হইতে ছিলেন ততই আপন ভাবে বিহ্বল হইতেছিলেন। যখন দূর হইতে শ্রীমন্দিরের নিশান দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখনই আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন। সে ভাব যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারাই কতক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃগণ! যদি "এগিয়ে যাইতেই" হইল—যদি পাগলই সাজিতে হইল, তবে দেবাদিদেব মহাদেবকে আদর্শকরতঃ পাগল সাজ—ধন সম্পদ স্ত্রীপুত্রাদি অনিত্য বস্তু তুচ্ছ করতঃ নিত্য বস্তু লাভের জন্য পাগল হও—ঘরবাড়ী ভুলিয়া যাও—আত্মীয় স্বজন ভুলিয়া যাও—দেশ রাজ্য ভুলিয়া যাও—জগৎ ভুলিয়া যাও কিন্তু সাবধান, যাঁর জন্য সকল ভুলিতে চলিলে—

যাঁর জন্য পাগল সাজিয়ে তাঁকে ভুলিও না। আপন লক্ষ্য স্থির করতঃ ধৈর্য্যের সহিত শুদ্ধচিত্তে "এগিয়ে যাও" সত্যলাভ নিশ্চয় হইবে। তুমি এগুতে এগুতে এমন যায়গায় পঁহুছিবে যেখানে গিয়া তোমাকে স্থির হইতে হইবে—তুমি আর অগ্রসর হইতে পথ পাইবে না; সেই স্থানই তোমার কর্ম্মের শেষ—সেই স্থানেই তোমার সত্যলাভ হইবে—সেই স্থানই তোমার লক্ষ্য। বোধহয় সকলেই ফানুষ দেখিয়াছেন, তাহার ভিতর বাতি জ্বালাইয়া যতই ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া দেওয়া যায় ততই সে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। আমাদের এই স্থূল দেহ কর্ম্মরূপ বায়ুতে পূর্ণ—কর্ম্মের বোঝায় ভারী—তাহাতে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়া দাও কর্ম্মক্ষয় হইবে তুমি উপরে উঠিতে সক্ষম হইবে। আধ্যাত্মিক জগতেও এই কথা—ষট্‌চক্রভেদের কথা বোধ হয় অনেকে সাধু মহাত্মার শ্রীমুখে শুনিয়াছেন কিম্বা পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছেন, ইহাও "এগিয়ে যাওয়া" মন্ত্রের ক্রিয়া। ক্রিয়া দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া মূলাধার পদ্ম হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করতঃ দ্বিদল চক্র ভেদ করিলে এমন এক যায়গায় উপস্থিত হইবে যেখানে তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না—নিজে নিজেই সেই যায়গায় স্থির হইয়া যাইবে। তথায় তুমি কি দেখিবে?—তুমি দেখিবে-সহস্র দল পদ্ম, তদুপরি মহাজ্যোতির্ম্ময় চনকাকার মহাকালী ও মহারুদ্র অবস্থিতি করিতেছেন; ইঁহাই চিন্তামণি গৃহে মায়াচ্ছাদিত পরমাত্মা। ইঁহার সহিত মিলনই "এগিয়ে যাওয়া"র শেষ।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যেই হও না কেন যদি দুর্লভ মানব জন্ম সফল করিতে চাও—যদি অনন্তের পাখী আমিত্বের ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করতঃ অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে চাও—যদি বিশ্বপাতার সার্ব্বভৌমিক বিশ্বপ্রেমে আপনাকে মাতাইতে চাও—যদি আপন পর, রাজা প্রজা, বৃক্ষলতা, পশুপাখী সমস্ত জীব ও জড় জগতকে তোমার বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাও,—যদি পরকে সুখী করিয়া সুখী হইতে চাও—যদি বিষবৃক্ষে অমৃত ফল ফলাইতে চাও—যদি নিজে হলাহল ভক্ষণ করতঃ অন্যকে অমৃতের আস্বাদ উপভোগ করাইতে চাও—যদি অন্যকে অট্টালিকাবাসী করিয়া নিজে বৃক্ষতলে বাসকরতঃ পরাশান্তির অধিকারী হইতে চাও—যদি মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে চাও—যদি "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই মহাবাক্যের সত্যতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে চাও—যদি স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, আনন্দময়ী মায়ের অভয় ক্রোড়ে স্থান লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইতে চাও,—তবে এস ভাই গুরুবাক্য বেদতুল্য অভ্রান্ত মনে করিয়া তাঁহারই চরণ রেণু—তাঁহারই আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক যে যাহা জীবনের লক্ষ্য স্থির করতঃ এ তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরার্থে উৎসর্গ করিয়াছ—(পরার্থে জীবন উৎসর্গীকৃত না হইলে জীবন পশুতুল্য, তাই তুচ্ছ বই কি?) সে সেই লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া—শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে শ্রীশ্রীগুরুদেবের রাঙ্গা চরণদুখানি হৃদয়ে ধারণ করতঃ আপন লক্ষ্য পথে "এগিয়ে যাই"।

ডাক্তার শ্রীরাজচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

আক্ষেপ।

ওগো, ভরা হৃদয়ের যাহা কিছু ছিল
সকলি মুছিয়া গেছে,
শুধু ক্ষীণ স্মৃতিরেখা জাগাতে বেদনা,
মরমে মরিয়া আছে।
মোর ক্ষুদ্র তরু শাখে, যে দুটী কুসুম,
ফুটিত সাঁঝের কোলে
আজি অভিমানে তারা ঝরিয়া পড়েছে,
তপ্ত ধরণী তলে।
সেই শীতল আলোকে উজলিত মোর,
আঁধার কুটীর দ্বার।—
আজি সহসা বা কেন লভেছে বিরাম,
প্রদীপ্ত কিরণ তার।
যেথা জ্যোছনায় গড়া, মুরতি তোমার
হাসিত হৃদয় মাঝে।
সেথা গরজিছে শুধু মেঘমালা কালো,
প্রলয় তিমির সাজে।
ওগো, কাঁপিছে হৃদয় আঁচল ধরিয়ে
দাঁড়ানু তোমার পাছে।
আজি ভরা হৃদয়ের যাহা কিছু ছিল,
সবি যে মুছিয়া গেছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

—0—

সাধ।

যখন, হৃদয় গগন মোর
আলোকে পূরিয়া
তোমার রূপের জ্যোতিঃ
উঠুক ভাসিয়া।
নিমিষের মাঝে হোক্
সফল জীবন।
সে আলোক সায়রে হেরি
একটী কিরণ!
পূর্ণতার মাঝে আজি
লভিয়া তোমায়
সারাটী জীবন যেন
আবেশে ঘুমায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

—:0:—

অশৌচ-বিবেক।

হিন্দু সমাজের কেহ মরিলে কিম্বা জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার জ্ঞাতিগণের অশৌচপ্রাপ্ত হয়। জন্মিলে জাতাশৌচ এবং মরিলে মৃতাশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। সপিণ্ড, সমানোদক ও গোত্রজভেদে জ্ঞাতিগণের অশৌচ গ্রহণের তারতম্য আছে। আবার ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদেও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। যথা:—

শুদ্ধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি।
মনুসংহিতা

ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে, ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। এই অশৌচ ব্যবস্থা লইয়া হিন্দু সমাজে নানা কথা উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। বর্ত্তমান যুগে গুণকর্ম্মের ব্যভিচারবশতঃ সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কর্ম্মগত বিভেদ আর লক্ষিত হয় না, কেবল সামাজিক কতক গুলা ক্রিয়া-কাণ্ডের বিভিন্নতাই বিভিন্ন জাতির পার্থক্য বিধান করিতেছে। সুতরাং সাধারণে জাতি-ভেদে অশৌচাদির বিভিন্নতা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বড়ই দুঃখের বিষয়,—এক শ্রেণীর দুর্ব্বলচিত্ত লোক বলিয়া থাকে যে, ব্রাহ্মণ-জাতির স্বার্থরক্ষার জন্যই জাতিভেদে বিভিন্ন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি স্বার্থপরতাই ইহার মূল হয়, তবে শূদ্রাদির যাজন ও দান গ্রহণে ব্রাহ্মণের পাতিত্য-বিধান শাস্ত্রসিদ্ধ হইল কেন? শাস্ত্রে পরস্বগ্রাহীর ভূরি ভূরি নিন্দা আছে। যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে জগতের সম্রাট হইতে পারিতেন, তিনি পর্ণ-কুটীরে থাকিয়া ফল মূল ভক্ষণে কাল যাপন করিলেন কেন? ইহা কি লোভ-পরিহারের জ্বলন্ত প্রমাণ নহে? অলৌকিক শক্তি লইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা, শৃগাল কুকুরের ন্যায় ভোগ্য বস্তু লইয়া বিবাদ করেন নাই, ইহা কি তাঁহাদের দেবত্বের পরিচয় নহে? কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই চক্রনেমীর ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। তাই এক্ষণে ব্রাহ্মণসন্তান লোভের ক্রীতদাস। এক এক জনের প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্রাহ্মণত্ব দূরের কথা, মনুষ্যত্বেই সন্দিহান হইতে হয়। আমাদের দেশ সুশাসিত, কিন্তু সমাজ এখন স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল, জাতিগত কার্য্য ভেদের অতিক্রমই এই সর্ব্বনাশের মূল।

সুতরাং বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু সমাজের জনগণের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের ব্যবস্থায় স্বার্থপরতা আরোপ করিলে নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে,—নিন্দায় রসনা কলুষিত হইবে। জাতিভেদের প্রকৃত কারণ জানিলে,—জাতি-ভেদ স্বীকার করিলে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মও স্বীকার করিতে হইবে। জাতিভেদ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র কি বলেন শুনুন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।

প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না, সমস্ত ব্রহ্ম-ময় ছিল। কিন্তু পরে—

ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্।

পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণবিভাগ হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।

তাহা হইলে জাতি দ্বারা গুণ ও কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানু-সারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে সত্ত্ব-প্রধান ব্রাহ্মণ ও তমোপ্রধান শূদ্র এবং সত্বে রজঃগুণাধিক্যে ক্ষত্রিয় ও তমে রজঃগুণাধিক্যে বৈশ্য জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গুণ-ক্ষয়ের জন্য যে কর্ম্ম, তাহাই স্বধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমো-চিত কর্ম্ম দ্বারা গুণক্ষয় করিয়া, জীবকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। তাই হিন্দুধর্ম্মে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ধর্ম্মভেদ বা অধিকার ভেদ হইয়াছে। এই অধিকারী ভেদই জাতিভেদের মূল ভিত্তি। অতএব ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ে জ্ঞানী অজ্ঞানীর জন্য, একই ধর্ম্ম-সাধন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাহারা এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায়ে গুণানুসারে ধর্ম্ম বিভাগ হওয়ায় জাতি বিভাগ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ জনগণের ধর্ম্ম অধিকারানুসারে নানা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় হিন্দুসমাজ নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে গুণানুরূপ কর্ম্মের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইত না। কাজেই ধর্ম্মের ব্যভিচারে সমাজ উৎসন্ন যাইত। বর্ত্তমানে সমাজে জাতিভেদ থাকিলেও কার্য্যভেদের অতিক্রমে হিন্দুসমাজে সেই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। তাই সেইকালের ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ গুণ ও কর্ম্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তন ও নানাবিধ বিধি-নিষেধ দ্বারা তাহা রক্ষা করার উপায় করিয়া দিয়াছেন। যে যে কর্ম্ম করে, সে তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে। অতএব একজাতির সহিত আর এক জাতির আহার-বিহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে, পরস্পর গুণ ও কর্ম্মের সংমিশ্রণ হইত। ইহার ফলে উচ্চ জাতি ইতর গুণ ও কর্ম্মের পক্ষপাতী এবং নীচ জাতির বুদ্ধিবিভেদ ঘটিত। পাঠক! যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে অধিকার ভেদের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা জাতিভেদের কারণ সহজেই বোধগম্য করিতে পারিবেন। জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে অধিকারানুসারে ধর্ম্ম সাধনা প্রণালীর বিভিন্নতা স্থায়ী হইত না। যতদিন হিন্দুসমাজ এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে পরিগণিত ছিলেন জাতিগত কার্য্যভেদের অতিক্রমে আজ হিন্দুসমাজের এই দারুণ দুর্দ্দশা হইয়াছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইতর গুণ ও কর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া, আর নীচজাতি বুদ্ধি-বিভেদ বশতঃ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া ঋষিবাক্য লঙ্ঘনের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। এ দুর্দ্দশা বহু পূর্ব্বে সূচনা হইয়াছে। যে দিন ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয় বিরুদ্ধে কুঠার ধরিয়াছেন, যে দিন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মগুরুর স্থলে অস্ত্রগুরু হইয়াছেন, যে দিন ব্রাহ্মণ বেদ বেদান্তের আলোচনা ছাড়িয়া মেঘদূত শকুন্তলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে এই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

পাঠক! হিন্দুধর্ম্মের জাতিভেদের কারণ ও তদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের কি মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, বোধ হয় বুঝিয়াছেন। এবং তাহার অতিক্রমে সমাজের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। হিন্দু-ধর্ম্মমতে স্ব স্ব গুণানুসারে ধর্ম্ম কার্য্য করা কর্ত্তব্য না করিলে প্রত্যবায় আছে। কেননা ব্রাহ্মণাদির সুন্দর ধর্ম্ম হইলেও শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে স্বগুণের ক্ষয় হয় না, গুণক্ষয় না হইলে তাহার ক্রিয়া একসময়ে না একসময়ে হইবেই হইবে। তাই স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্ম স্বতন্ত্র রাখাই জাতিভেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। নতুবা হিন্দু জানে, মিথ্যাময় জগতে জাতিভেদের কল্পনা মরীচিকা-তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রান্তিময় জগতে সকলই মিথ্যা। নদীপর্ব্বতাদযুক্ত পৃথিবী অথবা চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্রাদি ভূষিত আকাশ, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর তাহাই মিথ্যা। এক আত্মময় জগতে মনুষ্য পশ্বাদির ভেদকল্পনাও

মিথ্যা, সুতরাং জাতিভেদ যে কল্পিত তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

স্বধর্ম্মাচরণে যাহার গুণ ও কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বর্ণাশ্রমের যা বিধি নিষেধের গণ্ডি নাই। যথা :—

শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি কো নিষেধঃ॥
শুকাষ্টক।

যে সকল মহাত্মাগণ স্বধর্ম্মাচরণে গুণক্ষয় করিয়া গুণাতীত পথে বিচরণ করেন, তখন তাঁহারা কেবল শব্দাতীত গুণত্রয়শূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকেন, সে অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না।

জাতিভেদ প্রথার ভিতরে হিন্দু ধর্ম্মের কি মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে; অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করে, মিথ্যা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন দ্বারা হিন্দুগণ বিবিধ সামাজিক অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই আমরা সংক্ষেপে জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলাম। জাতিভেদের কারণ বুঝিয়া থাকিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিভিন্নতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। আমাদিগের জ্ঞান গুণ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে; গুণানুসারে কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানকে প্রকাশ করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। যে যেগুণে আবৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গুণানুযায়ী কর্ম্ম করাই তাহার স্বধর্ম্ম। গুণ বিভাগ হইতে যখন জাতিবিভাগ হইয়াছে, তখন প্রত্যেক জাতির গুণানুযায়ী কর্ম্ম স্বতন্ত্র। তাই ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি জাতির বর্ণাশ্রম, আচার ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম জাতিভেদে বিভিন্নতার কারণ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অজ্ঞব্যক্তিগণ শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণকে স্বার্থপর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্ব স্ব জন্মগত গুণানুযায়ী কার্য্য না করিয়া অন্যের গুণানুযায়ী কর্ম্ম করিলে তোমার গুণক্ষয় হইয়া জ্ঞান প্রকাশ দূরে থাক্, আরও নূতন নূতন গুণে জড়িত হইয়া যাইবে। তাই জাতিভেদে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের বিভিন্নতা স্বার্থপরতা নহে। এক্ষণে অদ্যকার প্রতিপাদ্য বিষয়ের মীমাংসা করা যাউক।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪।৫

অর্থাৎ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত বিকারহীন দেহীকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্য সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতিকে সংযুক্ত করিয়া থাকে। আবার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক এক গুণের আধিক্যে এক এক জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মা নির্ব্বিকার, সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি বিকার একমাত্র গুণেরই কার্য্য। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল রজঃ অপেক্ষাকৃত মলিন ও তম ঘোর মলিন সুতরাং গুণের স্বকীয় বিকৃত কার্য্যগুলি নির্ম্মল সত্ত্বাবৃত আত্মা অপেক্ষা রজস্তমাবৃত আত্মায় অধিক কার্য্যকরী হইবে। তাই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণেতর জাতি ক্রমশঃ অধিক অজ্ঞান। সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ কর্ত্তৃক অজ্ঞানী অভিভূত হয়, প্রকৃত জ্ঞানী তাহাতে বিচলিত হন না। আবার এই অজ্ঞানের আবরণ ভেদে

ক্রিয়া হইয়া থাকে। তাই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণেতর। জাতি সুখ দুঃখে অধিক বিচলিত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ অল্পদিনে অল্পসময়ে প্রকৃতস্থ হয়, অপরের তদপেক্ষা পর পর অধিক সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গুণাবৃত গুণময় জীব আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোকে অভিভুত হইয়া পড়ে, আবার পুত্রপৌত্রের জন্মে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিকার গুণময় মায়ার কার্য্য। সুতরাং সুখ দুঃখে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পর পর অন্যজাতি উত্তরোত্তর অধিক অভিভূত হয়। এইরূপ বিকারে জাতিগত গুণও বৈষম্য হইয়া পড়ে। তাই কেহ মরিলে বা জন্মিলে কয়েক দিনের জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনকে হিন্দু সমাজের বিধানুসারে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। অশৌচগ্রস্থব্যক্তি তুল্য গুণজাত স্বজাতি হইতে কয়েক দিনের জন্য পৃথক হইয়া পড়ে। তাহার হাতে তাহার স্বজাতি পর্য্যন্ত সেই কয়েক দিন পানাহার করেন না, কেননা তাহা হইলে তাহাদিগের স্বাভাবিক গুণ উহার সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া পড়িবে। তাই অশৌচ বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পর পর অল্পজ্ঞানী সুখদুঃখে অধিকতর বিচলিত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা লাভ করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। তাই সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের দশ দিন, সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়ের বার দিন, তমে রজঃ-প্রধান বৈশ্যের পনর দিন এবং তমঃ প্রধান শূদ্রের একমাস অশৌচ কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের হাতে শাস্ত্র বলিয়া এ বিধান লিপি-বদ্ধ হয় নাই। গুণানুসারে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত বলিয়াই তাহার কার্য্যও জাতিভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। তাই জাতিভেদে বর্ণা-শ্রমধর্ম্ম স্বতন্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পাঠক! আর একদিকে দৃষ্টিপাত করিলে এ রহস্য সম্যক উদ্‌ঘাটিত হইবে। হিন্দু-সমাজে চণ্ডাল জাতির দশদিন মাত্র অশৌচের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রপ্রণেতা ব্রাহ্মণ কোন্ স্বার্থে চণ্ডালের প্রতি এ কৃপা প্রদর্শন করিলেন? অশৌচব্যবস্থা বুঝিয়া থাকিলে আমরা এক কথায় ইহার মিমাংসা করিয়া দিতে পারিব। ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলিলে হিন্দুসমাজের সমস্ত জাতিকে বুঝাইয়া থাকে; সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ আর সর্ব্ব নিম্ন চণ্ডাল। ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী বলিয়া যেমন শোকে অভিভূত হয়েন না; হইলেও অল্প সময়েই প্রকৃতিস্থ হন, তাই তাঁহার জন্য দশ দিন অশৌচ কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর চণ্ডাল তমোগুণের জমাট মূর্ত্তি, তাঁহার হৃদয়ে দয়া স্নেহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অতি অল্পাংশই বিকাশ হয়, সুতরাং তাহারাও শোকে বিশেষ অভিভুত হয় না; ইইলেও আহার নিদ্রায় অল্পেই প্রকৃতিস্থ হয়, তাই তাহাদেরও অশৌচ কাল দশদিন মাত্র। এইবার বোধহয় শাস্ত্রপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণকে আর স্বার্থপর বলিবার সুযোগ রহিল না। জাতিভেদে অশৌচের বিভিন্নতা আশাকরি প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। শোক-মোহে গুণক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াই অশৌচ-বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এই জন্য পিতামাতা মরিলে বা পুত্র কন্যা জন্মিলে বিশেষ অশৌচের বিধান। কেননা ঘনিষ্ঠতা বশতঃ শোক বা আনন্দের বিশেষ কারণ রহিয়াছে। সেইজন্য দুর সম্পর্কীয় সপিণ্ড, সমানোদক প্রভৃতি আত্মীয়-

গণের জন্য অল্পদিন অশৌচ বিধান নির্দ্ধারিত আছে। অশৌচ বিধানের কারণ এবং জাতি-ভেদে অশৌচকালের বিভিন্নতার উদ্দেশ্য এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইল। আশাকরি পাঠকগণ অশৌচ-বিবেকের নিগূঢ় কারণ ও মঙ্গল উদ্দেশ্য অবগত হইয়া শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিবেন।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

সাধক-সঙ্গীত।

[৯]

প্রতিমায় কেন মায় মন রে কর আরাধন।
বাহ্যপূজা মনের ভ্রমে (জীব) স্বর্গান্তে সংসারে ভ্রমে,
অন্তর্গত পুণ্যাশ্রমে, কর রে সাধন॥
হৃদি সুধা-সিন্ধু মাঝে কর মণিদ্বীপ সৃজন,
কল্পনা কররে তাতে পারিজাত কানন,
সেই কাননের মধ্যস্থলে বিমল কল্পতরুতলে
চিন্তামণি-গৃহে মাকে কর রে স্থাপন॥
পূর্ণানন্দময়ী মায়ের কর জ্যোতিঃ রূপটি ধ্যান,
সহস্রার গলিতামৃতে কর পাদ্য দান,
তাতেই হবে স্নান আচমন অর্ঘ্যরূপে সঁপ রে মন,
অসৎসঙ্গ গোপন মুদ্রা করাও রে দর্শন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আদি পুষ্প পঞ্চদশ,
পৃথ্বিতত্ত্ব গন্ধ যোগে দেহ নিশি দিবস,
তেজস্তত্ত্বের প্রদীপ জ্বালো প্রাণের ধূপদান বড় ভাল,
জলতত্ত্ব রসের কর নৈবেদ্য অর্পণ॥
দশদিগ দাও বসন রূপে দাও সূর্য্যকে দর্পণ,
চন্দ্রমা হ'ক ছত্র মায়ের চামর সমীরণ,
কাম ক্রোধ বলির প্রথা কুণ্ডলিনী সূত্রে গাঁথা
পঞ্চাশত বর্ণের মালা জপ রে সঘন॥

মূলাধার হোম কুণ্ডে কর চিদগ্নি স্থাপন,
ধর্ম্মাধর্ম্মে দেও আহুতি জন্মের মতন,
হোমান্তে মন! এই কাজ কর, সোহং মন্ত্রের শান্তি পড়,
দক্ষিণা দ্বিজ গোবিন্দের আত্ম—সমর্পণ॥

——:0:——

বঙ্গজননীর প্রতি।

(বন্যা উপলক্ষে লিখিত)

আরাধ্যা বঙ্গজননীগণ! একবার তোমরা চেয়ে দেখ, তোমাদের সাধের সোণার বাঙ্গলায় আগুণ লাগিয়াছে, তোমাদের সন্তানগণ অন্নবস্ত্রাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া দলে দলে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে। দেবতার নন্দন কানন,—শস্যশ্যামলা সোণার বাঙ্গলা আজ প্রেত-পিশাচ ভূত-দানার ক্রীড়াভূমি হইতে চলিয়াছে। অন্যান্য বৎসর এসময়ে যে মাঠ হরিদ্বর্ণ ধানগাছে পূর্ণ থাকিয়া পথিকের,—দর্শকের নয়নের প্রীতি উৎপাদন করিত,—কৃষকের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়া দিত,—যাহা দেখিয়া ভরাবর্ষার অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া কৃষকের প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিত,—আজ কিনা সেই মাঠ সমুদ্রবৎ অনন্ত জলরাশি বুকে করিয়া পথিকের ভীতি ও ভ্রান্তি জন্মাইতেছে; আর নিরন্ন কৃষকগণ ভবিষ্যৎ আঁধার ভাবিয়া হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া রোদন করতঃ চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া অন্নাভাবে কলমী, কচু, শজিনার পাতা, শাকশব্জী প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া দগ্ধ উদর পূর্ণ করতঃ সংক্রামক ব্যাধির বীজ রোপন করিতেছে। অন্যদিকে কৃষকের প্রাণ—জীবনের সম্বল একমাত্র গো-কুল খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। মাঠ জলে পূর্ণ সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের চলিবার রাস্তাই গো-ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে। রাস্তায় যাতায়াত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শিয়াল শকুনি তাহাদিগের শবদেহ উদরস্থ করতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার নৈসর্গিক উপায়ের আর সহায়ক হইতে পারিতেছে না। ইহাদিগের পূতিদেহের দুর্গন্ধ দেশময় ছড়াইয়া সংক্রামক—ব্যাধি বিস্তারের আরও সাহায্য করিতেছে। অনশনক্লিষ্ট লোক কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দলে দলে অকালে শমন ভবনে গমন করিতেছে,—অনেক স্থানে ঘরের মড়া ঘরেই পচিতেছে,—সে দৃশ্য দেখিলে নিতান্ত সাহসিকের মনে ভীতির উদ্রেক হয়,—পাষাণ প্রাণেও করুণার সঞ্চার হয়।

মা! তোমরা চেয়ে দেখ,—তোমাদের অন্নবস্ত্রহীন সন্তানগণের কি দুর্দ্দশা! একে ত তাহারা ভাগ্যদোষে অন্ন-বস্ত্রহীন হইয়াছে, তাহাতে আবার দাড়াইবার স্থান নাই। তাহাদের আবাসগৃহ দারুণ বন্যার ভীষণ

আক্রমণে একদিকে জলমগ্ন,—অন্যদিকে তেমনি ঝড়ের প্রবল তাড়নে ধরাশায়ী হইয়াছে;—আজ তাহারা গৃহ ত দূরের কথা, বৃক্ষতলেও আশ্রয় পাইতেছে না; কেননা, এখন বৃক্ষতলও যে জলমগ্ন! মা! বঙ্গলক্ষ্মিগণ! বঙ্গজননিগণ! বল দেখি তোমাদের এই হতভাগা সন্তানগণ এখন দাঁড়ায় কোথায়! যদি তোমরা চক্ষু-তুলিয়া না চাহিবে,—আপনার সন্তান বলিয়া বুকে তুলিয়া না লইবে তবে কে আর তাহাদিগকে কোলে টানিয়া নিবে! সন্তান মন্দ বলিয়া জননী কি কখন মন্দ হইতে পারে? তাহা হইলে, "সন্তানে কুকর্ম্ম করে, মা বিনে কে সইতে পারে, মাগো মা," এই সত্যবাণী মায়ের সন্তান সাধক রাম-প্রসাদের মুখ হইতে কখন বহির্গত হইত না। তাইবলি মা, তোমরা একবার এই অধম দীনহীন সন্তানগণের প্রতি মুখ তুলে চাও,—একবার সন্তান বলিয়া বুকে তুলে লও,—তোমাদের স্তন্যপীযুষধারা মুখে ঢালিয়া দিয়া তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর মা!

মা! তোমরা না বিশ্বজননী, তোমরা না জগজ্জননী,—এই যে তোমাদের সন্তান-গণ হাহাকার করতঃ একমুষ্টি অন্নের জন্য চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরি-তেছে,—শিয়াল কুকুরের মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাড়িত হইতেছে, তাহা কি তোমরা দেখিয়াও দেখিতেছ না,—তাহাদের করুণ-ক্রন্দন কি তোমাদের করুণহৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না? তবে কি আজ সময় বুঝিয়া তোমরা পাষাণের মেয়ে পাষাণ হইতে আরও পাষাণী হইয়াছ? তাও কি সম্ভব হয় মা? মাতৃ-হৃদয় দয়ার আধার, কোমলতার খনি—এও কি কখন কঠিন হইতে পারে? সমুদ্রেরও কুল আছে, সমুদ্রেরও তল আছে, কিন্তু মাতৃ-স্নেহ-পারাবার অকুল—অতল! বাঘিনী অন্যের পক্ষে হিংস্রা,—রুধিরলোলুপা, কিন্তু আপন শাবকের নিকট স্নেহময়ী,—প্রেমময়ী,—আনন্দময়ী জননী! বাৎসল্যের জীবন্ত প্রতিমা!—করুণার অনন্ত উৎস! বাঘিনী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুমুখগামিনী হইলেও কখন আপন সন্তানকে গ্রাস করে না। আপনার সন্তানকে রক্ষা করিতে ভুলে না, সর্ব্বপ্রযত্নে আপন সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকে। তবে কি করিয়া বলিব তোমরা পাষাণের মেয়ে পাষাণী। লোকে বলিয়া থাকে,—"পাষাণে কর্দ্দম নাস্তি" তা সত্যবটে। কিন্তু ইহা অদূরদর্শী ও একদেশদর্শীর কথা। পাষাণের মেয়ে পাষাণী হইলে আজ পৃথিবীতে জীবগণের জীবনরূপিনী, আনন্দদায়িনী,—ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণকারিনী, পতিতপাবনী, কলুষনাশিনী গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, সরস্বতী, প্রভৃতি শত শত নদী অনন্ত ধারায় প্রবাহিতা হইয়া, পৃথিবীর নানা অংশ, নানা জনপদ, ধনধান্যে পূর্ণ করতঃ জীব-জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিত না। আজ পাষাণে কর্দ্দম আছে বলিয়াই দেশ দেশান্তর, দিগ্‌ দিগন্তর হইতে বাঙ্গলার এহেন দুর্দ্দিনে ধনধান্যে তরণী বোঝাই করতঃ তোমাদেরই সন্তানগণ ছুটিয়া আসিতেছে। পাষাণে কর্দ্দম নাই সত্য,—পাষাণ সহজে গলে না তা সত্য বটে, কিন্তু যখন কার্য্য-কারণে সেই পাষাণ গলিয়া যায়,—তখনই তাহা হইতে অমৃতের প্রস্রবণ,—প্রেমের উৎস,—জীবনদায়িনী

ত্রিতাপনাশিনী গঙ্গার উদ্ভব হয়! তখনই কর্দ্দম ত দূরের কথা,—ঐরাবতের মত মত্ত-মাতঙ্গ সেই প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া,—মায়ের মাতৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারগ হইয়া মা, মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতঃ মায়ের অভয় পদে শরণ লইতে বাধ্য হয় এজগতে মহতই সর্ব্বদা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকেন; তাই পাষাণের অবস্থিতি স্থান সর্ব্বোচ্চে।—তাই দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাই ত্রিতাপনাশিনী, জীবনরূপিনী গঙ্গা-দেবীকে দেবাদিদেব মহাদেব আপনার শিরে ধারণ করতঃ জগতকে মহতের পূজা করিতে শিখাইয়াছেন। মহতের সন্তান কখন কোন অংশে কাহা হইতে হীন নহে। তাঁহারা বিনয়, নম্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণে অন্যান্য হইতে শ্রেষ্ঠ; তাই জীবনদায়িনী জননীরূপিনী নদী সকলের স্বভাবিক গতি নিম্নদিকে। আবার মহতের আশ্রয় স্থানও মহৎ। "যথোন যুক্তাতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ।" তাই জীবনদায়িনী মাতৃরূপিনী নদীগণকে বুকে করিবার জন্য রত্নাকর-সিন্ধু-পতি আপনার অনন্ত বিশাল বক্ষ বিস্তার করতঃ তৃষিত চাতকের ন্যায় উর্দ্ধপানে চাহিয়া থাকিয়া নিম্নদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। জননী জন্মভূমির আসন সর্ব্বোচ্চে বলিয়াই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মা! যে কুলে সুভদ্রা, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ প্রাতঃস্মরণীয়া জননীগণের জন্ম হইয়াছিল, তোমরা না সেই কুলে জন্মিয়াছ? তাহাদেরই না রক্ত-কণিকা তোমাদের ধমনীতে, ধমনীতে, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। তোমরা কি তাহা-দিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা, পরদুঃখকাতর-তার কথা,—তাহাদিগের আত্মত্যাগের—স্বার্থ-ত্যাগের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? কত যুগ অতীত হইতে চলিল এখনও তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কাহিনী জলন্ত সুবর্ণাক্ষরে ইতিহাসের গায়ে লিখিত আছে। তোমরা কি বীরজননী, বীরপত্নী সুভদ্রার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? আজকাল তোমরা প্রায় সকলেই শিক্ষিতা,—উচ্চ শিক্ষি-তের পত্নী,—উচ্চ শিক্ষিতের জননী; তোমরা বঙ্গজননী বঙ্গকুললক্ষ্মী। আমাদের বিশ্বাস তোমরা অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছ, ঠাকুরমার উপকথা বলিয়া তুচ্ছ করতঃ দূরে নিক্ষেপ কর নাই। কেননা, এখনও এমন অনেক জননী আছেন যাহারা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুর পুরাণ-গুলিকে মাথার মণি ভাবিয়া সচন্দন ফুল-বিল্বদলে পূজা করিয়া থাকেন। মা! সুভদ্রা-দণ্ডী সংবাদ মনে পড়ে কি? যখন নিরাশ্রয়, অনাথ দণ্ডীরাজা আশ্রয় লাভার্থে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় ভারতের প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিমুখ হইয়া গঙ্গাজলে ঘোটকী সহ প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া-ছিলেন, তখন বিপন্ন দণ্ডীরাজার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দীনজনপালিকা, আর্ত্তের জননী, বীরমাতা, বীরপত্নী সুভদ্রার করুণ হৃদয় গলিয়া গেল। ত্রিলোক সহায় করতঃ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি-বেন ইহা বুঝিতে পারিয়াও, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ

আপন ভাই ইহা ভুলিয়া গিয়া বিপন্নের বিপদ মোচন করিতে,—শরণাগতকে রক্ষা করিতে আপন পতিপুত্রকে দুর্জ্জয় ত্রিলোক সহায়-সম্পন্ন যাদবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে অসম্ভব সম্ভব হইল,—অষ্টবজ্রের মিলন হইল। পাণ্ডবগণ বিজয়মাল্যে বিভুষিত হইলেন,—ত্রিলোক পাণ্ডবগৌরবে উদ্ভাষিত হইল। মা! তোমরা না সেই রমণী কুলে জন্মিয়াছ? যে কুলে উন্নতহৃদয়া, পরার্থপরায়ণা পান্নাসমা ধাত্রী পান্না পরের ছেলেকে রক্ষা করিতে গিয়া রাক্ষসীরূপে—দানবীরূপে স্বেচ্ছায় অম্লানবদনে আপন সন্তানকে যমের হাতে তুলিয়া দিয়া আত্মত্যাগের—স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; তোমরা কি সেই দেশহিতৈষিণী কর্ত্তব্যপরায়ণা ধাত্রী পান্নার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? মা, যে রাজপুতরমণীগণ দেশরক্ষার জন্য ধনুকের গুণ (জ্যা) অভাবে রমণীর পরম আদরের যতনের ধন, শিরোশোভন কেশদাম স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, অর্থভাব হওয়ায় স্বীয় স্বীয় অঙ্গের মূল্যবান রত্নালঙ্কার সকল অকুণ্ঠিত চিত্তে, হাস্যমুখে স্বহস্তে উন্মোচন করিয়া দিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তোমরা না সেই রমণীকুলে জন্মিয়াছ? তোমরা না তাঁহাদেরই অধস্তন সন্তান? তাহাদের সেই গৌরবেই না তোমরা গৌরবান্বিতা? মা, আপন স্বভাব হারাইওনা; একবার আমিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডীর বহির্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখ দেশের কি ভীষণ অবস্থা! সে অবস্থা দর্শনে নিতান্ত পাষাণহৃদয়ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়! অন্নবস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে কতশত লোক হাহাকার করিতেছে, তোমরা কোমলহৃদয়া, দয়াশীলা, পরদুঃখকাতরা জননী মূর্ত্তি, সে করুণ ক্রন্দনে তোমাদের প্রাণ কি গলেনা? তোমাদের সদয় দৃষ্টি কি তাহাদের উপর পতিত হইতে পারে না? মা তোমরা রমণী এ কথা ভুলিয়া যাও; তোমরা দুটী নয়, চারিটী নয়, শত নয়, সহস্র নয়, তোমরা লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সন্তানের জননী তোমরা জগজ্জননী। ঐ নিম্ন দিকে চেয়ে দেখ তোমাদের কোটী কোটী সন্তান দীননয়নে, করযোড়ে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া থাকিয়া তোমাদের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। মা জগজ্জননী! তোমরা জগজ্জননীর মত বরাভয় প্রদান করতঃ তোমাদের ভীত ও বিপন্ন সন্তানগণকে আশ্বস্ত কর। আমরা তোমাদিগের প্রত্যেকের ভিতর জগজ্জননীর বিকাশ দেখিয়া ধন্য হই।

মা! বেশী দিনের কথা নয়, সে দিনকার কথা,—পরদুঃখকাতরা প্রাতঃস্মরণীয়া মীরাবাই, অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি দয়াশীলা ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শস্থানীয়া জননীগণের কীর্ত্তিকাহিনী একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি। যখন ইংরাজ রাজত্বের প্রাক্কালে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত শত শত নরনারী অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ হইয়া কালের করাল কবলে পতিত হইতে ছিল, তখন ভবানী তুল্যা মূর্ত্তিমতী দয়ারূপিনী রাণী ভবানী কি না করিয়াছিলেন? তাঁহারই করুণা বলে শত শত বুভুক্ষু নরনারী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আজ তাঁহারই কীর্ত্তিকাহিনী বঙ্গের ঘরে ঘরে গীত হইতেছে। মা, তোমরা না তাঁহারই কুল পবিত্র করিয়াছ।

একবার দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করতঃ রাণী ভবানী, মীরাবাই প্রভৃতি জননীগণের ত্যাগবৈরাগ্যের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ জীবনের লক্ষ্য করতঃ পরদুঃখ মোচনে সাধ্যানুযায়ী যত্নবতী হইয়া আত্মত্যাগের—স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন কর।

মা, এইনা সেদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে ত্রিতাপহারিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গামায়ের পূজা হইয়া গেল। তোমরা না দশপ্রহরণ-ধারিনী ষড়ৈশ্বর্য্যরূপিনী দশভূজা মায়ের বিহিত বিধানে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা করিয়াছ;—শুধু ছেলে খেলাই কি এ পূজার উদ্দেশ্য? শুধু ছেলে খেলার জন্য,—আমোদ করিবার জন্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য-ঋষিগণ এই পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি? ইহার মূলে কি কোন সত্য নাই? বিজয়ার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দয়া, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি সবই কি বিসর্জ্জন দিয়াছ? বিজয়ার বিসর্জ্জনের অর্থ কি তাহাই? বিজয়ার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কুটিলতা, কপটতা, স্বার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা সত্বগুণ-সম্পন্ন হইব,—আমরা দয়া, ভক্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি নিত্য সত্যালঙ্কারে বিভূষিত হইব ইহার অর্থ এই নয় কি মা? এই জন্যই না রাজাপ্রজায়—ধনী নির্ধনে,—বড়য় ছোটয়ে বর্ণ নির্ব্বিশেষে হিন্দুদিগের বিজয়ার প্রেম-সম্ভাষণ,—বিজয়ার প্রেমালিঙ্গনে,—বিজয়ার প্রেমাশীর্ব্বাদ।

মা, এবার তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর আমরা জগজ্জননীর বিকাশ দেখিতে পাইব,—তোমরা প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা সাজিয়া, মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়া,—ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করতঃ,—বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করতঃ বিপন্নের দুঃখ মোচন করিয়া আমাদিগকে প্রেম শিখাইবে;—আমাদিগকে দয়া শিখাইবে;—প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইবে। দয়ার মন্দাকিনী প্রবাহে অন্ধ, খঞ্জ, দুঃখী, কাঙ্গালী, রাজা প্রজা ভাসিয়া যাইবে—তাই না পূর্ব্বাহ্ণে বন্যা আসিয়া আমাদের অন্তর্ব্বাহের সমস্ত ময়লা ধৌত করিয়া নিয়া গিয়াছে;—তাই না আজ মা রুদ্রবর্ষের শেষে জীবকুল ধ্বংস করিবার জন্য রুদ্রাণীর বেশে অবতীর্ণা হইয়াছেন,—তাই না দলে দলে জীবকুল করালীর করাল বদনে পতিত হইয়া করালীর তীব্র দংষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। দুঃখের পরেই সুখ,—আঁধারের পরেই আলো,—গাঢ় ঘনাচ্ছন্ন অমানিশার পরেই পূর্ণিমা রজনীর পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল বিমল স্নিগ্ধালোকে জগৎ উদ্ভাষিত হইয়া থাকে।

এবার মায়ের বিশেষ পূজা—তাই মায়ের বিশেষ বিকাশ, সুতরাং পূজাপদ্ধতির প্রণালীতেও একটু বিশেষত্ব আছে। এ যাবৎ আমরা একমুঠা আতপ চাউল, দুটা কলা, একটু চিনি দিয়া বা দুচারটা অজশিশু ছেদন করতঃ তামসিক বা রাজসিক ভাবে মাকে পূজা করিয়া আসিতেছি। এরূপ প্রাণহীন পূজায় আমরা মাতৃপূজার পদ্ধতি ভুলিতে বসিয়াছি;—মোহে পতিত হইতেছি। মাকে ভুলিতে বসিয়াছি। এ পূজা মা তক পঁহুছে নাই—এপূজা মা পান নাই,—তাই করুণাময়ী মা আমাদিগের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য রুদ্রাণীর বেশে আবির্ভূতা হইয়াছেন। দেখ

মন প্রাণ ঐক্য না করিলে মায়ের পূজা হয়না, তুচ্ছ ধন রত্ন বিষয় সম্পদ হাসিতে হাসিতে মায়ের অতুল রাতুল চরণে অঞ্জলি দিতে না পারিলে মায়ের পূজা হইবে না—মা পূজা গ্রহণ করিবেন না;—তাই এবার শরৎকালে মা হৈমবতী নিরন্ন বিবস্ত্র হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন,—হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া রোদনকরতঃ লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন আমাদের বহুভাগ্যের ফল—বহু তপস্যার ফল, তাই অহৈতুকী করুণাময়ী মা কৃপা-অবলোকনে বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায় আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য প্রত্যক্ষরূপে সর্ব্বজনসমক্ষে আবির্ভূতা হইয়াছেন! কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে মোহান্ধ, অজ্ঞ ও অহং জ্ঞান-বিমূঢ় মাকে সম্মুখে পাইয়াও চিনিতে পারিতেছেনা,—মায়ের সেবা পূজা করিতে পারিতেছিনা;—তাইবলি,—

মা

বঙ্গলক্ষ্মি—বঙ্গজননিগণ, তোমরা এই অধম সন্তানদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশকরতঃ এ শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে মাতৃপূজার পদ্ধতি শিখাইবার জন্য সাধ্যানুযায়ী আপন আপন শক্তি প্রয়োগ কর। রাজপুত রমণীর ন্যায় আপন আপন অর্থালঙ্কার পরার্থে উৎসর্গ কর। মা। অনিত্য ধন সম্পদ কয়দিনের জন্য? কেহ সঙ্গে নিয়া আস নাই কিম্বা সঙ্গে নিয়া যাইবে না; তবে কেন মিথ্যা আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া মাতৃপূজার এ সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ কর? মা যদি দেশের এদুর্দ্দিনে তোমাদের প্রাণ না কান্দে—যদি এ কাজে তোমরা অগ্রণী না হও,—তবে কাহারও সাধ্য নাই যে এ দুঃখের অবসান করে—মা ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই যে বিপন্ন সন্তানকে সান্ত্বনা প্রদান করে। তোমরা জননী স্নেহ-মমতা, দয়া প্রেমের আদর্শ, তোমরা এ সব বীজ আমাদিগের ভিতর রোপন না করিলে দয়া, প্রেম, ত্যাগ বৈরাগ্যের মন্ত্রে আমাদিগকে অভিমন্ত্রিত না করিলে আর কে করিবে মা? তাই বলি মা, আর বিলম্ব করিও না। তুচ্ছ ধন রত্নালঙ্কার তোমাদের অন্নহীন সন্তানদের মুখে অন্নদান করিবার জন্য,—বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিবার জন্য দান করতঃ আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া,—তোমাদের অতীত গৌরব স্মৃতি আরও উজ্জ্বলতর করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিতে বদ্ধ-পরিকরা হও,—যেন তোমাদের সন্তানবাৎসল্য তোমাদের পরদুঃখকাতরতা—তোমাদের দেশ-হিতৈষিণতা—তোমাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা অবলোকন করতঃ—তোমাদিগকে দয়াপ্রেম, ত্যাগবৈরাগ্য প্রভৃতি নিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা দেখিয়া ত্রিজগৎ স্তম্ভিত হইয়া জগজ্জননী-বোধে অবনত মস্তকে তোমাদের চরণে শির লুটাইয়া পড়ে।

মা রাজরাণীই হউক আর ভিখারিণী হউক,—সুন্দরীই হউক আর কুৎসিতা হউক,—দেবীই হউক আর দানবী হউক,—ব্রাহ্মণীই হউক আর চণ্ডালিনী হউক, সন্তানের নিকট তিনি সতীকুলশিরোমণি রাজরাজেশ্বরী ভুবন-মোহিনী স্নেহময়ী—প্রেমময়ী, সন্তানের শরণ্যা, বরণ্যা, আরাধ্যা, সুখে দুঃখে,—বিপদে সম্পদে একমাত্র আশ্রয়স্থল দেবীরূপে জননী!!! সন্তান মায়ের দোষ গুণ দেখিবেনা —বুঝিবেনা—শুনিবেনা। সে শুধু দেখিবে

জননী গর্ভধারিণী---সে কেবল ডাকিবে মা, মা !! মা তোমরা কি জান না মাতৃ-নিন্দা সন্তানের নিকট কত অপ্রীতিকর কত অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ! মাতৃনিন্দা শ্রবণ অপেক্ষা সন্তানের মৃত্যু শত সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। মা তোমরা সীতা, সাবিত্রীর মত সতী সাধ্বী আদর্শ জননী কুলে জন্মিয়া তোমরা স্বার্থপরায়ণা—তোমরা হিংসুকা, তোমরা কলহপ্রিয়া,—তোমরা বিলাসপ্রিয়া, তোমরা সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া এ সব অপবাদ্ বড়ই লজ্জাজনক---সন্তানের পক্ষে বড়ই মর্ম্মভেদী যন্ত্রনাদায়ক। মা দেশের বড় সুসময় উপস্থিত, এহেন শুভ মুহুর্ত্তে তোমরা সে কলঙ্ক কালিমা মোচন করিতে যত্নবতী হও। আত্মত্যাগের স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া—জগজ্জননীর বিকাশ দেখাইয়া সন্তানের নত মুখ উঁচু কর মা ! আমরাও যেন জগজ্জননীর উপযুক্ত সন্তান বলিয়া বুক উঁচু করতঃ জগতের সম্মুখে দাড়াইতে পারি। জননীর উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করতঃ জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া দয়াপ্রেম, ত্যাগ-বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

মা, তোমাদের কাছে আর কি প্রার্থনা করিব---গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তোমরা তোমাদের ধন রত্নালঙ্কারে তোমাদের পূজা করিয়া এ দীন হীন অজ্ঞান অধম সন্তান-দিগকে মাতৃপূজার নূতন পদ্ধতি শিখাইয়া দাও, যেন জীবনের গণা বাকী দিন কয়টা প্রতি ঘটে ঘটে মনোময়ী মূর্ত্তিতে মাকে ধ্যান করিতে করিতে---দোষ গুণ বিচার না করতঃ মায়ের সেবা পূজা করিতে করিতে-- অবোধ সন্তানের মত আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল প্রাণে কেবল মা, মা ডাকিতে ডাকিতে--- অজপার শেষ জপের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনোময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে এ নশ্বর দেহের অবসান করিতে পারি;---যেন অন্তিমে বদন ভরিয়া মা, মা বলিতে বলিতে মায়ের ঐ অভয়প্রদ শান্তিময় ক্রোড়ে চিরতরে বিশ্রাম লাভ করিয়া সকল সাধের অবসান করিতে পারি।

জয় মা আনন্দময়ী !

করুণাভিখারী
দীনহীন অধম সন্তান
তোমাদেরই স্বরূপানন্দ।

———:0:———

প্রেমে সমাধি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরুঠাকুর একথা শুনিয়াছেন। কৃষ্ণধনের বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতার কথা তিনি বহু পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। শুনিয়া মনে মনে বড় আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু মায়ের মন তো বোঝে না, মায়ের প্রাণ পুত্রের এ অবস্থার কথা শুনিয়া বড় কাতর হইয়াছে। দুর্গাবতী

রাতদিনই কাঁদেন। একমাত্র পুত্র, সেও যদি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়, ঘরকন্না না করে, তবে কে আর করিবে ? আর তো কেহ নাই, তিনকুলের ভিতর কৃষ্ণধন ব্যতীত আরতো কেহ ছিল না। তাই তিনি রাতদিন কেবলই কাঁদিতেন, রাতদিনই মনের আগুণে পুড়িতেন। সে আগুন নির্ব্বাণ করিতে কেহই ছিল না, পরন্তু ঘৃতাহুতি দিবার দুই এক জন ঋত্বিক মিলিয়া যাইত। ঘোষেদের বাড়ীর শ্যামার মা, বাঁড়ুযোবাড়ীর চিন্তামণি, চৌধুরী বাড়ীর অগার পিসি প্রায়ই দুর্গাবতীর কাছে আসিয়া বলিয়া যাইত; "কিগো, তোমার ছেলে নাকি সন্ন্যাসী হয় ? গেরুয়া চিম্‌টা লইয়াছে নাকি ?" দুর্গাবতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, শত্রুর মুখে ছাই, আমার ছেলে কেন সন্ন্যাসী হবে ? তবে বলিতে কি মা, সে যেন আজকাল কেমন হইয়া গিয়াছে, ঘর সংসারে একেবারেই মন না; আবার বিয়ে করিতে বলিলাম, তা বলে, আর বিয়ে করিবে না।" এই বলিয়াই দুর্গাবতী কাঁদিতে থাকেন। তখন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, সেই সকল নাতিবৃদ্ধা রমণী-কুলোজ্জ্বলকারিণীগণ হাত নাড়িয়া বলিতে থাকে, "হাঁ তা তো ঠিকই, একটী মাত্র পুত্র—সবে ধন নীলমণি তাও যদি মা সংসারে বিরাগী হয়, তবে আর তোমার রহিল কে ? কি করিবে মা, দুঃখের কপাল লইয়া আসিয়াছ, নৈলে এমন সতীলক্ষ্মী বৌ, সে কেন মা তোমা ছাড়া হবে ? "ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমে যে তাঁহার দুঃখের আগুণ জ্বালাইয়া দিত, পুরাতন দুঃখের স্মৃতি পুনরায় মনোমধ্যে জাগাইয়া দিয়া কত রকমে যে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে আবার ইন্ধন দিত তাহা বলা যায় না। দুর্গাবতী কি করিবেন ? কেবল কাঁদিতেন; আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুত্রকে এক খানা চিঠি লিখিয়া দিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ, "বাবা কৃষ্ণধন, কতদিন তোমাকে না দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়াছি; নাই বলিতে তুমি বিনে আর তো আমার কেহ নাই, তুমিও যদি আমার প্রতি বিরূপ হও তাহা হইলে আমি আর কি করিব। চিরদিনই তুমি তোমার মায়েরবাধ্য, আশাকরি পত্রপাঠ বাড়ী চলিয়া আসিবে। না আসিলে জানিব তোমার দয়ালু হৃদয় বড়ই নির্দ্দয় হইয়াছে। আমার এ চির দুঃখময় জীবন, তোমা হইতেও যদি কিছু সুখ না পায়, তবে তুমি আমার পুত্র হইয়া কি করিলে ? আমার এ আবহমান ক্রন্দনের ভিতরে আমি তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াও যদি একটু আনন্দের আস্বাদ না পাই, তবে কি বৃথায়ই তোমায় গর্ভে ধরিয়াছিলাম ? যাহা হউক তুমি অবিলম্বে চলিয়া আসিবে; অন্যথা বড়ই দুঃখিত হইব।"

কৃষ্ণধন যথা সময়ে পত্র পাইল। পত্র পাইয়া মনে মনে বড়ই ব্যথিত হইল, কত কাঁদিল,—কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল। মনে মনে বলিতে লাগিল,—আমার মা, তোমায় আমি কাঁদাইতে বসিয়াছি ? আমার মত দুর্ভাগা জগতে আর আছে কি ? পুত্র হইয়া পিতা মাতাকে কাঁদাইলাম, স্বামী হইয়া পত্নীকে চিনিলাম না, ভগবানের সন্তান হইয়া জগতের সকল প্রাণীকে ভাই বলিয়া ডাকিলাম না; আমার মত পাষণ্ড কি আর আছে ? না জানি মা আমার কত কষ্ট পাইতেছেন

আমি আজই বাড়ী যাইব, আজই তাহার মনোবেদনা দুরীভূত করিতে যত্নবান হইব। কৃষ্ণধন বাড়ী চলিল।

বাড়ী গিয়া দেখিবে অনশনক্লিষ্ট, শোককাতর তাহার জননী ভূমিকে মা জানিয়া তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। শোক বিকলতায় হস্তপদ অসাড় হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্ম্ম করিতে পারেন না। হরুঠাকুর যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করেন, কিন্তু দুর্গাবতী সে সেবার প্রার্থী নহেন; কেন যেন হরুঠাকুর আসিলেই বলেন, তোমাকে আর আমার সেবা করিতে হইবে না, তুমি আমার স্বামী—তুমি আমার দেবতা, তোমাকে সেবাকরা আমার উচিত; কিন্তু আমি তাহা করিতে পারিলাম না; কৃষ্ণধন যদি আসে, তাহাকে সেবা করিতে বলিও। হরুঠাকুরও এ সকল কথা শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। বলিলে কি হইবে, শত হইলেও দুর্গাবতী তাঁহার স্ত্রী তো। অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনি, যে দিন হইতে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন সেইদিন হইতেই হিন্দু-ধর্ম্মের মতে তাঁহাকে দুর্গাবতীর সুখদুঃখের ভাগী হইতে হইয়াছে। তাই তিনি তাঁহারে নিষেধ সত্ত্বেও একটু একটু সেবা করিতে ক্রটী করেন না। কৃষ্ণধনের আশায় তাঁহাকে অযত্নে ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। আহার্য্য সামগ্রী সম্মুখে ধরিলে দুর্গাবতী কিছুতেই আহার করিতে চাহেন না, হরুঠাকুরও বাধ্য হইয়া অনাহারেই বসিয়া থাকেন, তখন দুর্গাবতী কি আর করেন; স্বামীকে অনাহারে রাখিতে পারেন না,—যাঁহাকে দেবতা জানিয়া প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন, ইহ জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাকে সুখ দুঃখের সমভাগী করিয়াছেন, তাঁহাকে—সেই স্বামী-দেবতাকে অনাহারে রাখিয়া দুঃখের উপর দুঃখ বাড়াইতে পারেন না। তাই তিনি দিনান্তে দেহ রক্ষার্থ চক্ষের জলে ভাসিয়া কিছু আহার করেন। যাঁহার জীবনে সুখ নাই, তিনি আবার দেহ রক্ষা করিবেন কেন? ইহজীবনে যিনি সুখের মুখ দেখিতেছেন না, পরজীবনে কি হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, এমত অবস্থায় তাঁহার আবার দেহরক্ষার প্রয়োজন কি? না, যদি কৃষ্ণধন আসে, যদি আবার মা বলিয়া তাঁহার কোলে প্রাণ জুড়াইতে চায়, যদি আবার তাঁহার শূন্য ঘর আলো করিয়া জুড়িয়া বসে, সেই আশায়—সেই অপেক্ষায়, এখনও তাঁহার দেহ রক্ষা করিতে একটু ইচ্ছা করে। মনে মনে বলেন, নয়ন জ্যোতিহীন হইও না, আমার সোণার পুতুলীর ইন্দীবর মুখখানি কে দেখিবে? হস্ত অসাড় হইও না, আমার কৃষ্ণধনের নবনীত সুকোমল অঙ্গে কে হাত বুলাইবে? পদ অচল হইও না, আমার প্রাণের বাছনির তৃপ্তি সাধন কে করিবে? আমার জীবনান্ত হইলে, আমি তো তাহাকে আর দেখিতে পাইব না। আরও কিছুদিন বাঁচিতে সাধ হয়; কৃষ্ণধনের দর্শন বাসনা লইয়া মরিলেও আমার সুখ নাই। আবার আসিতে হইবে, আবার কৃষ্ণধনকে প্রাণ খুলিয়া স্নেহ করিয়া দর্শন লালসার নিবৃত্তি করিতে হইবে। তাহা না হইলে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; তাহাতে কাজ নাই। দেখি, ভগবান যদি সদয় হইয়া আমার ইহলীলার অবসানের

পূর্ব্বেই তাহাকে প্রেরণ করেন তবেই মঙ্গল; তবেই আমি প্রাণপূর্ণ স্নেহে আর একবার নয়ন ভরিয়া তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব, আর একবার তাহার 'মা' ডাক শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব। সেই বাসনায় এখনও প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, কৃষ্ণধনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এ জীবনের লীলাখেলার অবসান করিব, এই ইচ্ছায় এখনও প্রাণ রাখিতে বাসনা হইতেছে। কৈ, কৃষ্ণধন এখনও তো আসিল না? তবে কি আর আসিবে না? আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব না? ভগবান, একটী বার দেখাও; তার সেই অপাপবিদ্ধ নয়নযুগল একটী বার আমার নয়নে সংযুক্ত করিয়া দেও, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ইহজগত হইতে বিদায় হই।

দুর্গাবতী পুনঃ পুনঃ পথপানে চাহিতেছেন; রাস্তায় কত লোক চলিয়াছে, সকলের দিকেই এক একবার চাহিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আশা আর পূর্ণ হইতেছে না।—এই বুঝি আসিল,—এই বুঝি আসিল, কিন্তু কৈ? কেহ তো আসিয়া তাহার চিরপরিচিত পদশব্দে তাঁহাকে আনন্দিত করিতে প্রয়াস পাইল না। বেলা অবসান হইতে চলিল, হায়, কৃষ্ণধন তো আর আসিল না। দুর্গাবতী হরুঠাকুরকে কেবলই বলিতেছেন, দেখ তো কৃষ্ণধন বুঝি আসিয়াছে; তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। হরুঠাকুর কি আর করেন, দেখিয়া দেখিয়া তিনিও একরূপ নিরস্ত হইয়াছেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু কৃষ্ণধনের কোনই সংবাদ মিলিল না।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় কে যেন দরজায় আঘাত করিল। দুর্গাবতী বড় আশায় প্রাণ বাঁধিয়া ডাকিলেন—"কৃষ্ণধন আসিয়াছ?" উত্তর হইল "হাঁ মা, দরজা খুলিয়া দেও।"

দরজা আর কে খুলিবে? দুর্গাবতীর বড় ইচ্ছা হইল দরজা খুলিয়া স্নেহের ধন, নয়নের পুতুলীকে ক্রোড়ে করিয়া একটু পূর্ণশান্তির ছায়া অনুভব করেন, কিন্তু তাহা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া উঠিল না। তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল যে ইচ্ছা সত্বেও তিনি উঠিতে পারিলেন না। হরুঠাকুর পুত্রকে দরজা খুলিয়া দিলেন। পুত্র পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

মায়ের এই অভাবনীয় দুরবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণধনের প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল। সে কেবল কাঁদিতে লাগিল আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—আমারই জন্য আমার মায়ের এমন দুরবস্থা হইয়াছে; আমি যদি মায়ের কাছে থাকিতাম, আবার যদি বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতাম তবে বুঝি মা আমার আর এমন হইয়া যাইতেন না। কেন আমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন? আর ধরিয়াছিলেনই যদি তবে কেন কষ্ট ভোগ করিয়া আমাকে আশৈশব লালন পালন করিয়াছিলেন? জন্মিবামাত্রই গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন না কেন? আমি পুত্র হইয়া মায়ের কি করিলাম? আমার মত পাষণ্ড আর নাই। আমিই মায়ের চোখের জলের কারণ। যাঁহার এক বিন্দু অশ্রুকণায় জগত ধ্বংসের মুখে পড়িতে পারে,—শত পুণ্য শত ধর্ম্ম ভাসিয়া যাইতে পারে, তাঁহার আবহমান

ক্রন্দনের আমিই কারণ স্বরূপ হইয়া পাপের ভাগী হইলাম। কিন্তু মা তাহার তাহাকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন। আজ অনিমেষ নয়নে প্রাণ ভরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; যেন সব জ্বালা সব যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। নন্দন-পাদচুম্বিত মন্দাকিনীর ধারার মত সুখের সহস্রধারা আজ তাঁহাকে অচেতন করিয়া দিয়াছে। অপত্য স্নেহে কি এতই সুখ ?

———0———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিশার আঁধারে ক্রমেই দুর্গাবতীর হৃদয় অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণও গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে উপনীত হইয়া, তাহাতে তন্ময় হইয়া গেল। মাতৃ-হৃদয়ের আমরণ স্নেহ,—ভালবাসার অব্যক্ত হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া কাঁপিয়া চির দিনের তরে স্থির হইতে চলিল; আজন্মপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া দুর্গাবতী আজ সৌন্দর্য্য-বিহীন হইতে চলিলেন। নয়নের আলো ও প্রভা বহু দূরের কোনও চিরালোকময় প্রদেশে প্রেরণ করিয়া নয়ন প্রাভাহীন ও অন্ধকার রাশি দ্রুত পুঞ্জীভূত হইয়া নীরবে দুর্গাবতীর স্নেহ রসোচ্ছ্বসিত নয়নের প্রান্তদেশে চিরতরে ঢলিয়া পড়িল।

কৃষ্ণধনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—চাহিয়া চাহিয়া, নয়ন অবশ হইয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে চিরদিনের জন্য নয়ন নিমীলিত করিলেন। সে নয়ন আর উন্মিলিত হইল না। গভীর নিশীথ সময়ে, পতির কোলে মাথা রাখিয়া, পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সতী জগৎ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণধন কাঁদিল,—সে ক্রন্দন নিশার গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া, গ্রামবাসীর প্রতি গৃহে গৃহে কৃষ্ণধনের এই দুঃখের বারতা ঘোষণা করিল। হরুঠাকুর কাঁদিলেন না, পুত্রকেও কাঁদিতে নিষেধ করিলেন না। বহুক্ষণ কাঁদিয়া কৃষ্ণধন একটু স্থির হইলে প্রতিবাসী সকলে মিলিয়া দুর্গাবতীর শবদেহ গঙ্গার ঘাটে দাহন করিতে লইয়া গেল। যে গৃহে একদিন আনন্দের চির প্রবহমান উৎস কল কল করিয়া প্রবাহিত হইত—যে গৃহে একদিন সুখ শান্তির বিমল ছায়া কোণে কোণে লুক্কায়িত ছিল,—যে গৃহ একদিন মাতা ও পত্নীর মধুর কলধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, আজি তাহা চিরতরে শূন্য হইল। সকল আশা, সকল ভরসা, দুর্গাবতীর সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া গেল। জীবনের সকল সঙ্গীত শ্মশানের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

থাকিল কে ? জীবন ভরা দুঃখের অন্ধকার, আর থাকিল সেই অন্ধকারের ভ্রূকুটীর মাঝারে দুইটী চিরদুখী জীব। দুঃখ থাকিল দুঃখের অনুভূতি থাকিল না; কামনা থাকিল, কামনা মিটাইবার সাধ থাকিল না; ভালবাসা থাকিল, বিরহ থাকিল না; প্রাণ থাকিল,

কিন্তু স্নেহ থাকিল না; বিশ্ব থাকিল, কিন্তু তাহাতে মায়া থাকিল না। সোণার সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে স্বর্ণকিরণ ছড়াইয়া উঠিতেই নিদারুণ মেঘে ঘিরিল,—জগত আধার হইল। কল্পনার তুলিকাতে মনোময়ী ছবি আঁকিতে, অসাবধানতায় কালী পড়িল,—কল্পনা নষ্ট হইল। সূর্য্য উদিত হইল কিন্তু সে প্রফুল্লতা থাকিল না; সেও যেন কৃষ্ণধনের দুঃখে দুঃখী। শবদাহন সমাপ্ত হইলে, সকলে মিলিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া একে একে বিষণ্ন মনে বাড়ী ফিরিল? কৃষ্ণধন কি বাস্তবিকই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিল! প্রথমে হইয়াছিল বৈ কি! স্নেহ ভালবাসার উপাদান এখনও তো তাহার হৃদয় মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। মায়ার মাধুর্য্যময় শৃঙ্খল এখনও তো তাহার কোমল হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাই সে মাতৃ-শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বড়ই কাঁদিয়াছিল। কিন্তু পরে জ্ঞানের বিচার দ্বারা সে শোকের নিবৃত্তি হইয়াছিল। যখন শ্মশানের জলন্ত অনলে সেই সোণার মত দেহ পুড়িয়া ছাই হইতেছিল, তখন সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ভাবিতেছিল,—এই দেহের এই পরিণাম বাল্যের সরলতার মাধুরীতে যে দেহ শান্তির আগার ছিল, যৌবনের পূর্ণতায় যে দেহ ভগবানের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লোকমনো-মোহন নিকেতন ছিল, আজ তাহার এই পরিণাম। সে স্নেহ সে ভালবাসা কোথায় সন্তানের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া মাতার যে স্নেহ হৃদয়ে উছলিয়া পড়িত, প্রেমাস্পদের সন্দর্শনে যে ভালবাসা হৃদয় হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার পদকমলে আপনাকে আপনি বিলাইয়া দিত; আজ সে স্নেহ সে ভালবাসা কোথায়? শ্মশানের নিষ্ঠুর অভি-সম্পাতে তাহা কালী হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র স্নেহ মহান স্নেহে মিশিয়া গিয়াছে, অসম্পূর্ণ ভালবাসা পূর্ণতার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। সকলই এই রকমে অবসান প্রাপ্ত হয়। আজ আমি আছি কাল থাকিব না; আজ আমার স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে, মায়া আছে, মমতা আছে, কাল থাকিবে না। আজ আমার দেহ আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে, কাল থাকিবে না। তবে আর কিসের ভালবাসা, কিসের সৌন্দর্য্য ও যৌবনের অহঙ্কার? কে আমার মাতা, কে পিতা, কে বন্ধু, কে ভ্রাতা? এক দিন সীমাবদ্ধ মাতৃত্ব পিতৃত্ব অসীমতার সাগরে বিলীন হইবে। বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্ব জগদ্বন্ধু ও জগদ্ভ্রাতার অসীমতায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তবে আর কাহার জন্য কাঁদিব, কাহার জন্য শোক করিব? যত দিন ছিলেন, ভগবানের মাতৃস্নেহের বিন্দু-মাত্র লাভ করিয়া, আমাদের স্নেহ প্রদান করিলেন, আজ তো আর তিনি নাই; সে স্নেহ সে ভালবাসা যাঁহার নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আজ তিনি কোন সাগরে ডুবিয়াছেন কে বলিবে!

কৃষ্ণধন যে কয়দিন বাড়ী ছিল, আর কাঁদিল না, শোক বা আক্ষেপ প্রকাশ করিল না। মায়ের শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে যথাসময়ে কৃষ্ণ-নগরে ফিরিয়া গেল।

শ্রীপীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ—গত ২১শে অগ্রহায়ণ আশ্রম অধিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংসদেবমহারাজ ভক্তগণ সঙ্গে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করতঃ দাক্ষিনাত্যে যাইবেন।

———0———

বন্যার্ত্তসেবা।—অত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের অন্যতম সেবক স্বামী স্বরূপানন্দ কাঁথি থানার অন্তর্গত জামুবাসান গ্রামবাসী মৃত কার্ত্তিক সাউতের বিধবা পত্নী ও তাহার নাবালক দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা সহ গত ১৩ই অগ্রহায়ণ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত অনাথা ও তাহার সন্তান তিনটী গত আশ্বিন মাসে তাহাদের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল। অনাথা ও তাহার জীবিতা কন্যাটী অন্নবস্ত্রাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা ছিল; অনেক যত্ন চেষ্টায় তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিধবার কোলের শিশুটী মাতৃ-স্তন্যাভাবে গত মহাষ্টমীর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দেশপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" ও "নীহারে" তাহা যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেবক সম্প্রদায়ের অন্যতম সেবক স্বামী যোগানন্দ ও কুমার চিদানন্দ রিলিফের কাজে কাঁথিতেই অবস্থিতি করিতেছেন।

———0———

প্রাপ্তি স্বীকার—আমরা বন্যার্ত্তের সাহায্যকল্পে হাইলাকান্দী হইতে শ্রীযুত আনন্দ-মোহন রায় প্রেরিত ৪০৲ টাকা, ময়মনসিংহ হইতে বাবু চন্দ্রকুমার বসু প্রেরিত ৪৲ টাকা, দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ সাহাবাজপুর ৮৲ টাকা, রমণীমোহন গুপ্ত ঐ ৮৲ টাকা, জ্যোতীন্দ্র নাথ রায় মহাদেবপুর ২৲ টাকা, দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী তেওতা, ১৲ টাকা, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রেঙ্গুন ২ টাকা, লালবিহারী ঘোষ, রাজগঞ্জ ২৩৲ টাকা, সুরেন্দ্রচন্দ্র ১৲ টাকা, সুরেন্দ্র মোহন দাস গুপ্ত বগুড়া ২০৲ টাকা, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা বগুড়া ১৲, ভুবন মোহিনী গুপ্তা বগুড়া ১৲ অন্নদাকুমার মজুমদার বগুড়া ।০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত টাকা বর্দ্ধমান ও কাঁথিতে বিতরিত হইয়াছে।

———0———

বার্ষিক উৎসব—গত ১২ই ডিসেম্বর (২৬শে অগ্রহায়ণ) মহামান্য ভারত সম্রাট-দম্পতীর ভারত সিংহাসনারোহণের দিল্লী দরবারের স্মরণীয় দিনে অত্র আশ্রমের শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন পূজা পাঠ, কীর্ত্তন ও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা পূজা করতঃ উৎসব সম্পন্ন করা-হইয়াছিল।

———0———

বিধির বিধান।

আসাম বেঙ্গল রেলপথের আখাউড়া একটী জংশন ষ্টেশন। একদা জনৈক ভদ্র-সন্তান টাকা কড়ি লইয়া উক্ত ষ্টেশনে অবতরণ করেন এবং রাত্রিকালে কোথায় থাকিবেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহাকে সমাদর করিয়া স্বগৃহে লইয়া যান। অনন্তর অভ্যাগত যুবককে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারীটী তাঁহার পুত্রের গৃহে অতিথির শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অভ্যাগত যুবক বাবুটীর সহৃদয় ব্যবহারে আনন্দিত হইয়া বারম্বার কৃতজ্ঞতা জনাইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। গভীর রাত্রিতে সেই রেলওয়ে কর্ম্মচারী শাণিত অস্ত্র লইয়া পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করেন এবং অভ্যাগত যুবক নিদ্রা যাইতেছে ভাবিয়া অস্ত্রাঘাতে যুবকের দেহ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। অতঃপর অন্ধকারে টাকা কড়ির খোঁজ করিয়া না পাওয়ায় আলো জ্বলিয়া দেখেন, হরি! হরি!! এ কে?—এ তো অভ্যাগত যুবক নহে, তবে টাকার লোভে গৃহে স্থানে দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কাহাকে হত্যা করিল?—তখন তিনি আলো জ্বালিয়া দেখিতে পান যে, তাঁহারই পুত্র ছিন্নদেহ—রক্তাক্ত কলেবরে বিছানায় পড়িয়া আছে। ইহাকেই বলে বিধির বিধান—ভগবানের সাজা। এই ঘটনার পর সেই রেলওয়ে কর্ম্মচারী ঘোর উন্মাদ-গ্রস্থ হইয়াছেন।

অভ্যাগত যুবককে শয়ন করাইয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারীটী ষ্টেশনে গমন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র নিজের শয্যায় টাকাকড়ি লইয়া অপর এক ব্যক্তিকে শয়ান থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকেন এবং এখানে থাকা নিরাপদ নহে বলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলেন। যুবক চলিয়া গেলে, সেই স্থানে তিনি শয়ন করেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারী আর তাহা জানিতে পারেন নাই, তাই স্বহস্তে আপন বংশনাশ করিলেন। পাপ কল্পনায় এই পরিণাম, কার্য্যের ফল একবার ভাবিয়া দেখুন।

মহা-প্রাণতা। সে দিন (১৭ই শ্রাবণ, শনিবার) খুলনা-বরিশাল এক্সপ্রেস-ষ্টীমার 'হলার হাট' হইতে ছাড়িবার কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ সেই ষ্টিমার হইতে একটী হিন্দু স্ত্রীলোক জলে পড়িয়া যায়। ষ্টিমারে তখনই বিষম আর্ত্তনাদ উঠে; কিন্তু কেহই স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হন নাই। হরিচরণ মিস্ত্রী নামক একটী লোক তীর হইতে এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিল; সে তখনই জলে নামিয়া সাঁতার দিয়া স্ত্রীলোকটী দিকে যাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রবল স্রোতে সাঁতরাইয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া, সে-তীরে উঠে এবং নৌকা সংগ্রহ করিয়া আবার তখনই লোকজন সঙ্গে লইয়া যাইয়া স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করে। ষ্টীমারের লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া হরিচরণের পুরস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হরিচরণ কিন্তু তাঁহাদিগকে বলিল,—"আমি ভগবানের জীবকে রক্ষা করিলাম, ইহার জন্য আবার পুরস্কার কি?" হরিচরণের নাম সার্থক, তুমি সত্যই হরিচরণ,—বিপন্নের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

তীর্থ-যাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

৯ই শুক্রবার। আমরা প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম; এমন সময় কষ্টম আফিসের লোক আসিয়া জানাইল যে,—"সত্বর জাহাজ ছাড়িবে, টিকিট্ করিতে হইলে এই সময় করিয়া লউন।" আমি আর চিন্তা না করিয়া "শ্রীহরি" স্মরণপূর্ব্বক টিকিট করিতে গেলাম। তখন সঙ্গের যাত্রী-দল উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল; নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে অগত্যা জাহাজে যাওয়াই স্থির হইল। প্রত্যেকে ১৷৹ টাকা দিয়া দ্বারকাধামের টিকিট করিলাম। পোর্ট আফিসার জাহাজে উঠার জন্য প্রত্যেকের নিকট চারি আনা করিয়া বোটের ভাড়া লইলেন। আমাদের মালপত্র সুবিধামত জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য বোটের মাঝিকে ২৲ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। কাথিয়াবাড়ের দেশীয় রাজা জুনাগড়ের নবাব কর্ম্মচারী, নবাবের তরফ হইতে বোটের বন্দোবস্ত ও কর আদায় করিয়া থাকেন।

আমাদের মালপত্র মাঝির নিকট বুঝাইয়া দিয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া জাহাজে উঠিবার জন্য রওনা হইলাম। মাঝিরা আমাদিগের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ছোট এক খানি মাছুয়াতে—এদেশে বোটকে মাছুয়া বলে—উঠাইয়া দিল। সমুদ্রের তীরেই তরঙ্গের রঙ্গলীলা কিছু অধিক; আমরা মনে করিলাম, তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া বা নৌকা খান্‌চান হইয়া যায়। ভয়ে প্রাণটী ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়া আর এক খানি বড় বোটে আমরা উঠিলাম। অনেকেই তরঙ্গান্দোলিত হইয়া বমি করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। আমি ও আমার স্ত্রী ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার সমুদ্র যাত্রা করায় এবার আর এ উপদ্রব ভোগ করিতে হইল না।

আমি কেবল দ্বারকানাথকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মাচুয়া খানা তরঙ্গের সহিত নাচিতে নাচিতে জাহাজের গায়ে গিয়া ভিড়িল, এইবার জাহাজে উঠার পালা। এ আবার বিষম বিপদ! একে তরঙ্গের আন্দোলনে মাচুয়া অস্থির, তদুপরি জাহাজের গায়ে ঝুলান সিঁড়ির সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়। যেই সমুদ্রের ঢেউ আসিতেছে, আর নৌকা খানি সিঁড়ির গায়ে লাগিতেছে; অমনি যে যেরূপে পারিতেছে, সিঁড়িদিয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ঢেউ চলিয়া গেলে কাহারও সাধ্য নাই যে জাহাজে উঠে। আমরা কোনরূপে ভগবানের ইচ্ছায় জাহাজে উঠিলাম। মাচুয়ার মাঝিরা মালপত্র উঠাইয়া দিয়া পুরস্কারের টাকা দুইটী লইয়া প্রস্থান করিল। জাহাজ খানিতে লোকারণ্য; আমরা কোনরূপে আসন পাতিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম।

জাহাজে বসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নানাদেশীয় যাত্রিতে জাহাজ খানি পূর্ণ,-তবে গুজরাটী ও কাচ্ছীই (কচ্ছদেশী) বারো আনা; মেমন ও বোরা মুসলমান দুই আনা, আর বাকী অন্যান্য দেশীয়। জাহাজে কোন বাছ-বিচার নাই। স্বাধীনা সুন্দরী গুজরাটী যুবতী ডেকের উপর শয্যা পাতিয়া বালিশে আলিস্যা দিয়া শুইয়া আছেন; তাঁহার পার্শ্বেই দীর্ঘকেশ দীর্ঘশ্মশ্রু আফ্গানী পাঠান দুই হাতে গোস্তরুটীর সদ্ব্যবহার করিতেছে। এইরূপ মিশামিশি, ঘেঁসাঘেঁসি, ঠাসাঠাসি ভিন্ন আর উপায় নাই। ইন্দ্রাবতী জাহাজ খানি দেখিতে সুন্দর—সুশ্রী, যেন ময়ূরপঙ্খী;—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝক্ ঝকে্ ত'ক ত'কে; যেমন কেবিন, তেমনই প্রথম শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীও মন্দ নহে, তবে সেখানে বয়লারের উত্তাপে তিষ্ঠান দায়। জাহাজের কাপ্তেন অতি অমায়িক ভদ্রলোক; কিন্তু কেরাণী বাবুটীর অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতি,—তিনি যাত্রীদের উপর অষ্ট প্রহর চটিয়াই আছেন। যাহা হউক ৭টার সময় জাহাজ ছাড়িবার মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টা ও বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খালাসীদের হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল,—ক্রমে তরঙ্গ ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে জাহাজ বাহির সমুদ্রে পড়িল; ক্রমে ভেরোয়াল বন্দর অদৃশ্য হইল। চারিদিকে কেবল অনন্ত জলরাশি ধু ধু করিতেছে। নীল আকাশ নীল জলের সহিত দূরে মিশিয়া গিয়াছে। মাথার উপর অচঞ্চল অনন্ত নীল আকাশ; আর পদতলে সচঞ্চল অনন্ত নীল জলরাশি। নীলিমায় নীলিমায় মহা সম্মিলন—অনন্তে অনন্তে মহা আলিঙ্গন। কি মহান্—কি সুন্দর! অনন্ত, অপরিমেয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের অনন্তত্ব যেমন এই সাগরবক্ষে নীলাকাশের তলে হৃদয়ঙ্গম হয়, সাধারণের পক্ষে এমন আর কুত্রাপি নহে। নীলাকাশ বিশ্বরূপ অনন্তের মহাভাব,—নীলাম্বুস্বামীর অনন্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস অনন্তের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব। জাহাজ সেই অনন্ত নীলজল ভেদ করিয়া হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। বেলা ১০টার সময় পোর বন্দরের ডেকের নিকট জাহাজ নঙ্গর করিল। আরোহী সকল নামা-উঠা করিল। ১৫ মিনিট পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল, জাহাজ পূর্ব্ববৎ চলিতে

লাগিল। ভেরোয়াল বন্দর হইতে ১৫ঘণ্টায় জাহাজ দ্বারকায় যায়। আমরা রাত্রি ১০॥ টার সময় দ্বারকা উপনীত হইলাম। জাহাজ আলো ঘরের (Light house) সম্মুখে —প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে নঙ্গর করিল। আমরা সমস্ত রাত্রি জাহাজেই কাটাইলাম।

১০ই শনিবার। রাত্রি ভোর হইতেই দুইখানি মাছুয়া আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল। অমনি তদ্দেশীয় যাত্রিগণের নামিবার ধুম পড়িয়া গেল। সে এক ভয়ানক কাণ্ড!—মালপত্র ছুড়িয়া বোটে ফেলিতে লাগিল, তাহাতে কতক বোটে পড়িল, কতক বা সমুদ্র গর্ভে পড়িতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার তো চক্ষু স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে একখানা মাছুয়া যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গেল, অমনি সেখানি ছাড়িয়া তীরাভিমুখে রওনা হইল। অন্য খানাও প্রায় পূর্ণ হয়, এমন সময় জাহাজের কেরাণী বাবু আসিয়া রুক্ষস্বরে জানাইল যে,—"সত্বর নাম, জাহাজ এখনি করাচি উদ্দেশে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।" আমি তাঁহাকে কোন উত্তর না দিয়া অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। একজন মাঝির সহিত দুই টাকায় চুক্তি করিলাম, সে মালপত্র বুঝিয়া-লইয়া তীরে পৌঁছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। আমরা কোনরূপে মাছুয়াতে আসিলাম, কিন্তু মালপত্র কোথায় পড়িয়া রহিল তাহার সন্ধানও পাইলাম না। জাহাজ হইতে নামিবামাত্র মাছুয়া তীরাভিমুখে রওনা হইল; সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও করাচি বন্দরের উদ্দেশে ছাড়িয়া দিল। মাছুয়া ক্রমে আলোঘরের নিকটে আসিল, আমরাও রক্ষা পাইলাম ভাবিয়া দমভোর নিঃশ্বাস ফেলিলাম। কিন্তু হরি—হরি! এ আবার কি, পুনরায় নৌকা যে ৪।৫ মাইল সমুদ্রের ভিতর আসিয়া পড়িল। এইরূপে আমাদের পাঁচবার যাতায়াত করার পর তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম। এরূপ হওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম; যখন দ্বারকাপুরীকে সমুদ্র গ্রাস করেন, সেই সময় এই স্থানের পর্ব্বত-শ্রেণীও জলনিমগ্ন হয়। কাজেই ঠিক সোজাপথে তীরে যাওয়া যায় না, জলমধ্যস্থিত পাহাড়গুলিকে ঘুড়িয়া বেড়িয়া তবে তীরে আসিতে হয়। এই সকল মাছুয়ার মাঝিদের বিষম সাহস, তাহারা নির্ভয়ে কেমন শাখামৃগের ন্যায় মাস্তলে চড়িয়া পাইল খাটাইতেছে। পাইল বড় আশ্চর্য্য কৌশলে খাটান হইয়া থাকে। যে দিকেই বাতাস হউক না কেন, খাটাইবার কৌশলে গন্তব্যমুখে বাতাস লাগিবে। মাছুয়ায় আরোহণের তিন ঘণ্টার পর আমরা তটভূমি প্রাপ্ত হইলাম। তীরে গিয়া আর এক আমোদজনক ব্যাপার নয়নগোচর হইল। এক একখান চেয়ার দুই দুই জনে ঘাড়ে করিয়া কোমরজলে, হাঁটুজলে কুলিরা দাঁড়াইয়া আছে। কারণ জানিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক যাত্রীর নিকট তাহারা এক আনা করিয়া লইয়া চেয়ারে বসাইয়া তীরে নামাইয়া দিবে। আমাদের দলের দুইজন অশক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপ নামাইতে হইল। নৌকা মাঝিরা সাধ্যমত তীরে আনিল, আমরা তীরে অবতরণ করিয়া ৺দ্বারানাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের মালপত্র যে মাঝির নিকট দিয়াছিলাম, সে সমস্ত বুঝাইয়া দিল; আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে দুইটী টাকা দিলাম।

পুলিশ আসিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইল। একখানি গরুর গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিয়া আমরা পদব্রজে বেলাভূমির অনন্ত বালুকারাশি অতিক্রম করতঃ বেলা ৯টার সময় সহরে পহুঁছিলাম। একটী নূতন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়া জিনিসপত্র হেপাজতে রাখিয়া পাণ্ডার সহিত গোমতীগঙ্গায় স্নান করিতে বাহির হইলাম।

এই নগরীর বহুদ্বার ছিল বলিয়াই দ্বারাবতী বা দ্বারকা নাম হইয়াছে। প্রাচীন দ্বার গুলি বর্ত্তমান না থাকিলেও কয়েকটী নূতন দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা একটী দ্বার অতিক্রম করিয়া গোমতী তীরাভিমুখে যাইতে শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়ার সুবর্ণ কলস দৃষ্ট হইল। ত্রিলোকসুন্দরের মন্দির-সোপানের সম্মুখস্থ পথে গাইকোবার মহারাজের কর্ম্মচারীর কার্য্যালয়। একজন কর্ম্মচারী কাষ্ঠাসনে একটী বাক্স কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা প্রত্যেকে গোমতী স্নানের জন্য ১/০ জমা দিয়া নাম ধাম লিখিয়া দিলাম। তৎপরে একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আমাদিগের প্রত্যেকের হাতের উপর বেগুনী কালীতে কাঠের ছাপ মারিয়া দিলেন। এই ছাপা না থাকিলে ষ্টেট পুলিস কাহাকেও গোমতীতে স্নান করিতে দেয় না। একবার ছাপ লইলে একাদিক্রমে যত দিন ইচ্ছা দ্বারকায় থাকিয়া গোমতীতে স্নান করিতে পারা যায়; কিন্তু দ্বারকাধাম পরিত্যাগ করিলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। গোমতীর জল অত্যন্ত শীতল এবং লবণাক্ত। আমরা সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

ত্রিলোক সুন্দর।

দ্বারাবতীর ৺দ্বারকানাথের মন্দিরের নাম ত্রিলোকসুন্দর। কিন্তু অন্যনাম জগৎখুট। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে প্রবাদ আছে যে, "শ্রীমন্দির স্বর্ণ নির্ম্মিত; কিন্তু কলিকালে এখন প্রস্তর বলিয়া লোকচক্ষে প্রতিভাত হয়।" দ্বারকা ধ্বংশের সময় কেবল একমাত্র এই মন্দিরই বর্ত্তমান ছিল।

শ্রীমন্দিরে যাইতে কত দেবালয়, কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত তীর্থযাত্রী দেখিলাম। যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই রাজপুতনা, পঞ্জাব, অযোধ্যা, মগধ, মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছেন; আমরা একজন মাত্র বাঙ্গালী। শ্রীমন্দিরে উঠিতে একপঞ্চাশংটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সোপানের দুই পার্শ্বে কত দেবালয় ও মঠ আছে। ত্রিলোকসুন্দরের অভ্রভেদী মোহনচূড়া প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূর হইতে দৃষ্ট হয়। চূড়ার উপরের সুবর্ণ কলসটী সূর্য্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মন্দিরের চারিপার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য দেববিগ্রহ। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে ৺দ্বারকানাথের শ্রীমন্দির, মন্দিরটী চারি অংশে বিভক্ত; ১। দ্বার, ২। মণ্ডপ অর্থাৎ যাত্রিগণের বিশ্রামস্থান, ৩। গর্ভগৃহ অর্থাৎ দেবার্চ্চনা স্থান, এবং ৪। শিকরা বা চূড়া। মণ্ডপটী ২১ ফিট দীর্ঘ ও ২১ ফিট প্রস্থ; ইহার পাঁচটী তল, প্রত্যেক তলই স্তম্ভ শ্রেণীর উপর বিন্যস্ত; এবং নিম্নের তল অপেক্ষা উচ্চতল গুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া সর্ব্বশেষে একটী গম্বুজে পরিণত হইয়াছে। মণ্ডপের মেঝে হইতে

গম্বুজের মস্তক ৭৫ ফিট উচ্চ। প্রথম তলটী বিশ ফিট উচ্চ,—ইহা সমচতুষ্কোণ; প্রতি কোণে চারিটী বিপুল স্তম্ভ এবং মাঝে মাঝে আরও অনেক স্তম্ভ। মস্তকের উপর এইগুলি স্তরের পর স্তর বিরাট গম্বুজের আকার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্ব নিম্নতলের সারি সারি স্তম্ভের উপর সারি সারি খিলান এই খিলান ১০ফিট প্রশস্ত। এই সকলের কারুকার্য্য অতি চমৎকার; কিন্তু মুসলমান অত্যাচারে অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মণ্ডপের পূর্ব্ব দিকে গর্ভগৃহ এবং তাহারই উপরে শিকরা বা চূড়া। চূড়াটী কোণাকার একটী কোণের উপর আর একটী,কোণ এইরূপে ক্রমান্বয়ে কোণগুলি বিন্যস্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর আকারে সাতটী স্তরে আকাশমার্গে উঠিয়া গিয়াছে। ভূমি হইতে শীর্ষদেশ ১৪০ ফিট উচ্চ। কোণগুলিও স্তম্ভ শ্রেণীর উপর স্তম্ভ শ্রেণী সাজাইয়া নির্ম্মিত। ইহারই নিম্নে সমচতুষ্কোণ গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের দ্বার পশ্চিমাভিমুখী। এই গৃহের মধ্যস্থলে উচ্চ বেদী; তাহার উপর সিংহাসনে ৺দ্বারকা-নাথের শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

৺দ্বারকানাথ দর্শন।

আমরা যখন শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তখন ভোগ অন্তে আরত্রিকের উদ্যোগ হইতেছিল। কাজেই গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ। মণ্ডপে অসংখ্য যাত্রী সাগ্রহে আরাত্রিকের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিস্তর মালাকার জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ পুষ্প, পুষ্পমাল্য ও তুলসী বিক্রয় করিতেছে। অল্প পরেই আরাত্রিকের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মরি মরি এ কি দেখিলাম ! এত রূপ—রূপের ছটায় গৃহ আলোকিত করিয়াছে। ইনি যে রাজা রণছোড়; ত্রিভঙ্গিমঠাম বাকা বংশীধারী নহেন। তাই শিরে শিখীপাখা—অধরে মূরলী—কটীতটে পীতধড়া নাই। ইঁহার রাজবেশ, সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য রাজ পরিচ্ছদে আবৃত; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই অদৃশ্য, কেবল প্রশান্ত বদন সুধাকরের অনিন্দ্য সুন্দর হাসিটুকু ভক্তের নয়নগোচর হইতেছিল। শিরে রাজমুকুট; চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজিত। আরাত্রিকের ধূম-ধূনা ও কর্পূরের গন্ধে মন্দির ভরিয়া গেল। এই স্থানের ধূপশলার ন্যায় সুঘ্রাণ ভারতের আর কোথায়ও দেখি নাই।* আরতি হইতেছে; সমবেত যাত্রীবৃন্দ "জয় রাজা রণছোড়" রবে মুহুর্মুহুঃ দিগঙ্গন কম্পিত করিয়া জোড়হস্তে ছলছল নেত্রে মোহঃ আরতি দেখিতে লাগিলেন। আনন্দে-পুলকে আমার রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম সত্যই কি এত ভাগ্য করিয়াছি যে আজি বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে সেই আরাধনার ধন ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক দেখিতেছি ! যুগে-যুগে জপ-তপ করিয়াও যাঁহাকে ধ্যান-ধারণায় আনিতে পারা যায় না, আমি কি এই পার্থিব চক্ষে সেই রূপ সুধাপান করিয়া নরজন্ম সার্থক করিলাম ?

আরাত্রিক শেষ হইবামাত্র সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমরা চরণামৃত লইয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া

---

* প্রবন্ধ লেখক দ্বারকামহাধামের একটী ধুপ শলাকা পাঠাইয়া, ইহা আমাদিগের নিকট প্রমাণ করিয়াছেন। সঃ আঃ—দঃ

আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। রাত্রেও আরাত্রিক দেখিতে শ্রীমন্দিরে গিয়াছিলাম। আমাদের পাণ্ডাজীর নাম শ্রীসোমজী লালজী উপাধ্যায়। ঠিকানা,—গোমতী দ্বারকায়, নয়া দরজার সম্মুখস্থ বাটী। ইনি বিশেষ ভদ্রলোক; তবে আদান-প্রদান ও স্বার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই প্রায় সমান ব্যবহার।

১১ই রবিবার। অদ্য রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সকলে গোমতীতে স্নান করিতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি-করতঃ নদী তীরস্থ একটী দালানের মধ্যে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিলাম। পরে শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, প্রণাম ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। আহারান্তে বৈকালে সহরের বাজারাদি নানা স্থান দর্শন করিলাম। রাত্রেও আরাত্রিক দেখিতে শ্রীমন্দিরে যাই।

১২ই, সোমবার। অদ্য রাত্রি প্রভাত হইলে কিঞ্চিৎ পরে শ্রীবিগ্রহের একজন সেবায়েৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন যে,—"অদ্য আপনাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে শ্রীশ্রীরণছোড়জীর চরণ পূজা করিতে পারিবেন; কিন্তু তৎজন্য প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দিতে হইবে।" আমরা সস্ত্রীক স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীচরণ পূজাকরিতে শ্রীমন্দিরে যাত্রা করিলাম। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

———:0:———

বৈতরণী।

(মৃত্যুর পর বৈতরণী-তীরাগত জীবের উক্তি।)

১

ছিনু সুপ্ত শয্যাপরে স্বপ্নময় দেশে,
বিলাস, বৈভব, সুখে বেষ্টি চারিধার;
প্রেয়সীর আলিঙ্গনে, বদ্ধ বাহুপাশে—
কে আনিল মোরে হেথা তপ্ত সিন্ধুপার!

২

কে তোমরা দুই জন? কৃতান্ত-কিঙ্কর?
কি মূর্ত্তি! কি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি জলন্ত পাবক!
কি কহিছ? ঝাঁপ দিব ক্ষুব্ধ সিন্ধুপর?
না—না, অঙ্গ হবে দগ্ধ, অগ্নি লকলক!

৩

কি তপ্ত! কি নীল ধূম উঠিছে সঘনে!
কি আবর্ত্ত! কি তিমির! কে হও তোমরা?
সন্তরিছ তপ্ত সিন্ধু করুণ ক্রন্দনে,
বিদারিয়া নভস্থল, আকুল অন্তরা!

৪

ওকি! ঊর্দ্ধে কে তোমরা যাও শূন্যদিয়া,
কেহ রথে পুষ্পময় কেহ খগ প্রায়,
কে তোমরা ভাগ্যবান? নিয়েছি বুঝিয়া
এই বৈতরণী—পাপী সন্তরে ইহায়?

৫

বৈতরণী? কোথা আমি? মৃত কি জীবিত?
কোথা গৃহ? কোথা শয্যা? এই কোন দেশ?
কোথা মাতা, পিতা ভ্রাতা আত্মবন্ধু যত?
ছেড়ে দাও দূতদ্বয় যাই গো স্বদেশ!

৬

ক্রুর পন্থা ? একি ! উঃ ! কি ভীষণ তিমির !
কোথা যাই ? উহুঃ, উহুঃ, মেরো না আমায়
ঐ তপ্ত বৈতরণী—পশ্চাতে নিবিড়
তিমিরের যবনিকা—কোথা যাই হায় !

৭

স্বদেশ ? কোথায় মোর ? কে আমি ? কোথায় ?
এ কি সঙ্গে ? পাপভার ? কি করিব হায় !
সারা জন্ম কাটাইনু হেলায় খেলায়,
গেছে কত কোটী জন্ম এজনমও যায় !

৮

উহুঃ ! উহুঃ ! যায় প্রাণ, করো না প্রহার !
দেই ঝাঁপ—না, না, তপ্ত—অঙ্গ জ্বলে যায় !
কোথা মাগো ! জগত্তারা ! একি পারাবার ?
কোলে নে মা ! এ পাতকী ডাকে উভরায় !

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

—o—

বাসন্তী পঞ্চমী
বা
সরস্বতী তত্ত্ব।

চিন্ময়ী সরস্বতী আজ মৃন্ময়ী দেবীরূপে বঙ্গধামে উদয় হইয়াছেন। সরস্বতী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের উৎস। প্রেমময়ীর প্রেম-মুগ্ধ বঙ্কিম ভাব,—শ্বেত শতদলে পদে পদ রাখিয়া ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্বেতবরণে দেবী মনোহরা;—শিরে উজ্জ্বল কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় গজমুক্তার হার—শ্বেতাঙ্গিনীর সমস্ত অঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্ন ভূষণে ভূষিত। মুখে মৃদু-মধুর হাস্য বিকাশ। গাত্রে জলদগ্নিসম পীতাম্বর—সর্ব্বাঙ্গে বাসন্তী মাধুরী। চির যৌবনা নব লাবণ্যে বিমোহিনী। মোহিনীর নিতম্ব-চুম্বিত চিকুরদামে কত কুন্দ কলি বিকশিত; করকমলে বীণা,—কুঞ্জকাননের কূজন রবে ঝঙ্কারিত হইতেছে। ভক্তমানস মানস সরো-বরের শ্বেত-হংস মূর্ত্তিতে দেবীর পদপ্রান্তে আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভক্তমণ্ডলীর পদতলে সমস্ত পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও শাস্ত্র সমর্পণ করিয়া সবাই সমভক্তিতে পবিত্রমনে দেবীকে আরাধনা করিতেছে—তাঁহার পদ-কমলে পুষ্প গুলি দিতেছে। পূজার সমস্ত শ্বেতবর্ণ উপকরণ—সুগন্ধিশ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, শ্বেতবর্ণ নববস্ত্র, মনোহর শ্বেতশঙ্খ, শ্বেতপুষ্পের মালা, শ্বেতপদ্ম ও শ্বেতবর্ণের ভূষণ। এ যে পুণ্যের প্রতিমা, পবিত্রতার পূজা।—তাই মূর্ত্তি শুদ্ধ সত্ত্বরূপিনী শ্বেতাঙ্গিনী ও তাঁহার সমস্ত শুভ্রময়।

পাঠক ! বসন্তকালের বাহ্যভাব একবার চাহিয়া দেখুন ! আজি পুরাতনও মৃতপ্রায়, শীতে জর জর শীর্ণ কলেবরা। পৃথিবী যেন নবজীবনে সঞ্জীবিতা হইয়া উঠিয়া নবশোভা ধারণ করিয়াছে। এই মধুর বসন্তকালে প্রকৃতি শত শোভায় শোভিতা। বনে বল্লরী সকল মৃদুসমীরণে নৃত্য করিতেছে। তরুরাজি

নব কিশলয়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রসূনরাশি তরুরাজিকে শোভিত করিয়াছে। বঙ্গদেশে ঋতুরাজ বসন্তের রমণীয়তা সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত। কুসুমাকর সর্ব্বত্রই কুসুম মালায় সুশোভিত। কিশলয়-কান্তিও কুসুমের সৌন্দর্য্যে সুরঞ্জিত। বন বল্লরীর নৃত্য ও হাস্য, কুসুম শোভা বুঝি পরাজিত করে। মুকুলমালাও ফুলকুল বিজয়িনী। কত বিচিত্র বর্ণের রাগরঞ্জন চারিদিকে বিকশিত হইয়াছে। উল্লাসে পিক-বধূ অন্যান্য বনবিহঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তান ধরিয়াছে মধু-কর নিকর কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে, মলয়ানিল মৃদুহিল্লোলে ভ্রমন করিয়া পুষ্প সৌরভে চারিদিক পরিপূর্ণ করতঃ মধুরতা প্রকাশিত করিতেছে। চারিদিকে সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য,—সুষমা আর শোভা। ঋতুরাজ আজ প্রকৃতি সুন্দরীকে বসন্তের নব সৌন্দর্য্যে সাজাইয়াছেন। জগৎপতি আজি প্রেমময়ী প্রকৃতি সুন্দরীর লীলায় অনুরক্ত। সংসার প্রফুল্লতায় হাসিতেছে। আনন্দময়ীর সংসারধাম নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

সরস্বতী প্রতিমা বাসন্তী-প্রকৃতির প্রাথমিক ছবি কিম্বা প্রকৃতি দেবীর প্রেমলীলার ঐশ্বর্য্যময় বিকাশ বসন্ত। আর্য্যঋষিগণ বসন্তকালের শোভাময় বিশ্বকুঞ্জ মধ্যে অবস্থিত হইয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। ধ্যানে তাহারা প্রকৃতির যে রূপ দেখিলেন, সেইরূপে তাঁহাকে হৃদয় মন্দিরে স্থাপিত করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলেন। আর্য্যঋষিগণ তখন বিশ্বের বাসন্তী সৌন্দর্য্যধামে সেই সরস্বতীদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পাঠক! সরস্বতী মূর্ত্তি হিন্দুদিগের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত পুতুল খেলা নহে। উহা ঋতুরাজ বসন্তকালের বাসন্তী সৌন্দর্য্যময় বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের আরাধনা।

বসন্ত-সজ্জিত শোভাময় প্রকৃতি-মন্দিরে দ্বারদেশে প্রথমেই জ্ঞানদেবী। সেই বসন্তসজ্জামাঝে বিদ্যাদেবীর মূর্ত্তি যত মোহনভাবে গড়িতে হয়, আর্য্যঋষির কল্পনা তাহা গড়িয়া গিয়াছে। সেই মূর্ত্তি সরস্বতী—ব্রহ্মাণ্ডের শতদল তাঁহার পদতলে, জ্ঞানা-কর্ষণী মধুময় বীণা তাঁহার করতলে, মোহ-করী শ্রী ও লাবণ্য তাঁহার মুখমণ্ডলে, জয়ের উজ্জ্বল কিরীট তাঁহার কুন্তলে—আর সাত্ত্বিক জ্ঞানরূপ পবিত্র বিশদ বরণের বিমলতা তাঁহার বক্ষঃস্থলে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী সরস্বতী ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই সরস্বতীর রূপ আজিও জগজ্জনের মনো-হরণ করিয়া রহিয়াছে। সাধারণ লোক সকল সরস্বতীর বাহ্যবিকাশ বাসন্তী শোভায় মোহিত হইল; আর ভক্ত—সাধক অন্তর্-রাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য বিদ্যাদেবীর ধ্যান ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিব্য-চক্ষু ব্যতীত সে রূপ—সে সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। দিব্য চক্ষুলাভ করিতে হইলে জ্ঞানের সাধনার প্রয়োজন। সাধনায় ক্রমশঃ ষড় রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম করিতে পারিলে অজ্ঞান আঁধার দূরীভূত হইয়া সাধকের হৃদয়ে বাসন্তী-পঞ্চমীর জ্যোৎস্নার ন্যায় জ্ঞানা-লোক ফুটিয়া উঠিবে। সেই শ্রীপঞ্চমীতে দেবী সাধককে দেখা দিবেন। সাধক তখন দেখিবেন, সেই দেবীই জগতের সমস্ত শোভার লাবণ্য ও শ্রী; সমগ্র বসুন্ধরাকে দেবী আলোকিত করিয়াছেন। তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। দেবী তাঁহাকে সেই বাসন্তীয় জগতের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ

লাভের অধিকার দিয়া জ্ঞানের মন্দির-দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন। তখন স্থূল প্রকৃতি ভেদ করিয়া জ্ঞানদ্বার দিয়া বিজ্ঞানধাম অতিক্রম করিলেই দেবীর মহারাসসর মহামঞ্চ দৃষ্টিগোচর হইবে। এখানে দেবী স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ রূপে রাধাশ্যাম মূর্ত্তিতে বসন্ত কালের সমস্ত শোভা সম্পাদন করিয়া মদনোৎসব—দোললীলা করিতেছেন। তখন সাধক দেখিবেন, শ্রী পঞ্চমীর ক্ষীণালোক গিয়া বাসন্তীর পূর্ণিমার দিব্য জ্যোতিতে হৃদয়-আকাশ ভরিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে সরস্বতী দেবীর আরাধনায় কেন কৈবল্য সাধিত হয়, তাহার কারণ প্রদর্শন করা হইতেছে। সংক্ষেপতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করা যাউক। পরমতত্ত্ব পরমাত্মা সৃষ্টি করিবার বাসনা করেন, ব্রহ্মের বাসনা হইলেই সেই নির্গুণ সত্ত্বা সগুণ হইলেন, আর সেই বাসনাই জীবসৃষ্টির কারণ হইলেন। যেমন ফুল হইতে ফল হয়, তেমনি নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বর হইলেন, এবং সেই বাসনাই জীবের আদি কারণভূতা হইলেন। ইহারাই সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতিপুরুষের অধ্যাসে সগুণ (ক্রিয়াশীল) সৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপে পরিণত হইলে অহঙ্কারতত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র সাকল্যে এই জগতের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান এবং পুরুষ নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি আবার দ্বিবিধা—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। ব্রহ্মের সৃষ্টি-বাসনা হইলে তিনি সগুণ হইলেন, তাহার যে সৃষ্টি বাসনা—তিনি পরা প্রকৃতি; আর পুরুষ ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার অবস্থা দ্বারা প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব, এই ত্রিবিধ গুণ অভিব্যক্ত হইল। সেই গুণত্রয় হইতে ক্রিয়াশক্তি হইল,—এই ক্রিয়াশক্তি অপরা প্রকৃতি। অতএব জীব জগতের সৃষ্টি কার্য্য দার্শনিকগণ তিনটী অবস্থা বা বৈজিক ব্যাপারের অনুমান করিয়া থাকেন। যথা পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি এবং বিন্দু।

আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাবিন্দু সমুদ্ভবঃ।

সারদাতিলক।

বিন্দু শব্দ ব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশবীজ;—এই বিন্দুই শক্তিতত্ত্ব। এই চিদংশ বীজ চিদচিন্মিশ্রিত নাদের মধ্যবর্ত্তী। এই শক্তিতত্ত্ব হইতেই জগতের সৃষ্টি অনুস্যূত। অতএব বাসনা জীব হইবার আগেই সৃষ্টি হইয়াছেন, প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা বা আর যাহা কিছু বলুন,—তাহাতেই জীব জাত, বর্দ্ধিত ও সংস্থিত।

সগুণ ব্রহ্ম বা পুরুষ ত্রিগুণে ত্রিশক্তিধারী। কাল চৈতন্য ও সৎ এই তিনটী নিত্য চৈতন্যময় বস্তুর ক্রমপর অবস্থাই তিনটী শক্তি। এই তিন শক্তি ঈশ্বর বশীভূত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে জীব-জগতের সৃজন, পালন ও লয় করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম—সরস্বতী, বিষ্ণুর পালনকারিণী শক্তির নাম—লক্ষ্মী এবং শিবের লয়কারিণী শক্তির নাম—কালী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহারা ভিন্ন নহেন, ঈশ্বরের গুণত্রয়ের ক্রমবিকাশ অবস্থা মাত্র ঈশ্বরের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে পরিণত অবস্থাই শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এবং যে শক্তির দ্বারা উক্ত ত্রিবিধরূপ পরিণত হ'ন, সেই শক্তির নামই কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সুতরাং

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবে এই তিনে যেমন এক; তেমনি ত্রিশক্তিও অভিন্ন। আবার শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বশতঃ ব্রহ্মা ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং শিব ও কালী ইহাঁরাও পরস্পর অভিন্ন। প্রাণ এবং দেহে যেরূপ সম্বন্ধ, শক্তি ও শক্তিমানেও তদ্রূপ সম্বন্ধ-যুক্ত। প্রাণ ব্যতীত যেমন দেহ বিকল, তদ্রূপ শক্তি ব্যতীত পুরুষ শবমাত্র। উভয়ে আধার-আধেয় ভাবে গুণের কার্য্য করিতেছেন। ত্রিশক্তির সমন্বয়ী ভাবই গায়ত্রী দেবী। সুতরাং গায়ত্রী উপাসনা দ্বারা বেদ স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল নিম্নাধিকারীজনগণ বেদ-প্রতিপাদিত ঈশ্বরের এই সার্ব্বভৌমভাব ধ্যান-ধারণায় আনিতে পারে না, তাহাদিগের জন্য পুরাণে পৃথক্ পৃথক্ শক্তির আরাধনার বিধি আছে। তাই হিন্দুসমাজে অধিকারী ভেদে কেহ ব্রহ্মা ও সরস্বতীর, কেহ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর এবং কেহ বা শিব ও কালীর উপাসনা করিয়া থাকে। মূলে তিনই অভিন্ন; সুতরাং একজনের আরাধনায় তিনেরই আরাধনা হইয়া থাকে। তবে প্রথম অধিকারীকে ব্রহ্মা ও সরস্বতীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কেন না, ব্রহ্মাই প্রকৃতির কার্য্যাবস্থা বা স্থূলবিকাশ। স্থূল জগতের জীবকে স্থূলের ভিতর দিয়াই কারণে যাইতে হইবে। তবে জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় যাহাদিগের উচ্চ অধিকার জন্মিয়াছে, তাহারা সূক্ষ্ম ও কারণাবস্থারও উপাসনা করিতে পারে। ব্রহ্মের স্থূল পরিণামই বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মা, এবং তাঁহার শক্তি সরস্বতী দেবী। সরস্বতী ও ব্রহ্মা অভিন্ন,—ব্রহ্মা দেহ এবং সরস্বতী প্রাণ; সুতরাং সরস্বতীর উপাসনাই বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মার উপাসনা। আবার স্থূল জগতের রূপ বসন্তকালেই পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্বিভূতি বর্ণনা কালে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন;—"ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" অর্থাৎ "ঋতুসকলের মধ্যে আমি বসন্ত।" তাই বসন্তকালে বিরাট্ শক্তি সরস্বতীর পূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং স্থূল প্রকৃতির বাসন্তী-সজ্জা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সরস্বতী প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাঠক! হিন্দুঋষি ব্যতীত আর কেহ কি রঙের তুলিতে এমন আধ্যাত্ম চিত্র চিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছে কি?

সরস্বতী দেবীকে বাসন্তী-সৌন্দর্য্য সুশোভিত বিরাট ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আরাধনা করিতে হইবে। বিদ্যাদেবীর আরাধনা না করিলে কে আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানে লইয়া যাইবে? কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া যখন বাসন্তী পঞ্চমীর নির্ম্মল চন্দ্রালোকের ন্যায় জ্ঞানের উন্মেষ হইবে, তখনই সাধক জ্ঞান অনুশীলনের অধিকারী হ'ন; তাই বসন্তের শুক্লাপঞ্চমীতে বিদ্যা দেবীর আরাধনার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যাদেবীর আরাধনায় সাধক জ্ঞানালোকে প্রকৃতি-মন্দিরে প্রবিষ্ট হন। প্রথমতঃ প্রকৃতির কার্য্যময় স্থূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া কারণময় সূক্ষ্ম অবস্থা অবগত হন, তৎপরে ফলময় কারণ অবস্থা ছাড়াইয়া বিশুদ্ধ তুরীয়ভাবে উপনীত হয়েন। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা লইয়াই পুরাণে ব্রহ্মার চারিমুখের কল্পনা হইয়াছে।

সরস্বতী আরাধনায় সাধক কেন ও কিরূপে ব্রহ্মধামে উপনীত হয়েন, তাহা বোধহয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বিদ্যাদেবীর আরাধনায় অর্থাৎ জ্ঞানালোচনায় অবিদ্যা দূরীভূত হয়। অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে অপরা প্রকৃতির পরিণাম স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরা প্রকৃতির রাজ্যে গতি হয়। তখন চিৎ-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে জ্যোতিঃতে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি সাধকের নয়নগোচর হয়। তখন সাধক স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, এই চিৎ-শক্তি নিত্য ভগবানে প্রতিষ্ঠিত। অনাদি কাল হইতে ভগবান সংসারী এবং চিৎ শক্তিতে আসক্ত তাঁহাদিগের কি গভীর ও স্থায়ী প্রণয়। অনাদি কাল হইতে এই প্রেম চলিয়া আসিতেছে। পরা প্রকৃতি তাই যথার্থ সতী নামের পাত্রী। তাঁহাদের প্রেম অতুলা, নিত্য ও অপ্রেমেয়। সাধক তখন স্পষ্ট দেখিতে পান এই সচরাচর জগতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের মঞ্চোপরি পরমপুরুষ মদনমোহন রূপে স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধার সহিত তালে তালে দুলিতেছেন। এই তত্ত্বপূর্ণভাবই ভক্ত হৃদয়ের দোললীলা। পাঠক! সরস্বতীতত্ত্ব এবং তাঁহার আরাধনার সার্থকতা বুঝিলেন কি? শ্রীপঞ্চমীতে বিদ্যাদেবীর আরাধনা আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ হৃদয়ে বসান্তী-পূর্ণিমা বিকশিত হইবে। সে আলোকে তোমার অহংজ্ঞান দোলমঞ্চে পরিণত হইবে। প্রকৃতি-পুরুষ তখন সমস্ত বাসন্তী-শোভা প্রকটিত করিয়া সেই মঞ্চে দাড়াইয়া দুলিতে থাকিবে; ভক্ত সে ভাবসাগরে চিরদিনের মত নিমগ্ন হইয়া যাইবেন। এস পাঠক! আমরা আজ বসন্তের প্রথম দিবসে সেই অজ্ঞাননাশিনী চৈতন্যরূপিণী, চৈতন্যপ্রদায়িনী সরস্বতী দেবীর অতুল রাতুল চরণের উদ্দেশে প্রণাম করি—

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে॥

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

সাধক সঙ্গীত।

[১০]

নাই আভরণ অমন কথা মুখে এন না মা আমার।
আমিই করতে পারি কেবল অলঙ্কারের অহঙ্কার॥
এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার সাজানো থাল,
প্রাতর্ম্মধ্য সায়ংকালে পরা'য়ে দেন স্বয়ং কাল,
নিশাকালে বদনে পরায়, তাতে আলো আঁধার দুইই দেখায়,
বল মা ভবে কার বা কাছে আছে তেমন অলঙ্কার
কেবলে মা তোমার উমার আভরণের অপ্রতুল,

পরি আমি স্থির তড়িতের সুতায় গাঁথা তারার ফুল,
প'রে থাকি ব'লে বলি ইন্দ্রধনু একাবলী,
তা বই জয়ন্তী কি আর প'রবে বৈজয়ন্তীর হার ॥
জীবের আয়ুঃ নাসার নোলক, জানে তা ত সর্ব্বজন,
পদ্মপত্রের জলের মত দোলে যে তা সর্ব্বক্ষণ,
বেদ সমুদ্রের মহারতন, উপনিষদ কর্ণের ভূষণ,
মুকুট আমার সদানন্দ, নাশে ভবের অন্ধকার ॥
বরাভয় মোর হাতের বলয়, সেত সবার জানা কথা,
করুণার কঙ্কণ পরি, মুক্তিফলের মুক্তা গাথা,
মায়ার বস্ত্রে কায়া ঢাকি সতত সঙ্গোপনে থাকি,
নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার ॥
অষ্ট সিদ্ধির নুপুর পরি তাতেই বেশি অনুরাগ,
পুণ্যসঙ্গ স্বরূপিনি, স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ,
ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চক্ষের কাজল,
কালান্তক তাম্বুল আমি চর্ব্বণ করি বারম্বার।
গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধালেই ব'লবে সেই,
বাছা বাছা কাঁচা মেঘের আমলা বেটে কেশে দেই,
পোহালেই বিভাবরী, শিশু সূর্য্যের সিন্দুর পরি,
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥

———:0:———

প্রেমের সমাধি।

নবম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণধন কৃষ্ণনগরে আসিয়া গুরুলাভের জন্ত বড়ই ব্যাকুল হইল। প্রাণের যে ব্যাকুলতা মাতৃপিতৃ চরণ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হইত, তাহাও প্রায় নিবৃত্তি হইয়া আসিয়াছে, প্রিয়বন্ধুর সমাগম লাভের জন্ত ভালবাসার যে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই চারি দিকের বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত ব্যাকুলতা একীভূত হইয়া জগদ্গুরুর চরণ লাভের আশায় প্রবল বেগে উধাও ধাবিত হইয়া চলিল। কৃষ্ণধন

আজকাল দিনরাতই কাঁদে। নয়নের অভ্যন্তর ভাগ হইতে ব্যাকুল অশ্রুর সঞ্চিত ভাণ্ডার কঠোর আঘাতে মুক্ত হইয়া, অবিরত ধারায় বহিতে লাগিল। সে ক্রন্দনের আর নিবৃত্তি হইল না। জীবনকুমার বন্ধুর এতাদৃশী দশা নয়নগোচর করিয়া বড়ই আকুল হইল। সেও কেবলই কাঁদিতে লাগিল, আর প্রতি ক্ষণেই ভগবানের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কেন তিনি তাহার বন্ধুকে এত কষ্ট দিতেছেন, কেন তিনি তাহার প্রাণে শান্তি প্রদান করিতেছেন না? সরলপ্রাণ জীবনকুমার ভগবানে নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া কেবলই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছে। কৃষ্ণধনকে তিনি পথের কাঙ্গাল করিয়াছেন, তাহাকে পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার পিতাকেও তিনি অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় রাখিয়াছেন। ইহা তো জীবনকুমারের প্রাণে সহ্য হয় না। কিন্তু ইহাতে ভগবানের যে কি মঙ্গলময় ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মাতার স্নেহ ও পত্নীর প্রণয়-ডোর ছিন্ন করিয়া দিয়া, ভগবান কৃষ্ণধনকে যে কি মহান আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন তাহা জীবনকুমার একেবারেই বুঝিতে পারিল না। কেবল জীবনকুমার কেন, সাধারণ সকল লোকেই কৃষ্ণধনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কৃষ্ণধন কিন্তু এই সাংসারিক দুঃখে একটুকুও কাতর নহে; এবিষয়ে সে ভগবানের উপর সন্তুষ্ট বই, রুষ্ট নহে। সে বেশ বুঝিয়াছে তাহার মঙ্গলের জন্যই ভগবান এই অঘটন ঘটাইলেন; তাহার সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া এক মহা উপকার সাধন করিলেন। যদি সংসারে মায়ের মন জোগাইয়া, পত্নীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া চলিতে হইত তবে বুঝি আর ভগবানের প্রতি প্রাণের এরূপ টান পড়িত না। তিনি মঙ্গলময়; কৃষ্ণধনের দিকে চাহিয়া, করুণা-নয়নে তাই তিনি তাহাকে এমন মধুর আশীর্ব্বাদ করিলেন। এরূপ হইল বলিয়াই আজ কৃষ্ণধন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে,—কৈ প্রভু তুমি তো দয়াময়, এবিষয়ে আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলে চলিবে কেন? দয়া করিয়া মায়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা সকল তোমার দিকে টানিয়া নিয়াছ, আজ আমায় আমার গুরু প্রদান করিয়া তোমার করুণার একশেষ প্রদর্শন কর। আমি তো আর পারি না; কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন অন্ধ হইতে চলিল। কোথায় আমার গুরু? তুমি না আশ্বাস দিয়াছিলে? তুমি না আদেশ দিয়াছিলে গুরুকে ধরিবার নিমিত্ত? আমি তো তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি; তোমায় প্রভু করিয়া নিজে দাস হইয়াছি। নাথ, তুমি ভালবাসিয়া আমার ভালবাসা কাড়িয়া নিয়াছ,—আমায় ক্রীতদাস করিয়াছ। ক্রীতদাসের আবার ক্ষমতা কি প্রভু? সে যে তোমায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বড় আশায় তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। তুমি মুখে আহার তুলিয়া দিলে সে আহার করে; তুমি শোয়াইলে সে শয়ন করে। তোমা বিনা এ জীবনে আর তো তাহার কেহই নাই। তুমিও যদি এরূপ বিরূপ হও, তবে আর সে কি করিবে? সে তো আর নিজের অক্ষম ক্ষমতায় গুরু অন্বেষণ করিতে পারে

না ? গুরু প্রেরণ করিয়া তাহাকে এ নিদারুণ যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার কর প্রভো।

কৃষ্ণ শয্যায় শুইয়া কাঁদিতেছে আর এই কথা বলিতেছে। আহারে মন নাই; কেহ আহার করাইয়া দিলে আহার করে, নতুবা অনশনেই দিবা অতিবাহিত হয়। আহার করিয়া মুখ ধুইতে ভুলিয়া যায়, জীবনকুমার স্বহস্তে মুখ ধোয়াইয়া দেয়। জীবনকুমার এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণধনকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারে না। তাহার শয্যার প্রান্তদেশে বসিয়া সেও ক্রন্দনের ভাগী হয়। কৃষ্ণধন কাঁদে গুরুলাভে হতাশ হইয়া, আর জীবনকুমার কাঁদে কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখী হইয়া। কৃষ্ণধন অনাহারে থাকে ভগবানের উপর মান করিয়া,—আর জীবনকুমার অনাহারে থাকে বন্ধুতার পবিত্র আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া। শয্যা ছাড়িয়া কৃষ্ণধন উঠিতে পারে না,—হস্ত পদ অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীর্ণ দেহ শয্যার সহিত একরূপ মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্যাকুলতার অনলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া দেহকেও দগ্ধ করিয়াছে। যে বিমল সৌন্দর্য্য কৃষ্ণধনের পবিত্র মুখমণ্ডলের উপরে খেলা করিত, তাহা আর এখন নাই; ব্যাকুলতার অসহ্য যন্ত্রণায় কালী হইয়া গিয়াছে। যে পবিত্র লাবণ্য কৃষ্ণধনের নধর অঙ্গে বিজড়িত ছিল, তাহা বিরহের আগুণে ছাই হইয়া গিয়াছে। জীবনকুমার বড় দুঃখে দুঃখী হইয়া তাই মাঝে মাঝে বলে, ভাই তুমি আর কাঁদিও না, তোমার কান্না দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। বলিলে কি হইবে ? কৃষ্ণধন সে কথা শুনিয়াও শুনিতে পারে না। চেষ্টা করিয়াও সে অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারে না। কেবলই কাঁদে। মুখে কোনও কথা নাই, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পায় না; কেবল দেখিতে পাওয়া যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় নয়নযুগল হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। কবে যে সে অশ্রুর নির্ব্বাণ হইবে কে বলিবে।

প্রায় পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া কৃষ্ণধন কেবলই কাঁদিতেছে। অবিরাম অশ্রুপাতে মনের সকল মলিনতা ধৌত হইতে চলিয়াছে। এমনই বুঝি হয় একটুকু কালিমা থাকিতেও তিনি আসিতে পারেন না, তাই অশ্রুর গঙ্গাজলে হৃদয় বেদী ধৌত করাইয়া লন। আজ বোধহয় ভগবানের কর্ণে কৃষ্ণধনের ব্যাকুল ক্রন্দন পৌঁছিয়াছে।

রাত্রি অধিক হইয়াছে; কৃষ্ণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই নিদ্রিত অবস্থায় সে স্বপ্নে দেখিল, এক জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশে সে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সে জ্যোতি যেন বড় স্নিগ্ধ, যেন শত শত চন্দ্রের বিকশিত প্রভায় বড় শীতল, বড় নির্ম্মল। সেই পুলকিত আলোকে কোটী কোটী সৌদামিনীজড়িত-অঙ্গে এক মহাপুরুষ তাহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। সেই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্রই পুলকে কৃষ্ণধনের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিত কলেবরে জাগরিত হইয়া চক্ষু চাহিয়াই দেখিল, স্বপ্নদৃষ্ট সেই মহাপুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার দেহের বিমল জ্যোতিতে গৃহ খানি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণধনকে জাগরিত দেখিয়া সেই মহাপুরুষ অমৃতমধুরকণ্ঠে বলিলেন,—বৎস তুমি, মন্ত্রলাভের জন্য ব্যাকুল

হইয়াছ? এই গ্রহণ কর তোমার মন্ত্র। এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণধনের হস্তে একটী বিল্ব পত্র প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ মন্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলে মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। সহসা গৃহ আবার আঁধার হইল। কৃষ্ণধন চকিতে চাহিয়া দেখিল তাহার গুরু নাই। সে কাঁদিয়া উঠিল। মন্ত্র পাইল, কিন্তু এ মন্ত্র লইয়া কি করিতে হইবে সে তো তাহার কিছুই জানে না। স্বপ্নের সকলই ফলিয়া গেল; কিন্তু এ সফলতা যে পরিশেষে বিফলতায় পরিণত হয়! এ পাওয়া তো না পাওয়ার মত সে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—ভগবান দয়াময় তুমি, যদি এত দয়াই করিলে তবে একটুকুর জন্য আর আর কাঁদাইলে কেন? আমি এ মন্ত্র লইয়া কি করিব? বলিয়া দাও ঠাকুর! ইহার জপের নিয়মাবলী তো আমি কিছুই জানি না। এ তোমার কেমন বিচার প্রভু, এত কাঁদাইয়াও কি তোমার মন উঠিল না? আমায় আরও কাঁদাইবে? কাঁদাও প্রভু, কাঁদিতে আসিয়াছি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবনের অবসান করিব।

ভূমিতে লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। এক এক বার উন্মত্তের মত দরজা খুলিয়া বাহিরে যায়; সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখে,—বৃক্ষতল, লতাবল্লরী, প্রান্তর-পথ, কোনও স্থান খুজিয়া দেখিতে বাকী রাখে না; কিন্তু কৈ তাহার গুরু? কেউ তো তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না!

বহুক্ষণ খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া সে ঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত দিন প্রাণে অশান্তি ছিল; কিন্তু আজ এই মহামন্ত্র প্রাপ্তির পর, কেমন এক মহাশক্তি ও শান্তিতে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া কৃষ্ণ ক্ষান্ত হইল। আর ঘুম হইল না; সে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া এক মহা ভাবনায় নিমগ্ন হইল। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, গুরু অন্বেষণ করা চাইই। যদি গুরুর উদ্দেশ না পাই তবে আর এ প্রাণ রাখিয়া ফল কি? যে ভাবে যাইতে বসিয়াছিল সেই ভাবেই দেহের অবসান হইবে। এতদিন নিরাশ ছিলাম, কিন্তু এখন একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে। কালই গৃহত্যাগ করিয়া গুরু অন্বেষণে বহির্গত হইব। কৃষ্ণধন মনে ইহাই স্থির সঙ্কল্প করিয়া যেন কতকটা শান্তি প্রাপ্ত হইল। আশাই মানবকে জীবিত রাখে; আশা বলিয়া যদি কোনও জিনিষ জগতে না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের যে কি দুর্দ্দশা হইত জানি না।

—0—

দশম পরিচ্ছেদ।

এ পর্য্যন্ত জীবনকুমারের কোনও পরিচয় দেই নাই। জীবনকুমার ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব; তাহাদের উপাধি মুখোপাধ্যায়। পিতা মাতা উভয়েই বর্ত্তমান। পিতার নাম রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়; তিনি কৃষ্ণনগর কোর্টে মুন্সেফী করেন। মা লক্ষ্মীর কৃপায় পশার প্রতিপত্তিও কেবল কম নয়। জীবনকুমার যে কৃষ্ণধনকে অত্যন্ত ভালবাসে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে। কৃষ্ণধনকে চিরবিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া জীবনকুমার বড়ই অস্থির হইল। কেমন করিয়া সে তাহাকে ছাড়িয়া জীবনধারণ করিবে? যাহার প্রেম-সুখ-সাগরে অবিরত সন্তরণ করিয়া সে এক মহা শান্তির রাজ্যে—মহা সুখের রাজ্যে উপনীত হইতে চলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার সুখের মিলন ছাড়িয়া সে জীবনধারণ করিবে? জীবনকুমার ভালবাসার স্নিগ্ধ জ্যোতি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রেমের পরশমণি লাভ করিতে পারে নাই। ভালবাসায় আত্মসুখ বোধ থাকে,—নিজের সদাকাঙ্ক্ষা থাকে,—প্রেমাস্পদের দর্শন স্পর্শন থাকে, কিন্তু প্রেমে তাহা থাকে না। প্রেমে নিজের স্বেচ্ছা বোধ থাকে না, প্রেমাস্পদের সুখেই সুখ, আরও ঊর্দ্ধে উঠিলে, জাগতিক মানবজাতির সুখেই সুখ,—সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিলে অনুভব হয়, জন প্রাণী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা নদনদী, পাহাড়পর্ব্বত, জগতের সকল বস্তুর সুখেই সুখ। ভালবাসায় সুখ সীমাবদ্ধ, তাই অল্প, কিন্তু প্রেমে অসীম সুখ; অনন্ত প্রস্রবণে সে সুখ মানবহৃদয়কে চিরদিনের তরে অভিষিক্ত করে। প্রেম সুখের সহস্র ধারা। ভালবাসায় মিলন হয় বাহ্যিক,—দেহে দেহে,—স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত, আর প্রেমে মিলন হয় আন্তরিক,—অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত; প্রেমের মিলন অন্তরে উপলব্ধির বিষয়। প্রেমের এই উচ্চ অঙ্গ কয় জনে লাভ করিতে পারে? জীবনকুমার কখনও পারিবে কি না জানি না।

কৃষ্ণধন জীবনকুমারের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে। জীবনকুমার বড় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভাই, আমাদের ছাড়িয়া কোথায় যাইবে?

কৃষ্ণ,—তোমাদের ছাড়িয়া কোথায় যাইব। একবার ধরিলে কি আর পরিত্যাগ করা যায়? তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে আমি মায়ায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি; বড় কথা হইল; ঠিক তা নয়। মায়া এখনও আছে, কিন্তু তার আধিপত্য নাই, ছায়া রহিয়াছে, কায়া নাই। এ ছায়া টুকুও চলিয়া যাইবে, যখন ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইব। সে সুখ-সাগরে আত্মা যখন সমাহিত হয় তখন জগতের কারও কথা মনে থাকে না; মায়ার ছায়াও তখন দূরীভূত হয়।

জীবন,—আমাদের ছাড়িবে না বলিলে, সংসার ছাড়িতেছ কেন? আমাদের সমষ্টি লইয়াই কি সংসার নয়?

কৃষ্ণ,—আমি তো কখনও সংসার ছাড়িব একথা বলি নাই। সংসারের তোমাদের সঙ্গে আমার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নয়। আজ যদি আমার দেহের অবসান হয়, তুমি কি মনে করিবে আমি তোমাদের ছাড়িয়া গেলাম? তোমার আমার ভালবাসার মধুর তন্ত্রী যদি এক হইয়া কোনও দিন একসুরে বাজিয়া থাকে, তবে জানিবে ভাই, সে তন্ত্রীর সে সুর অনন্তকাল ভরিয়া বাজিবে। মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া সে সুর ক্ষীণ হয় বটে, কিন্তু অবহিতচিত্তে, শ্রবণ করিলে, সেই বহুযোগের আরব্ধ সঙ্গীতের অস্পষ্ট করুণ তান বেশ শুনাযায়,—বেশ বোধহয় তুমি আমি কখনও একপ্রাণ ছিলাম। তাহা না হইলে, অপরিচিত কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিলে

বড় পরিচিত—বড় আপনার বলিয়া বোধহয় কেন ? ভালবাসা আত্মার আত্মার, প্রাণে প্রাণে। আত্মা অবিনশ্বর তাই ভালবাসারও কখনও ধ্বংস নাই। আমি দেহে তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে পারি, কিন্তু অন্তরে পারিব কি ?

জীবন,—তোমার স্মৃতি থাকিল, তাহাতে কি হইল ? তোমায় তো আর নাড়িতে চাড়িতে পারিব না ; তোমার এ প্রেমময় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণে তো আর শান্তি পাইব না।

কৃষ্ণ,—এই তো ভুল বুঝিলে। প্রেমাস্পদের স্মৃতিই তো আমার কাছে অধিক মধুর বলিয়া বোধ হয়। এক স্মৃতিই তো আবার আমায় আনিতে পারে। বিরহই তো মধুর,—বিচ্ছেদই তো সুখের। দর্শন স্পর্শনে আর কতক্ষণ সুখ পাওয়া যায় ! বিচ্ছেদের সুখ অনন্তকাল স্থায়ী। যদি প্রকৃত ভালবাসা পাইয়া থাক, দেখিবে বিচ্ছেদ কত সুখের। বিচ্ছেদেই ভালবাসার পরীক্ষা। বিচ্ছেদের আগুণে পুড়িয়া ভালবাসা খাঁটি হয়। খাঁটি ভালবাসা ঘনীভূত হইলে প্রেম জন্মে। পবিত্র প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক তখন প্রেমাস্পদের মূর্ত্তি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাই ভালবাসার চরমফল। বিরহই মানবকে এই সুখের অধিকারী করিয়া থাকে। দেখ দেখি ভাই, তবে বিরহ কেমন মধুর।

জীবন—বিরহ পরিণামে মধুর ফল প্রসব করিতে পারে, কিন্তু প্রথমে বড়ই যন্ত্রন দায়ক। সে যন্ত্রনা সহ করিতে পারিলে তো পরে ইহার মধুরত্ব উপলব্ধি হয়। বেশ বলিয়াছ বিরহ মানুষকে পুড়াইয়া খাঁটি করিয়া নেয়।

আচ্ছা ভাই, মানুষ দুই জনকে বা তিনজনকে সমান ভালবাসিতে পারে কি ?

কৃষ্ণ,—ভালবাসা ওজন করা বড় কঠিন ; আমি জানি ভালবাসার কমবেশ নাই। ভালবাসার স্রোত অনন্ত; যে দিকে দেও অনন্ত ভাবে প্রবাহিত হইবে। আমি এ'কে কম ভালবাসি আর, এ'কে বেশী ভালবাসি যখনই শুনিবে তখনই মনে করিবে, সে এক জনকেই প্রকৃতভাবে ভালবাসিতে পারিয়াছে, অপরকে নহে। তাই বলিতেছিলাম ভালবাসার কম বেশ নাই।

মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার বিস্তৃতি হয়। যিনি যত উন্নত তাহার ভালবাসাও তত বিস্তৃত।

জীবন,—খাঁটি ভালবাসা বুঝিবার কি কোনও উপায় নাই ? তুমি আমায় এ সব বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে আমার বড়ই উপকার হইবে। সংসারে অনেক বিপদ আপদের ভয়, যাহা বন্ধুতার পীযুষপয়ঃ বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা অনেক সময়েই ভুজঙ্গদংশন হইয়া দাঁড়ায়, সে দংশনে মরণের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তাই তোমার কাছে এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কৃষ্ণ,—ভালবাসা কোনও নিয়মের অধীন নয়, কে কোন্ দিন ইচ্ছা করিয়া নিজকে কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া অপরকে ভালবাসিতে পারিয়াছে ? ভালবাসা অজ্ঞাতসারে আসে। তবে যে ভালবাসায় তোমার ভাবী-জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিবার জন্য কতকগুলি কথা বলিয়া যাইতেছি।

কথাগুলি মনে রাখিও। ভালবাসায় অনেক সময়েই অন্ধতা আনে; প্রেমাস্পদের দোষগুলি অনেক সময়েই চক্ষে পড়ে না। ভালবাসার প্রতিদান প্রার্থী না হইয়া যদি ভালবাসিতে হয় তাহা হইলে ঐ অন্ধতায় প্রেমিকের কোনও ক্ষতি হইবে না। তুমি ভালবাসিবে জ্যোতির্ম্ময় আত্মারে, প্রেমাস্পদের দেহকে নহে। তাই প্রেমাস্পদে তদ্‌গত হইলে;—তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইলে দেহের কথা মনে থাকিবে না; তন্ময় হইতে হইবে জ্যোতিতে; তাহা হইলে আত্মার চির নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তোমাতে প্রতিফলিত হইবে। প্রেমাস্পদের চিন্তায় এইরূপে প্রাণ মন শুদ্ধ হয়। প্রেমাস্পদের ভাবনায় চিত্ত চঞ্চল হইবে না; পবিত্র প্রেম শান্ত স্থির, কামগন্ধশূন্য, ভালবাসায় [illegible] থাকিবে,—কর্ত্তব্য কার্য্য ভুল [illegible] আর হিংসা থাকিবে ন[illegible] মনে রাখিও, তাহা হ[illegible] ভালবাসার হাতে পড়িবে

জীবন,—তোমার ক[illegible] কিন্তু বলিতে কি ভাই, তোমার [illegible] কটা কথা বুঝিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণ,—কেন ?

জীবন,—তুমি বলিতেছ প্রেম [illegible] বোধ থাকিবে, কৈ, [illegible] প্রেম তো তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, বংশী [illegible] হইল, কোথায় থাকে বা গৃহকর্ম্ম [illegible] কোথায় থাকে নারীধর্ম্ম। [illegible] [illegible] তখন [illegible] যান, আর বলিয়াছ প্রেমে হিংসা থাকিবে না, এটাও শ্রীমতীতে পূর্ণভাবে বিদ্যমান, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে আসিলেই কৃষ্ণকে শ্রীরাধা নিজ কুঞ্জে প্রবেশ করিতে দিতেন না; এমন কি কৃষ্ণের মুখে চন্দ্রাবলীর নাম শুনিলে তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দিতেন। এ আবার কিরূপ ? তোমার কথার সঙ্গে তো মিলিল না।

কৃষ্ণ,—আমি বলিতেছিলাম, সংসারের জীবের ভালবাসার কথা। কিন্তু যমুনা-পুলিনের বংশীধারী বনবিহারীর মধুর মুরলী ধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুলা রাধার সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ,—সর্ব্ব কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন কেবল তাঁহাদেরই শোভা পাইয়াছে। প্রেমের উচ্চ স্তরে উঠিলে যখন মানবীয় আত্মা দেখিতে পায়, আমার সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম, সকল আশা, সকল ভরসা, সকল বাসনা, সকল কামনা, সকল সাধ্য [illegible] সাধনা, [illegible] একমাত্র "তাহাতেই" [illegible]ছি, তখন আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধের প্রয়োজন পড়ে না। তখন নির্ব্বাধ বেগে, নির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রেমিক [illegible] অভিসারে। তখন প্রেমিক [illegible] সে সুরের [illegible] সংসারে [illegible] হইল [illegible] হইবে। যাহার কর্ত্তব্যই প্রেমাস্পদের সহিত মিলন, সে প্রেমে মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য [illegible] রামচন্দ্র [illegible] করিয়াছ প্রজারঞ্জন [illegible] সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে কি তিনি সীতাকে ভালবাসিতেন না ? খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু যখন তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করেন তখন তিনি রাজা, প্রেমিক নহেন। শ্রীরাধিকা

প্রেমিকা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন; অন্য কর্ত্তব্য তিনি জানিতেন না।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি সর্ব্বদা চাহিতেন তাঁহাকে আপন হৃদয়ে পুরিয়া রাখিতে,—অন্যে তাঁহার প্রেমাস্পদকে তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যায় এটা তাঁহার অসহ্য। তাই চন্দ্রাবলী লইয়া এত গণ্ডগোল! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমার আমার ভালবাসার সূত্র দিয়া ইহাদিগের প্রেম অনুভব করা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীরাধিকার প্রেম লইয়া তর্ক করাই অন্যায়, তাঁহাদের প্রেম এত উচ্চ স্তরের যে মানুষের প্রাণ লইয়া তাহার কল্পনা করাও অসম্ভব।

জীবন,—আচ্ছা, আমার মনে সর্ব্বদাই একটা প্রশ্ন হয়, যিনি সাধু, তিনি তো ভগবানকেই ভালবাসিয়াছেন, তিনি আবার মানুষকে ভালবাসেন কেন?

কৃষ্ণ,—যিনি ভগবানকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তিনি জীবকে নিশ্চয়ই ভালবাসিবেন; অন্যথা তিনি ভগবানকে ভালবাসেন না। আমার প্রেমাস্পদের যাহা আদরের জিনিষ,—প্রাণের ধন, তাহা আমিও আমার প্রাণের মত মনে করি,—প্রাণের মত ভালবাসি। ভগবানের আদরের বিশ্ব,—প্রাণের প্রিয়জীব ভক্ত কি তাহা না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে?

জীবন,—তবে সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করেন কেন? তাঁহারা তো ভগবানকে ভালবাসেন?

কৃষ্ণ,—কে বলিল তোমায় সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করেন? বিশ্বপ্রেম লাভের জন্য যাঁহারা ব্যাকুল, তাঁহারা কি সংসার ত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহারা সংসারকে প্রাণের মত ভালবাসেন। ত্যাগই ভোগ। বড় কঠিন কথা, মনে রাখিও তাঁহাদের ত্যাগই ভোগ। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডী হইতে নিজ ভালবাসা টানিয়া লইয়া অসীম বিশ্বের ঘরে ঘরে সে ভালবাসা বিতরণ করেন। অনাথ জীবের তরে সে ভালবাসা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে। অনন্ত ধারায় সে ভালবাসা অনন্ত জীবের প্রাণ মধুময় করিয়া তোলে। তাঁহারা প্রত্যেক জীবের জন্য কাঁদিয়া থাকেন, জীবের দুঃখ শোকে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকেন। সমগ্র বিশ্ব সংসার যাঁহারা আপনার করিয়া লইয়াছেন কেমন করিয়া বলিবে ভাই, তাঁহারা ত্যাগী? তাই বলিতেছিলাম তাঁহাদের ত্যাগই ভোগ। তাঁহারা সংসারকে ত্যাগ করেন না, ভাল করিয়া হৃদয়ে জড়াইয়া ধরেন।

যাক্ সে সকল কথা, আমি আজ কাশী অভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করি। তোমার সঙ্গে হয় তো এ জীবনে আর দেখা নাও হইতে পারে। তোমাদের কত জ্বালা যন্ত্রনা দিয়াছি, ক্ষমা করিও ভাই।

জীবনকুমার কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, তোমাকে আবার ক্ষমা করিব কি, তুমি তো আমাদের কাছে কোনও অপরাধ কর নাই। আশীর্ব্বাদ কর, জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া চির দুঃখের মধ্যেও সুখের স্পর্শ অনুভব করিতে পারি।

কৃষ্ণ বিদায় হইল; যতদূর দেখিতে

পাইল, জীবনকুমার কৃষ্ণধনের দিকে চাহিয়া রহিল।—আর কিছুই দেখা যায় না,—একটী পরিচিত কণ্ঠ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া গেল,—'যাই তবে যাই, ভাই বলে ভাই, দেখো যেন মনে থাকে'। ক্রমশঃ।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—:০:—

৺যদুনাথ দে মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষে রচিত।

(১)

উদ্‌যাপিয়া জীবনের কার্য্য যাহা ছিল
চলিয়া পড়েছ এবে বিশ্রান্তির কোলে;
শান্তিময় হোক তব নূতন জীবন
শান্তির রাজ্যেতে সেথা আনন্দ হিল্লোলে।

(২)

জীবন-সংগ্রাম তব বড়ই কঠোর,
বড়ই কষ্টেতে তুমি বুঝিয়াছ তা'য়;
তুল্যানন্দ লভ' তুমি যথায় এখন
বসিয়া নিশ্চিন্তে কল্প-পাদপের ছা'য়।

(৩)

যদিও কঠোর তব কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল,
পিপাসায় জল দিতে ছিল একজন;
দারুণ যন্ত্রনা হেরি' সস্নেহে তোমায়,
আশ্বাসিয়া করি দিত শক্তি সঞ্চারণ।

(৪)

অকপট। বাল্য-বন্ধু তুমি যাঁর ছিলে,
কত ভালবেসেছিলে জীবনে যৌবনে;
নির্ঘাত সরস প্রাণ দুইটী কোরক
এক বৃন্তে ফুটি'বে ভেবেছিলে মনে।

(৫)

কালের কঠোর দাপে নিরাশ-ঝঞ্ঝায়
শুকায়ে শুকায়ে তুমি পড়িয়াছ খসে;
তোমায় নলিন হের ফুটিয়াছে আজি
দিগন্ত করিয়া ব্যাপ্ত সুনির্ম্মল যশে।

(৬)

সে বাল্যের প্রেম-স্মৃতি অন্তরে জাগায়ে
রাখিয়াছে বন্ধু তব চিরদিন তরে,
শোধিতে তোমার ঋণ সতত ব্যাকুল
আঁকিয়া তোমার স্মৃতি হৃদয়-কন্দরে।

(৭)

ধন্য তুমি! ধন্য বন্ধু লভেছিলে ভবে,
নিশ্চয় তাঁহার কৃপা লভিবে এখন,
না জানি কি ভাবে তুমি রয়েছ সেথায়,
দুঃখ যদি পাও—তাঁরে করিও স্মরণ।

(৮)

রোগে ক্লিষ্ট ক্ষীণ প্রাণ তোমায় হেথায়
পেয়েছিনু দেখিবারে শেষের ক'দিন;
তোমার সেবায় ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগিয়া
বিমল আনন্দ লাভ করেছে এ দীন

(৯)

জন্ম-মৃত্যু জগতের নিত্য লীলা-ভূমি,
অজর অমর আত্মা লিপ্ত নহে কভু;
হউক তোমার আত্মা তাঁহাতে বিলীন
যিনি পরমাত্মারূপে জগতের প্রভু!

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—:০:—

সুখ-তত্ত্ব।*

(২)

তদনন্তর জড়-জগৎ হইতে ক্রমশঃ চেতন-জগৎ বা উন্নত রাজ্যের দিকে অগ্রসর' হইতে হইতে আমরা কি দেখিতে পাই ? দেখিতে জড় রাজ্য পাই,—জড়রাজ্য অপেক্ষা চেতন-অপেক্ষা চেতন রাজ্যের প্রত্যেক স্তরে স্তরে প্রকৃতি রাজ্যে আনন্দের -মাতার স্বকীয় নিবিড় অন্ধকার ক্রমো-বিকাশ। বসনের মধ্য দিয়া আনন্দের সুমধুর হাসি যেন ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রকৃতি মাতা পুরাতন জীর্ণ তমো বসন পরিত্যাগ অতিক্রম করতঃ—শনৈঃ শনৈঃ রজঃ-সত্ত্বের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছেন; তমোময় আবরণও ততই ক্ষীণ হইয়া যাই-তেছে। কেন না আলোকের প্রভায় স্বভা-বতঃই অন্ধকার অবিলম্বে সুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে। মধুর বসন্তে—প্রফুল্লিত কুসুম-উদ্ভিজ্জ রাজ্যে রাশির মধুর হাসি, মধু ও আনন্দ লীলায় মাধবীর প্রকৃতি সহ বিলাস, বিকাশ লক্ষণ। প্রকৃতি মাতার অনুপম রম-ণীয় বসন-পরিধান এই সকল কি উদ্ভিদ-জগ-তের ও ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রকৃতি রাজ্যে আনন্দের ক্রমো-বিকাশ আত্মা স্বরূপে অনুমিত হয় না ? সাধারণ ভাবের প্রাণে এবং সাধারণ চক্ষুতে এই সকল দৃষ্ট হয় না বটে; কিন্তু ভাবুক কবি অবশ্যই ভাবের প্রাণে প্রাকৃতিক ক্রমো-বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন। দার্শনিকনেত্রে জগতের এই বয়ঃ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য লাভের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে, অবশ্যই দর্শকের হৃদয়-আনন্দ-সিন্ধু উদ্বেলিত হইবে, জগৎ নন্দন-কাননে পরিণত হইবে, সংসার-মরুভূমিতেও আকুল পিপাসার শান্তি হইবে; সন্দেহ নাই। আবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃতির আরও একটু স্বেদজ রাজ্যে উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া দেখ। আনন্দের ক্রমো- যাউক, তথায় কিরূপ ভাবে বিকাশ। আনন্দের লীলা হইতেছে। পাঠক ! ঐ দেখুন, উদ্‌গ্রীব হইয়া ভাব-নেত্রের সহায়তায় প্রকৃতি-মাতার আরও একটু উচ্চ স্তরে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অবলোকন করুন, ভূচর ও খেচর-গণের পারস্পরিক সৌহার্দ্দ, এক পক্ষীর সহিত অন্য পক্ষীর প্রেমভাব, অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ,—স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও শাবকের জীবন রক্ষণ, নির্ব্বাক প্রেমবিলাস, পশু-সুলভ প্রেমের পরিচয় প্রদান এই সকল উক্ত আনন্দ সত্তারই ক্ষীণ ব্যঞ্জনা রূপে আপনার প্রাণে প্রভাব বিস্তার করিতেছে না কি ?

এইরূপে প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ সত্তারও ক্রমো-বিকাশ হইয়া থাকে; প্রকৃতির যতই তম আবরণ উন্মোচন হইতে থাকে, ততই রজঃসত্ত্ব-সৌদামিনীর শুভ্র বিকাশে আনন্দের বিমল প্রতিভা প্রকাশিত জরায়ুজের মনুষ্য হইয়া থাকে। তদনন্তর মনুষ্য পিণ্ডে আনন্দের যোনিতে প্রবেশ করিয়া আনন্দ বিকাশ লক্ষণ। সত্তার দিব্য আলোক প্রক-টিত হয়। বেদ ও দর্শন অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্বে যে, পঞ্চকোষের ক্রমো-বিকাশ অর্থাৎ উদ্ভিজ্জে 'অন্নময়' কোষের বিকাশ,- স্বেদজে 'অন্নময়' ও

* পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

স্বেদজে প্রাণময় কোষের বিকাশ, অণ্ডজে শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ- অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের বিকাশ। কোষের বিকাশ, এবং জরায়ুজের মনুষ্যেতর জীব-রাজ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটীর সহিত বিজ্ঞান-ময় কোষের বিকাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে সৃষ্টিজাত পদার্থকে উন্নত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কেবল মনুষ্যের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি চারিটী কোষের সহিত 'আনন্দময়' কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মানবের মুখেই সুস্পষ্ট হাসির দীর্ঘরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ ব্যতীত অন্য জীব স্পষ্টভাবে হাসিতে পারে না,—হাসির দ্বারা হৃদয়ের অন্তঃস্থল-স্থিত আনন্দ সত্তার বিকাশ করিতে পারে না। মানুষের এই স্পষ্ট হাসিই মানুষের মধ্যে আনন্দময় কোষ বিকাশের পরিচায়ক। এইরূপে মানুষ যতই উন্নত হয়,—ধর্ম্মধ্বজা অবলম্বন করতঃ প্রকৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করে, ততই তাহার আনন্দ সত্তা ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। যতই সে ধর্ম্মের সাহায্যে প্রকৃতির ঊর্দ্ধ-গামী স্রোতের আনুকূল্যে পূর্ণ মানব হইতে থাকে, ততই তিনি সচ্চিদানন্দময়ের পূর্ণ-ভাবে প্রকটিত হ'ন। ক্রমে ক্রমে তিনি পূর্ণতার অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইয়া 'পূর্ণ' রূপেই অবশিষ্ট থাকেন;—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ॥

এই পূর্ণতার চরমে যখন সেই সাধক প্রকৃতি রাজ্যের অতীত, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীর অপগমে নির্ব্বিকল্প সমাধি পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন, তখন তাঁহার তমোময় আবরণের সম্যক অভাব হেতু আনন্দ সত্তার বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিপদস্থিত সাধকের যেই প্রকার আনন্দ-প্রাপ্তি হয়, সেই আনন্দ মৌন-ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রকটিত হইবার যোগ্য, উহাকে প্রকাশ করিতে পারে এমন বাক্য-বিন্যাস নাই, মানবিক কল্পনাসুন্দরীও তথায় স্বকীয়া লীলা বিস্তার করিতে পারেন না। সেখানে কেবল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিরাজ করেন, ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়রূপী ত্রিপুটী তথায় স্থান পায় না, সেখানে যে মাত্র শুদ্ধ অদ্বৈত; সুতরাং তথায় কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে ধ্যানমার্গে ধ্যান করিবে?—

"যত্র হি দ্বৈতমেব ভবতি, তত্র চাক্ষদিব স্যাৎ।
তত্র তত্রান্যোহন্যৎ পশ্যেদন্যোহন্যদ্বিজানীয়াৎ;
যত্র ত্বস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূৎ, তত্তত্র কেন কং
পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" ?

সেই পূর্ণতায়, সেই অখণ্ড অদ্বৈত ভাবে, সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি পদে, সেই বিশ্ব প্রেমের অন্তিম সীমায় যে আনন্দ হইয়া থাকে, তাহারই বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রুতি-শাস্ত্রে ব্রহ্মানন্দের বিশেষত্ব বিনীত স্বরে উক্ত হইয়াছে;

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ॥

অর্থাৎ সেই স্থানের সমীপ পর্য্যন্ত যাইয়া বাক্যজাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মনের কল্পনা শক্তি যেখানে স্থান পায় না, সেই অবাংমনসোগোচর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পদ প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইতে পারিলে তাহার আর কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকে না। এই ব্রহ্মানন্দই অতুলনীয় নিরবচ্ছিন্ন সুখ; এই ভূমাসুখ বর্ণনা করাযাইতে পারে, ভাষা-জগতের এমন শক্তি নাই। নির্ব্বিকল্প

সমাধিশুদ্ধ পবিত্র অন্তঃকরণেই উহার কথঞ্চিৎ আভাসের অনুভব হইতে পারে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"সমাধি-নির্দ্ধূত-মলস্য চেতসো,
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা,
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে"।

এইরূপে গীতোপনিষদেও পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ নির্ব্বিকল্প সমাধিলভ্য ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ কথন প্রসঙ্গে অন্য কোনরূপ ভাষা না পাইয়া বলিয়াছেনঃ—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকন্ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
গীতা, ৬ষ্ঠ অঃ, ২১—২২—শ্লোঃ

অর্থাৎ যে অবস্থায় যোগী সেই অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অতীত, (কেবল শুদ্ধ) বুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্যসুখ অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হ'ন না, তাহাই ব্রহ্মানন্দ পদ। এবং সেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলে উক্ত সাধক অপর কোন লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং ঐ অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখেও অভিভূত হন্ না। এই আত্মানন্দই নিরতিশয় সুখকর। স্থানান্তরে পুনরায় ভগবান্ আপন বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেনঃ—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"।

অর্থাৎ "যেই পদ চন্দ্র সূর্য্য বা অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারেন না, ভূমাসুখই নিরতিশয় যেই পদে অধিষ্ঠিত হইলে আনন্দপ্রদ। পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম—পরম স্বরূপ"। ভগবানের ঐ পরম ধামই ব্রহ্মানন্দ পদ, উহাই নির্ব্বিকল্প সমাধিপদস্থিত রাজযোগীর অধিবাসস্থান। ঐ অবাংমনসোগোচর, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত প্রকৃতি পারাবারপারস্থিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলেই মানব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে আনন পূর্ণতা লাভ করিতে পারিলেই জীব আবামানবের পূর্ণতার গমন চক্রের তীব্র নিষ্পেষণ সীমা ও তাহার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ফল। নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ- ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই ইহা কথিত হইয়াছে যে, এই আনন্দ সত্তা সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি ভাবে সত্ত্ব, রজ এবং তম এই গুণত্রয়ের বিকাশ তারতম্য হেতুই আনন্দ সত্তার বিকাশেরও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যষ্টি প্রকৃতিতে রজস্তমোমল অপসৃত হইয়া সত্ত্ব বিকাশের সঙ্গে সত্ত্বগুণের পূর্ণতা সঙ্গে আনন্দের অভিব্যক্তি এবং লীনতাই ভগ- এবং সত্ত্বের পূর্ণতা ও পরিশেষে বদ্ভাবের পূর্ণতা। লীনতার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরূপ ভগবদ্ ভাবেরও পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রকান্ত সাঙ্খ্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।
ভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডল।

—:০:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

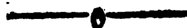
ঢাকা—বরঙ্গাইল হরিসভা—বিগত ১১ই পৌষ হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত অত্রত্য হরিসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন যথারিতী ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে নগর কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপূজা সম্পন্ন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করেন, তদনন্তর পাবনা দর্পণ টোলের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ও কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাণস্পর্শী ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তন করেন। ১২ই তারিখেও পূর্ব্ব দিনের মত পূজা কীর্ত্তন ও ভগবৎ পাঠ হইয়াছিল;—ঐ দিন নাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি সরল ও সহজ ভাষায় সুন্দর ব্যাখ্যা-করতঃ ভাগবৎ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৩ই তারিখে অহোরাত্র কীর্ত্তন ও সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণের সেবা পূজা করতঃ মহোৎসব সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

১৪ই তারিখে জলকেলি ও কীর্ত্তন করত উৎসব ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল। স্থানীয় লোক ব্যতীত অন্যান্য স্থানের বহু গণ্য মান্য ভদ্রমহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করতঃ উৎসবের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অনুষ্ঠাতাগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমিল্লার ভক্ত শ্রীযুক্ত অম্বিকাবাবু ও শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহের কীর্ত্তন ও ভাবাবেশ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সর্ব্বসাধারণের মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

আমরা দেশের এহেন দুর্দ্দিনে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণগণের এরূপ সেবা পূজার বহুল অনুষ্ঠান কামনা করি। ভগবান অনুষ্ঠাতা ও উৎসাহদাতাগণের মঙ্গল বিধান করুন।



শুভসংবাদ। আমাদিগের পাঠকগণ অবগত আছেন, পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ গত অগ্রহায়ণ মাসে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকাশীধামের ভক্তগণের অনুরোধে তিনি কিছুকাল কাশীধামে অবস্থিতি করিতে সম্মত হইয়াছেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের প্লীডার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ উকিল বাবু সাহেবের বাগান বাড়ীতে তাঁহার আসননির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ সংবাদ আমাদিগের পক্ষে কঠোর হইলেও বাঙ্গালী ভক্তগণের পক্ষে শুভসংবাদ সন্দেহ নাই। কারণ চট্টগ্রাম বিভাগ ব্যতীত বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতে এই আশ্রম অপেক্ষা কাশীতে অল্প সময়ে ও খরচে যাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তীর্থরাজ বারানসীধাম দর্শন অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। তাই আনন্দের সহিত আমরা এ শুভসংবাদ ঘোষণা করিলাম।



ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

সুখ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

উক্ত বিচারের উপর প্রণিধান করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, প্রকৃতির উচ্চাবচ প্রকৃতির উচ্চাবচ স্তরভেদ স্তরভেদ অনুসারে অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ এবং ঊর্দ্ধ এবং অধঃ—অধঃলোকেও আনন্দ সত্তার লোকেও আনন্দ বিকাশ তারতম্য নিশ্চয় হইবে। বিকাশের তার- তম্য থাকে।

এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, এক নয়, দুই নয়, সহস্র সহস্র, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে। এই জন্যই ত্রিপাদ ব্রহ্মাণ্ডেরঅনন্ততার বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদে প্রতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ। কথিত হইয়াছে যে," অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্তাৎ স্থিতান্যেতানি এতাদৃশান্যনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি; তত্র চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-ষড়মুখ-সপ্তমু- খাষ্টমুখাদি সংখ্যাক্রমেন সহস্রাবধি মুখান্তৈ নারায়ণাংশৈ রজোগুণ-প্রধানৈ রেকৈক সৃষ্টি-কর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি, বিষ্ণু-মহেশ্বরাখ্যৈ নারায়ণাংশৈ রেকৈক স্থিতি সংহার কর্ত্তৃভি রধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘ মৎস্য বুদ্বুদানন্ত সঙ্ঘবদ্ ভ্রমন্তি"। এতদ্ব্যতীত ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন"।

অর্থাৎ আমাদের নয়ন পথবর্ত্তী চিত্ত-বিমোহন ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য। অনন্ত কোটী সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছে। ইহা তো আধুনিক বিজ্ঞান কল্পনায়ও আনিতে পারে না—বিজ্ঞান দৃশ্যপদার্থেরই বিধান নির্দ্দেশ করিতে পারে মাত্র) সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ প্রধান নারায়ণাংশ চতুর্ম্মুখ হইতে সহস্রমুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র

অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমুদ্রে মৎস্য ও বুদ্‌বুদাদির ন্যায় বিচরণ করিতেছে। বরং ধূলিকণার গণনা হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কদাপি করা যাইতে পারে না—সংখ্যা নাই"।

বিরাট পুরুষ। পরমাত্মার আধিভৌতিক স্বরূপ কার্য্য-ব্রহ্ম বা বিরাট; এই বিরাট সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ সহস্রশীর্ষ; সহস্রবাহু সমন্বিত জানিবেন। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে;—

"স এব পুরুষ স্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বাঙ্ঘ্রি-বাহ্বক্ষ সহস্রাননশীর্ষবান্"।

এই সহস্রানন, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ [illegible] পুরুষকেই পুরাণাদিতে, সত্ত্ব ও তমঃ, পুণ্য ও পাপ, প্রকাশ ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ, ব্যাস ও পরিধি, এবং নিম্ন ও উচ্চ ভেদে চতুর্দ্দশ ভুবন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"অস্যৈবাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ"

মনীষিগণ এই কার্য্যব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষেরই নাভিদেশের উপরিভাগে সপ্ত ঊর্দ্ধ-লোক, (যাহা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ আদি রূপে উক্ত হয়) এবং নাভিদেশের নিম্নভাগে সপ্ত অধোলোক (যাহা অতল বিতল আদি-রূপে কথিত হয়) কল্পনা করিয়া থাকেন। এখন দেখিতে হইবে শাস্ত্রে ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনকে কোন কোন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ ভুবন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,—

"ভূ র্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ মহশ্চৈব জনস্তথা
তপশ্চ সত্য মিত্যেবং লোকাঃ সপ্তোপরিস্থিতাঃ॥
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ বিপ্রেন্দ্র ততোঽধস্তাৎ রসাতলম্॥
পাতালঞ্চেতি সপ্তৈতি পাতালানি ক্রমাদধঃ"।

৩য় অঃ, ৩১ শ্লোঃ

অর্থাৎ হে বিপ্রেন্দ্র ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ এবং সত্য এই সপ্তলোক ক্রমে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে অবস্থিত, এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল লোক ক্রমে অধস্তলে অবস্থিত থাকিয়া বিরাট রূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই স্থলে বোধহয় ঐ সপ্ত ঊর্দ্ধ ও অধোলোক সমূহের মধ্যে কোন্‌টী বিরাটপুরুষের কোন অঙ্গ হইতে [illegible] হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় —

বিরাট পুরুষের [illegible] কট্যাদিভিরধঃসপ্তঃ সপ্তোর্দ্ধং জঘনা-বিভিন্ন অঙ্গ [illegible] [illegible]।

লোকের [illegible] ভূর্লোকঃ [illegible] নাভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য [illegible]।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ।

ঊর্দ্ধ সপ্তলোক। গ্রীবায়াং [illegible] কাহস্ত তপোলোকস্ [illegible]
[illegible] সত্যলোকস্তু ব্রহ্মা[illegible] [illegible]

অধো দিকে সপ্তলোক। তৎকট্যাঞ্চাতলং ক্লিপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যান্তু তলাতলম্॥
মহাতলন্তু গুল্‌ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ স্বরাট্"॥*

* সংস্কৃত ভাষার সরলতা ও প্রবন্ধের বৃথা বিস্তৃতি ভয়ে অনুবাদ দেওয়া হইল না। (লেখক)

এই যে বিরাট্ পুরুষের দেহস্থিত চতুর্দ্দশ ভুবন, তৎসমুদয়ে লোকের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সত্তা অবিসম্বাদী।

এখন দেখিতে হইবে, এই যে, লোক সমূহের উর্দ্ধে, ও অধোদিকে ত্রিবিধ গুণ বিকাশ অবস্থিতি ইহার কারণ কি? তারতম্যই একরূপ সমদর্শী, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবান উচ্চ নিম্নভেদের নারায়ণের রাজ্যে উচ্চ নিম্ন কারণ। ভেদ কেন? বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল লোক ত্রিগুণময় প্রাকৃতিকরাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় তৎ সমুদয়ের উর্দ্ধ বা অধঃস্থিত, সত্ত্ব বা তমোগুণের বিকাশতারতম্য অনুসারেই হইয়াছে। এবং এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থিত থাকিয়া ইহাও তত্তৎ লোকপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে জীবগণও তত্তৎ গুণ যে, যে সকল জীবের উক্তে গুণ সম্পন্ন হইবে এবং লোক সমূহে গতি হইবে, তদনুসারে ভোগও তাহাদের প্রাক্তন সংস্কারও অনিবার্য্য। ঐরূপ সাত্বিক ও তামসিক ভাবাপন্ন হইবে। এবং ঐ সংস্কার অনুসারেই উহারা যথাযোগ্য ভোজন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি যেই লোক লাভ করিবেন, সেই রূপই সুখ দুঃখ ভোগ করিবেন। প্রকৃতি যতই উর্দ্ধগামিনী হন,—প্রকৃতির স্তরে স্তরে যতই সূক্ষ্মতা হইতে যায়, ততই ব্যাপক আনন্দরূপ পরমাত্মার বিকাশও অধিক হইতে অধিকতর—অধিকতম ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার প্রকৃতিমাতার যতই নিম্ন স্তরের প্রতি যাইবেন, ততই দেখিতে পাইবেন, ক্রমে ক্রমে গাঢ় তমিস্রা—দুঃখের ভীষণ তাড়না। প্রকৃতির এই অঙ্গই—এই দুঃখময় অঙ্গই—এই নিবিড় অন্ধকারভরা প্রকোষ্ঠই আর্য্য-শাস্ত্রে নরক বলিয়া বর্ণিত; প্রকৃতির অতি ইহা প্রকৃতির অতি নিম্নতর নিম্নতর বা শাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোর তমোময়, এই 'নরক' জন্যই সেখানে আনন্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন, রজঃসত্ত্ব সৌদামিনী তথায় আপন লীলা বিস্তার করে না। কেবল সেখানে তমো বারিদমালাই সর্ব্বদা চন্দ্রাতপ রূপে বিরাজ করিতেছে। এই জন্যই নারকীয় জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া থাকে। প্রকৃতির অতি নিম্নতর নরকে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, কি ভীষণ যমদূত তাড়না,—তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কিরূপে বুঝিতে পারিবে? বুঝিতে পারা দূরে থাকুক, অনুভব অনুমান করিতেও বিশ্বব্যাপক মনঃশক্তি হীনশক্তি হইয়া পড়ে। পাঠকগণ! অপেক্ষা করুন, প্রসঙ্গ ও অবকাশমতে যথাশক্তি বিভিন্ন নরক চিত্র অঙ্কিত করিব। তবে সম্প্রতি অতি সংক্ষেপে ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপ ভাবে নারকীয় দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করতঃ কথঞ্চিৎ দুঃখের আভাস দিয়া আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিব।

পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

তপ্তাগ্নিনা প্রতীব্রেন তাপিতাঙ্গার ভূমিনা।
তন্মধ্যে পাপ-কর্ম্মানং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ॥
স দহ্যমান তীব্রেন বহ্নিনা পরিধাবতি।
পদে পদে চ পাদোহস্য জ্বলতে শীর্য্যতে পুনঃ॥
অটীষহেম্বু বধ্নাস্য বদ্ধা তোয়োটীযথা।

শাস্ত্রীয় প্রমাণে জানা যায় মানবা রক্ত মুদ্গীরন্তঃ পুনঃ পুনঃ নরক ভুঞ্জনা। অধোমুখ বিনিক্ষিপ্তে [illegible] বদ্ধস্থিতিঃ॥

দুঃখানি প্রাপ্নুবন্তীহ যান্যসহ্যানি মানবাঃ।

দহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগলা ধরণীঘ্নেন বহ্নিনা ॥
হা মাত র্ভ্রাতস্তাতেতি ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।

অর্থাৎ পাপিগণ কোথায়ও ভীষণ জাজ্বল্যমান অনলে দহ্যমান, কোথায়ও কুলাল চক্র বা ঘটীযন্ত্রের ভীম ঘূর্ণনে ঘূর্ণায়মান,—নিম্ন-দিকে মস্তক ও উর্দ্ধদিকে পাদ বিলম্বিত-অবস্থায় কোথায়ও রক্ত বমন, ইত্যাদি অসহনীয় যন্ত্রণারাশি ভোগ করিতে করিতে হা মাতঃ! হা তাতঃ! হা ভ্রাতঃ! রূপে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া থাকে'।

এইত গেল প্রকৃতির নিম্নস্তর নরকের দুঃখ—প্রকৃতির নিম্নগামী প্রবাহের আয়স্বরূপাভাস। আবার যাহা প্রকৃতির উচ্চস্তরে স্থিত তাহাতে সূক্ষ্মতত্ত্বের আধিক্য স্বর্গ বা প্রকৃতির ও সত্ত্ববিলাসের আধিক্য থাকায় উচ্চ অঙ্গ। তাহা আনন্দ বিলাস-বহুল বা সুখ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

এই প্রকৃতির উচ্চস্তরকেই সুখবহুল বলিয়া 'স্বর্গ' বা 'নাক' বলা হইয়া থাকে। তথায় তমোময় বারিদমালা রজঃসত্ত্ব সৌদামিনীর তীব্র আলোকে একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং অন্ধকার জন্য দুঃখরাশিও তথা হইতে বিদায় লইয়াছে। এই নিমিত্তই স্বর্গাদি লোক সমূহ সুখদায়ক রূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই সুখের জন্যও সকলে লালায়িত। যে সকল লোক সত্ত্বপ্রধান; তমোগুণের আবরণ যেখানে নাই, সে সমস্ত লোক অবশ্যই সুখপ্রধান হইবে সন্দেহ নাই। শ্রুতি গাহিয়াছেন।—

শাস্ত্রীয় প্রমাণে স্বর্গসুখ।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসং,
সূর্য্যস্য রশ্মিভি র্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচ মভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্যঃ,
এষ ব পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, যেখানে দীপ্তিমতী আহুতিগণ সকাম সাধককে মধুর সম্ভাষণে অপ্যায়িত করতঃ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা লইয়া যাইয়া অর্চনাপূর্ব্বক অবস্থিত করায়, সেই আপনাদের সুরম্য ব্রহ্মলোক। তমোময় প্রাকৃতিক আবরণ তথায় অতি অল্প বিধায় সুখের মাত্রা অধিক। গীতোপনিষদেও শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উন্নত স্তর স্বর্গ রাজ্যের কথা এইরূপ ভাবে বলিতেছেন যে:—

"তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান"।

অর্থাৎ সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মানব পুণ্য সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য দিব্যভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং সুরেন্দ্রলোকেও প্রাকৃতিক সাত্ত্বিকতা হেতু সুখের আভাস পাওয়া যায়। এইরূপে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে—

"সসুখঃ পবনঃস্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা।
ক্ষুৎ-পিপাসা-শ্রমোনাস্তি ন জরা ন চ পাতকম্"

স্বর্গের মারুত সুখবাহী ও সুগন্ধি। হী তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও সুকৃত দুষ্কৃতি নাই"। অতএব সুখেরই বিলাস বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত "আসাম সোম অমৃতা অভূম" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, যতই প্রকৃতির তম আবরণ ক্ষীণ হইতে চলে, ততই সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ জন্য আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে।

এই ত গেল স্মৃতির কথা; এখন শ্রুতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এতদপেক্ষায়ও স্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোক সমূহের বিভিন্ন

প্রকারের সুখানুভূতি বর্ণিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঊর্দ্ধ অধাবস্থিতিভেদে লোক সমূহের মধ্যে আনন্দানুভূতিরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই কথাই বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেনঃ—

"স যো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি, অন্যেষামধিপতিঃ; স বৈ মানুষ্যৈক ভোগৈঃ সম্পন্নতম মনুষ্যানাং পরমানন্দোহথ, যে শতং মনুষ্যানামানন্দাঃ স এক পিতৃণাং জিতলোকানাং আনন্দোহথ; যে শতং পিতৃনাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোহথ; যে শতং গন্ধর্ব্ব লোকানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানমানন্দঃ, যে কর্ম্মনা দেবত্বমভি সম্পাদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজ্ঞানদেবানামানন্দঃ, যশ্চ শ্রোত্রিয়ো বৃজিনোহ কামহতোহথ; যে শত মাজ্ঞান দেবানামানন্দাঃ, স এক প্রজাপতি লোকানামানন্দ; যশ্চা শ্রোত্রিয়েহ বৃজিনোহ কামহতোহথ; যে শতং প্রজাপতি লোকানামানন্দাঃ, স একো ব্রহ্ম-লোক-আনন্দঃ" ।*।

প্রকৃতির তম আবরণের হ্রাস-বৃদ্ধি জন্য লোক সমূহের ঊর্দ্ধ ও অধাবস্থিতি ভেদে সুখানুভূতির তারতম্য।

অর্থাৎ মনুষ্যলোকে যে নরপতি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও সমস্ত ভোগ্যবস্তুযুক্ত, তিনি ইহলৌকিক ভোগজনিত সম্যক আনন্দ লাভ করেন। এই ঐহিক সুখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ পিতৃ-লোক-প্রাপ্ত জীবগণ ভোগ করিয়া থাকেন। পিতৃলোক-বাসিগণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক গন্ধর্ব্বলোকবাসিগণ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ গন্ধর্ব্ব-লোক অপেক্ষা কর্ম্ম-দেবলোকে শতগুণ অধিক আনন্দ এবং কর্ম্ম-দেবলোক অপেক্ষা আজ্ঞান দেবলোকে শতগুণ অধিক আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, অকামহত পুরুষ স্বকীয় সাধন বলে প্রজাপতি-লোক প্রাপ্ত হন, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লোক অপেক্ষায়ও সমধিক আনন্দ অনুভব করেন। আবার এই প্রজাপতি লোক অপেক্ষায়ও শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মলোকবাসিগণ অনুভব করিয়া থাকেন"। উক্ত বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যতই জীব ঊর্দ্ধগামী প্রকৃতি-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর ও ঊর্দ্ধতম প্রকৃতি স্তরে উপস্থিত হইবে; প্রকৃতির দুঃখময়-অন্ধকারভরা তম-আবরণ ক্ষীণ হওয়ায় ততই অধিক অধিকতর ও অধিকতম আনন্দ লাভ করিতে থাকিবে। গুণত্রয়ের ভেদ বা বিকাশ-তারতম্য অনুসারেই আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। ইহাই সাংসারিক সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষানুভূতি। তাই সংসার-মায়াবদ্ধ আমিও আত্ম ভূমিকারূপে এই পর্য্যন্ত আসিয়া 'ইতি' দিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দীন-পরিব্রাজক

শ্রীচন্দ্রকান্ত সাংখ্যতীর্থ,
বিদ্যাভূষণ;
মহোপদেশক, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

* বৃহদারণ্যকোপনিষদ।

—0—

আগমনী।

(জন্ম-ভূমি দর্শনান্তর শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনোপলক্ষে রচিত)

(১)

এস নাথ! জুড়ে বস হৃদয় মন্দির;
সুপ্রভাত আজি তাই,
তব আগমন চাই,
তোমা বিনা অন্ধকার আছে এ কুটীর।
এস নাথ! জুড়ে ব'স হৃদয়-মন্দির।

(২)

(আজি) আসিবে বলিয়া মোরা হয়েছি অধীর,
সাজায়ে বরণ ডালা,
গেঁথেছি ফুলের মালা,
বরিতে তোমায় আছে নয়নের নীর;
এস নাথ জুড়ে বস হৃদয়মন্দির।

(৩)

তোমার আশ্বাস পেয়ে হয়েছি বাহির,
কখন হতাশ প্রাণে
চেয়ে রহি পথ পানে;
নিরাশায় ক্ষণে ক্ষণে হই যে অধীর।
এস নাথ! জুড়ে ব'স হৃদয় মন্দির।

(৪)

তোমা' বিনা শূন্য পড়ি রয়েছে হৃদয়,
তব শুভ-সম্মিলন,
যাচি মোরা অনুক্ষণ,
শ্রীচরণ হেরি প্রাণে কত সুখ পাই;
আকুল পরাণ লয়ে রহিয়াছি তাই।

(৫)

নূতন কি দিব বল আজিগো তোমায়?
যা' ছিল মোদের বলি
দিয়াছি চরণে ডালি;
তবুও পরাণ কেন কত কিছু চায়
পুনঃ ঢালি দিতে তব রাঙ্গা দু'টী পায়।

(৬)

ভক্তি পুষ্পে-গাঁথি হার নানা উপচারে,
সমর্পিয়া মন প্রাণ
গা'ব আগমনী গান,
আগুলিয়া ল'ব তোমা হৃদয়-মন্দিরে,
অশ্রু-বলি দিয়া সদা পূজিব তোমারে।

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—:০:—

দোললীলা।

মধুমাসে মাধবীর ফুল ফুটিয়াছে। মাধবী সহকার-শিরে পল্লবিত বাহুলতা বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চারিধারে সৌরভ রাশি ছড়াইতেছে! বকুল শিরে গাছভরা মুকুলমালাও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অশোক চম্পক, নাগকেশর প্রভৃতি বাসন্তী-কুসুমের সৌন্দর্য্য ও মধুগন্ধ চারিদিক শোভিত ও আমোদিত করিয়াছে। সেই গন্ধে বিভোর হইয়া মধুকর-নিকর গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে,—ঝাঁকে ঝাঁকে মাধবীলতায়, বকুল শিরে

অশোক কলিকায়, পুন্নাগ ফুলে আসিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে মধুচক্রে যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মলয়-পবন মৃদুমন্দ সঞ্চারিত হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ কুসুম সৌরভ বিলাইতেছে। চারিদিকে কেবল সৌন্দর্য্য আর শোভা।

মধুমাসের মধুর পূর্ণিমাতে হিন্দুগণ বসন্তোৎসব করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের দোললীলায় মাতিয়াছেন। একদা ভগবান্ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া এই দিনে গোপিগণ সঙ্গে দোললীলা করিয়া ভক্তহৃদয়ে বাসন্তী-পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাই ভক্ত প্রতি বাসন্তী পূর্ণিমাতে আত্মহৃদয়ে দোললীলা প্রকট করিয়া থাকেন। আর তাহারই বাহ্যবিকাশ হিন্দুর দোলোৎসব।

ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার বাসনা করিলে, সগুণ হইলেন,—সেই গুণময় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনা বা পরা প্রকৃতি শ্রীরাধা। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ও অপরা প্রকৃতি হইতে সমস্ত জগতের ক্রম বিকাশ ভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ যখন সগুণ হইয়াছিলেন,—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার ভোগ ইচ্ছা হইয়াছিল,—সেই ইচ্ছাই আনন্দ! কেন না তিনি আনন্দময়। যাহা সৌরভিত, তাহার স্পৃষ্ট বায়ুও সুগন্ধ। অতএব তাঁহাদের নিত্যভাব, আনন্দ-শৃঙ্গার। জীবকে সেই আনন্দ প্রদান করিতেই রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলাগুলি সাধক—ভক্ত হৃদয়ের এক একটী মহাভাবের বাহ্যবিকাশাবস্থা মাত্র।

অনাদিকাল হইতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতে আসক্ত। রাধাকৃষ্ণের কি গভীর ও স্থায়ী প্রণয় তাঁহাদের এ প্রেম অতুল্য নিত্য ও অপ্রমেয়। এই প্রেম দেবতার ঋষি-প্রদত্ত নাম মদন, আর তাঁহাদের অনুরাগ বা আসক্তির নাম—রতি। "মাদনান্মদনাথস্তুং" অর্থাৎ—যিনি জগৎ সমুদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তিনিই মদন আর "রতির্মনোহনুকূলেহর্থে মনসঃ প্রবণায়িতং" অর্থাৎ—মনের অনুকূল বস্তুতে মনের যে অত্যন্ত আবেশ, উহার নাম রতি। এই অপ্রাকৃত মদনের দ্বারাই মাদনী শক্তি শ্রীমতীর সহিত আনন্দময় প্রেমলীলা বিলাস সংঘটিত হয়। ইনি—"সাক্ষান্মথমন্মথ" অর্থাৎ—প্রাকৃত মন্মথ বা মদনেরও মদন। যে কাম জগৎকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এই অপ্রাকৃত মদন, সেই মদনকে ভুলাইয়া নিজায়ত্ত করিয়া লয়—মজাইয়া পাগল করিয়া দেয়। কামে মানুষে মানুষে বাঁধিতে পারে। কাম যদি প্রেম হয়, তবে যুগলে যুগল ভজনা করিতে পারে। কামকে প্রেমে পরিণত করিতে হইলে, মিথুন-ধর্ম্মী নর-নারীর হৃদয়ের উদ্দাম, আকুল আত্মহারা কামের সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের স্পর্শ-মণি স্পর্শ করাইতে হয়। তাহা হইলে কাম-লৌহ প্রেমরূপ স্বর্ণে পরিণত হয়। ভাব আর প্রাণের খেলাই রাধাকৃষ্ণলীলা। কামবীজ কাম-গায়ত্রী তাহার মন্ত্র, আর গোপী অর্থাৎ—স্বরূপ-শক্তিতে অধিষ্ঠিত জীব সেই মন্ত্রের সাধক। সে সাধনায় জীব নিত্যানন্দ লাভ করে,—কামের জ্বালা ভুলিয়া গিয়া প্রেমের আনন্দে পূর্ণ হয়। দোললীলা—সেই প্রেম-

স্বরূপ মদন ও চির আসক্তিরূপিনী রতির আনন্দময় খেলা। তাই দোললীলা মদনোৎসব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মদনোৎসব প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে এক মহাব সন্তী উৎসব রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজি কাল-মাহাত্ম্যে তাহার ছায়া আছে মাত্র।

এই দোললীলা ভগবানের পূর্ণ যোগলীলা। যোগেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে বহুধা স্বরূপ বিভক্ত করিয়া প্রতি গোপী-আত্মার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি রমণেচ্ছায় রমণ করেন নাই—তিনি ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ের অতীত, তিনি আত্মারাম। যিনি আত্মারাম তিনি নিজের আত্মায় রমণ করেন। এ দিকে গোপীদিগের আত্মা যখন জড়ের বাহিরে গেল—যখন তন্ময় হইল—যখন কৃষ্ণের স্বশক্তিতে পরিণত হইল; তখন তাহা ভগবানের নিজ আত্মা—সুতরাং আত্মারাম সে আত্মায় রমণ করিলেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার রমণ—মধুর মিলন—দোললীলা। অতএব গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ, শক্তিমান ও শক্তির মিলন—জল ও তরঙ্গের মিলন। সে মিলন মরীচিমালীর মরীচি আকর্ষণ। সে আকর্ষণে প্রগাঢ় চিদ্‌ঘনানন্দ বিদ্যমান। নিজ দুঃখ বর্জ্জিত হইয়া কেবল সুখ ভোগের জন্য সাধকের এই দোললীলার ভাবই চরম অবলম্বন। মানুষ, মানুষ থাকিয়াও ভগবানের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পর্কে এইরূপেই মিলিত হয়। মনুষ্যের সহিত ভগবদ্‌-প্রেমের পূর্ণ বিকাশের এই পবিত্র পন্থা। মধুরলীলার ইহাই বাসন্তীপূর্ণিমা,—এই শশীশোভনা, গতঘনরাকা ভক্তজীবনের পূর্ণাদর্শ। অতএব পাঠক! মিথুন ধর্ম্মের বিবর্ত্তবিলাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রাসমণ্ডল মধ্যস্থ দোলমঞ্চোপরি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমের মধুর স্বাদ গ্রহণ করুন,—জীবন সার্থক হইবে—মর্ত্ত ভূমির গতাগতি বিদূরিত হইবে।

রাস ভক্ত ও ভগবানের প্রাথমিক মিলন মাত্র; আর স্বরূপ শক্তির সহিত ভগবানের নিত্য মিলনের নাম দোললীলা। ভূ বৃন্দাবনে সাধকের স্বরূপ শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সহিত মিলনের অবস্থা প্রকটিত; আর অধ্যাত্ম-বৃন্দাবনে সিদ্ধাবস্থার নিত্যভাব বিরাজিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাই চরম অবস্থা, পরে বিরহের পালা। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের বিরহ কদাপি সম্ভবপর নহে; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাঁহাদের নিত্যভাব দোললীলায় প্রকটিত হইয়াছে। এই নিত্যভাব উপলব্ধি করিয়াই বঙ্গদেশের দ্বিজ রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন;—

"দোলে দোলেরে আনন্দময়ী, করাল বদনা শ্যাম॥"

আর এই নিত্যভাবের বিভোর কবি জয়দেব। তাঁহার মধুমাখা কবিতাগুলি হৃদয়ানুরাগের বাসন্তী-বিকাশ।

দেখ ঐ সাধক—ভগবদ্ভক্ত তাহার বাসনা কামনা, সুখ দুঃখ, আত্মীয়-স্বজন লাজ-শীল-কুলমান সর্ব্বস্ব ভগবচ্চরণে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির নিভৃত নিকুঞ্জে ধ্যানে বসিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্ব হৃদয় বাসন্তী পূর্ণিমা অপেক্ষা রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সাধকের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া টল টল হইল। সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়-মঞ্চে পরম পুরুষ উদয় হইলেন,—সাধকের স্ব স্বরূপ বিকশিত হইল।

মুরলীমোহন বংশী বাজাইতে বাজাইতে বঙ্কিম ভাবে ঈষৎ দুলিতে দুলিতে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কি মোহন বেশ! কি সুধার বংশীধ্বনি। শ্যামসুন্দরের আবির্ভাব মাত্রেই সাধকের স্বরূপ শক্তি প্রেম স্বরূপ শ্রীরাধা মূর্ত্তিতে তাঁহার পাশে আসিয়া মিশিলেন। প্রেমের সাধনা রূপিনী অষ্ট সহচরী অনুরাগ রূপ রাগ রঞ্জনে সেই হৃদয় ধাম সুরঞ্জিত করিল। হৃদয়ে শুধু প্রেমের মাখামাখি ও ছড়াছড়ি। বংশীর সুধারবে হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল—কেবল প্রণব ঝঙ্কারে (হরি হরি ধ্বনিতে) হৃদয় পরিপূর্ণ। সেই হৃদয় মঞ্চে দাঁড়াইয়া কালাচাঁদ নৃত্য করিতেছেন—মঞ্চ দোদুল্যমান। হ্লাদিনী রাধা অনুরাগ কুঙ্কুমে সাধনার অষ্ট সহচরী সঙ্গে পুরুষোত্তমের দোলে মাতিয়া গিয়াছেন। কি সুন্দর ব্যাপার! কি মধুময় চিত্র!! আজি প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যে শ্রীরাধা সুন্দরী। বাস্তবিক প্রকৃতি ধামে সাত্বিকী ভক্তি অপেক্ষা সুন্দরী কে? পৃথ্বীর সম্পদ যাঁর পদতলে, সেই জগল্ললামভূতা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হইয়া হীরকভূষণভূষিতা ও মুক্তামালায় শোভিতা। কৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় নীলাম্বরা। যিনি অনন্ত শয্যায় অনন্ত চক্ষু উম্মিলন করিয়া পদতলে সেই নিত্য-আশ্রিতা ঐশ্বর্য্য-ময়ীর পানে চাহিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতি-প্রেমমুগ্ধ রাধানাথ আজ রাধিকা পার্শ্বে সুশোভিত। বঙ্কিম দৃষ্টিতে সেই রাধাসুন্দরীকে নিয়ত দেখিতেছেন ব্রহ্মাণ্ডকমল তাঁহার পদতলে। গলে প্রেমপুষ্পের বনমালা। করে বেদগাথা শান্তির মোহনবাঁশরী। পীতাম্বরে বাসন্তী রাগ ও মাধুরী। রূপে প্রফুল্ল ইন্দীবরদলনিভা বা তমালের শ্যামলতা। আদিরস শ্যামবর্ণ, তাহার দেবতা বিষ্ণু; রসময় রসময়ীর রমণে শ্যামসুন্দর। সত্যের বিজয়রূপ মোহন চূড়া শিরে শোভিত। মুখে আনন্দময়ের মৃদু মধুর হাস্য। চারিধারেই হৃদ্‌বৃত্তিরূপা গোপাঙ্গনাগণ প্রেমের রাগ-রঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছেন। নীলা-কাশে চাঁদ, চাঁদের চারিপাশে গোপিগণ তারার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বাসন্তী-রাগে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতেছে। সাধকের—ভক্তের সমগ্র হৃদয় শ্যামময় ও রাধাময় হইয়া দোললীলা করিতেছে।

যাঁহারা এই দোললীলা দেখিতে চান, তাঁহারা সদ্ গুরুর সাধনায় হৃদয়ে বাসন্তী শোভার বিস্তার পূর্ব্বক নিত্য প্রেমের ভাবে হৃদয়কে পূর্ণ করুন। হৃদয়ে সেই সাত্বিক প্রেমের সঞ্চার হইলে ক্রমে সাধনাবলে হৃদয়ের হ্লাদিনী শক্তি রাধারূপে প্রকটিত হইবেন। আর পরা শক্তি রাধারূপে প্রকটিত হইলেই বংশীধর দেখা দিবেন। চাই কেবল সাধনা; চাই, কেবল ভক্তি ও প্রেম। তাহা হইলেই হৃদয় ব্রজধাম হইবে। তখন ব্রজে-শ্বরীর সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যমিলন—দোললীলায় মাতিয়া অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া যাইবে। তাই ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন;—

আমার হৃদমাঝে দোলমঞ্চোপরি, এসে দাঁড়াও হে শ্রীহরি।

আছে, অহঙ্কারের উচ্চ মঞ্চ হে আমার বুদ্ধিক্ষেত্র যুড়ি।

(তাহে ত্রিগুণে তিন ধাপ হয়েছে হে)

আছে শব্দ স্পর্শ গন্ধ রূপ রসের প্রধান পঞ্চ সিড়ী,

এসের চরণে দলিয়া ক্রমে উঠ গিয়া মঞ্চ-
শিখরোপরি;
দোল হে তথায়, (আমার) মন দোলনায়,
তুমি ভারি কেমন আছ বুঝব হরি;—
যদি মঞ্চ নিয়ে পড়ে যেতে পার আমার মন-
দোলনা ছিঁড়ি॥
(এসে বুদ্ধিক্ষেত্রে গড়াগড়ি যাও, যেমন
ব্রজের রজে লুটাইয়েছিলে হে)
ছিল সাধ হৃদিপরে ভক্তি-আবীরে ভূষিব
তোমারে হরি,
এবে খুঁজে দেখি নাই তোমারে জানাই
স্বভাব নিয়েছে হরি;
বলিতে আমার, কিছুই নাই হে আর,
বল কি দিয়ে তোমার পূজা করি;—
আমি আবীর হ'য়ে পায়ে লেগে যাই ব'লে
হরি হরি॥
(পায়ে রাখ কিম্বা মুছে ফেল, আমি চরণে
শরণ নিলাম হে।)
কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

———:0:———

সাধক সঙ্গীত।

[১১]

বেহাগ—মধ্যমান।

শক্তি কার! কি আকার মায়ের করে নিরূপণ,
অঘোরা অনন্ত কায়া, অচ্যুত অনন্তের ছায়া,
অনন্ত অচিন্ত্যমায়া, অনন্ত দর্শন॥
ভূর্ভুবঃ স্বঃ কলেবর তার, মন রে প্রণব তার জীবন,
জ্ঞান তাঁর অঙ্গের লাবণ্য শান্তি তাঁহার মন,
বেদের বাহু নিরুপম, তরুমাত্র গাত্র রোম,
নয়ন মায়ের সূর্য্য সোম, নক্ষত্র দশন॥
সমুদ্র তাঁর গভীর নাভি মন রে মায়া তাঁর উদর,
পয়োধর ভূধর মায়ের কেশ জলধর,
আকাশ তাঁর নির্ম্মল বর্ণ, শব্দ মাত্র মায়ের কর্ণ,
নাসিকা তাঁর সমীরণ দশদিক বসন॥
সত্য মায়ের হৃদয় ক্ষেত্র, মনরে বক্ষ তাঁর বিজ্ঞান,
পঞ্চাশত বর্ণের ওষ্ঠ অমৃতের নিদান,

বিদ্যা তাঁহার কণ্ঠের খ্যাতি, চক্ষের নিমেষ দিবা রাত্রি,
কটাক্ষে হয় কে না জানে সৃষ্টি লয় পালন ॥
ত্রিগুণের মেখলা পরা মন রে কৌশল তাঁর প্রচুর,
শ্রী, মঙ্গল, মায়ের আমার চরণের নুপুর।
ষড় ঋতুর ভূষণ পরা, কালের দর্পণ করে ধরা,
নাই রে মায়ের বাল্য জরা, স্থির কেবল যৌবন ॥
প্রফুল্ল কুসুম মায়ের মন রে মধুর হাস্য লেশ,
অব্যক্ত শ্রীমুখপদ্ম মৃত্যু পৃষ্ঠদেশ,
গোবিন্দ জানে না মর্ম্ম শিরোমণ্ডল স্বয়ং ধর্ম্ম
আনন্দ স্বভাব মায়ের মুক্তিপ্রদ চরণ ॥

——0——

উপদেশ—সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

৯১। দেহ ধারণ মৃত্যুর জন্য; জন্ম গ্রহণের পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল মৃত্যুরই আয়োজন করা হয়। মৃত্যুর পর কোন অজানা—অচিনা দেশে—আত্মীয় স্বজন-বিহীন দেশে কি ভাবে যাইবে,—কি ভাবে থাকিবে, তাহারই আয়োজন করার জন্য দেহ ধারণ; কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া যে দেশে আপন আত্মীয় স্বজন আছে তাহারই চিন্তা করি।

৯২। মৃত্যুর পর সেই অজ্ঞাত দেশে হাসিমুখে সাজাইয়া গুছাইয়া বিদায় দেওয়ার জন্যই আত্মীয় স্বজনের দরকার; আমরা কিন্তু তাহা না করিয়া মৃত আত্মীয়ের জন্য কান্দিয়াই আকুল।

৯৩। আত্মীয় কে?—যে সর্ব্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

৯৪। সতী স্ত্রীলোকের প্রেমই সাধন; শুধু স্বামী ও তাহার আত্মীয় স্বজনের সেবা করিয়া বিশ্বপ্রেমিকা হইতে পারে।

৯৫। পরকে আপন করিবার উদ্দেশ্যে,—আসক্ত হইবার জন্য নয়—হিন্দু ঋষিগণ ভিন্ন বংশে বিবাহের রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

৯৬। প্রত্যেকে যে কাজই করুক না কেন, আপন ভাব ও লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া কাজ করিলে কৃতকার্য্য হইবেই হইবে।

৯৭। যিনি আধ্যাত্মিক জগতে যত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তিনি তত ভাবুক।

৯৮। মানুষ যৌবনে যেরূপ কাজ করে বৃদ্ধকালে তাহারই ফল ভোগ করে; যেমন দিবসে গরুগুলি যেরূপ ঘাস খায়

রাত্রে সেই ঘাসেরই আবর কাটে।

৯৯। যে কোন কাজ কর না কেন তাহাতে যেন আমিত্বের গন্ধ না থাকে; জগতের জন্য করিতেছি, একজন না একজন ইহার ফল ভোগ করুক তাহাতে আমার লাভ লোকসান নাই।

১০০। যোগী ভোগী হইতে পারে, কিন্তু ভোগী ভগবৎকৃপা ব্যতীত যোগী হইতে পারে না।

১০১। দেহ বৃদ্ধ হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বৃদ্ধ হয় না।

১০২। যোগী ও সন্ন্যাসীর লক্ষ্য এক কিন্তু পথ বিভিন্ন—যোগী—গৃহী আর সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী।

১০৩। চাহিলেই দোষ—অযাচিত ভাবে যা পাবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

১০৪। ভগবান শান্তিময় তাহাকে পাইলে অর্থাৎ বুঝিতে পারিলেই শান্তি।

১০৫। মানুষ ক্ষুদ্র, সসীম, ভগবান অনন্ত, অসীম; সুতরাং যোগ জপ দ্বারা তাহাকে পাওয়া অসম্ভব—তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাহাকে পাওয়া যায় না।

১০৬। যোগ, দ্বারা গুণের ক্ষয় হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়।

১০৭। চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানের বিমল জ্যোতিঃ নিজের ভিতর প্রতিফলিত হয়

১০৮। তিনিই গুরু—যিনি হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ করিয়া দিতে পারেন।

১০৯। বিনা বাক্যব্যয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া যাওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

১১০। যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, তিনিই ভগবানের সংবাদ দিতে পারেন,—যে কলিকাতা যায় নাই সে কলিকাতার খবর বলিবে কিরূপে? ক্রমশঃ।

স্বরূপানন্দ।

—:0:—

শান্তি।

কেহ বলে ধনে শান্তি, কেহ বলে জনে,
কেহ বলে আছে শান্তি, প্রিয় পরিজনে॥
কেহ বা খুঁজয়ে শান্তি, পর্ব্বত কাননে।
শান্তি, শান্তি বলে ভ্রমে, শ্মশানে মশানে॥
বিষম বিষের কূপে, ডুবে কোন জন।
কেহ বা সন্ন্যাসী বেশ করয়ে ধারণ॥
কেহ বলে আছে শান্তি হইলে মরণ।
কিন্তু হায় মিছে কথা সব অকারণ॥
তবে কি নাহি গো শান্তি ভুবন মাঝারে?
কে বলিল? আছে শান্তি আপন অন্তরে॥
সুখে দুঃখে লাভালাভে একভাবে রবে।
মান অপমানে কভু চঞ্চল না হবে॥
নিন্দা স্তুতি সমভাবে করিও গ্রহণ।
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর শ্রীগুরুচরণ॥
যদি শান্তি পেতে চাও জীবনে মরণে।
রাখ গো মজায়ে মন ও রাঙ্গা চরণে॥

স্বরূপানন্দ।

—0—

সাধু সুবলদাস।

পুণ্যভূমি শ্রীহট্ট জেলা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পিতৃ-পুরুষগণের আবাসস্থল এবং অনেক সাধুমহাত্মার পূত-রজ স্পর্শে পবিত্রীকৃত। এই জেলার একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে সুবলদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে শূদ্র এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তান। ইহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য কিছু পাওয়া যায় না; তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও দেব-দ্বিজ-ভক্ত ছিলেন।

বাল্যে উপযুক্ত শিক্ষাদি না পাইলেও সুবলদাস পরোপকারী, দয়ালু এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যেখানে হরিনাম কীর্ত্তন বা শাস্ত্রাদি চর্চ্চা হইত বালক সুবলদাস পূর্ব্বাহ্লেই সে স্থানে উপস্থিত হইতেন এবং অতীব আনন্দের সহিত সংকীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতেন। সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার অত্যন্ত ভক্তির পাত্র ছিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সুবলদাস যৌবন দশায় উপনীত হইলেন। বাল্যকালের কোমল প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে লাগিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত সঙ্গী জুটিল। যৌবনের শত প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বাল্যের অমিয়-মধুর ভাবগুলি যেন কিছুদিনের জন্য মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চাপা পড়িয়া গেল। সুবলদাস আজ বিবাহ করিয়া সংসারী সজিয়াছেন; কিন্তু এ সাজ যেন তার উপযুক্ত নয়, তাই মাঝে মাঝে বিবেক তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিবার প্রয়াস পাইত; কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন জোর করিয়া যেন পরক্ষণেই আবার ভোগ বাসনার অতল তলে নিমজ্জিত করিত। ক্রমশঃ এইরূপ উভয়বিধ প্রতিযোগিতার নিষ্পেষণে তাঁহার হৃদয় রাজ্যে অশান্তির অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যে কামিনী-কাঞ্চনকে সুখ শান্তির উৎস জ্ঞানে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, আজ সেগুলি বিষবৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল; কিন্তু কি করেন, সংসারী সাজিয়াছেন, দায়ীত্ব জ্ঞানে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না; অগত্যা ভগবানের উপর নির্ভর করিলেন।

এই সময়ে ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান ভক্তের ভার লাঘব করিবার জন্য যেন তাঁহার বড় স্নেহের পত্নীটীকে এ জগৎ হইতে অপসৃত করিলেন; সুবলদাস হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এতদিনে সুবলদাসের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে চলিল।

যথাকালে ভার্য্যার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাধা করিয়া স্থির করিলেন, ভগবান যখন অনুগ্রহ করিয়া পাশমুক্ত করিয়া দিয়াছেন তখন আর ইচ্ছা করিয়া পাশবদ্ধ হইব না,—আর বিবাহ করিব না। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যাহাতে শান্তি লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব।

এই সময়ে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি সুবলদাসকে বুঝাইয়া দিলেন,—সংসার অনিত্য, এখানে কামনার বস্তু কিছুই নাই, যদি কিছু কামনার থাকে, তবে—সেই ভগবানের রাতুল চরণ।

তাঁহার উপদেশে সুবলের বৈরাগ্য জন্মিল, সংসারের সুখ শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব সাধুর আখড়ায় গিয়া ভেক গ্রহণ করিলেন।

ভেক গ্রহণের পরেই সুবলদাসের হৃদয়ে সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। নামগানে সদাসর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন। নামমাহাত্ম্যে শরীরে পুলক, হর্ষ প্রভৃতি দেখা গেল এবং ভাবের উদয় হইল। দিবারাত্রি বোধ নাই। আহার নিদ্রায় ভ্রূক্ষেপ নাই। সদাসর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্তবৎ হইয়া থাকিতেন। সে সময়ে যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনিই বিস্মিত হইয়াছেন,—নামে মানুষকে এমন পাগল করে! তাঁহার ভাব দেখিয়া অনেক নাস্তিকের হৃদয়ও গলিয়া যাইত।

কালক্রমে সুবলদাস ভক্ত বলিয়া তদ্দেশবাসীগণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন; দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য—তাঁহার উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের লইয়া তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন আর বলিতেন, কলিকালে নাম ছাড়া আর কিছু নাই, যথা, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"

তাঁহার নিজের কোন আখড়া ছিল না বা "সেবাদাসী" গ্রহণ করেন নাই। তিনি অধিকাংশ সময় বাহাদুরপুর মহাপ্রভুর আখড়ায় ও মধুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, এবং হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। ভিক্ষাদি করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিতেন। এমন দেখা গিয়াছে যে অনেক পিতৃমাতৃ-দায়গ্রস্থ বা অন্যান্যরূপ অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি এই ভিক্ষুকের নিকট যাহা দান স্বরূপ পাইয়াছেন তাহা রাজা মহারাজা বা জমিদারের নিকটও পান নাই। তিনি মাঝে মাঝে অনেক সাধু,-সজ্জন,-ব্রাহ্মণ,-বৈষ্ণব ও-দুঃখিদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া মহোৎসব দিতেন এবং পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেন।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বৈষ্ণব—সম্প্রদায়েরে ব্যক্তি মাত্রেই লম্পট এবং জুয়াচোর; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম বলিতে কিছু নাই; বাস্তবিকই গৌড়িয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধঃপতন দেখিয়া সকলেই তাহাদিগকে ঐরূপ আখ্যা দিয়া থাকেন; কিন্তু মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পন্থা কখনই কুপথ হইতে পারে না। লোকে উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই উহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যাহাহউক ঐ পন্থায় যে প্রকৃত লোক বা সিদ্ধ মহাত্মা নাই এরূপ ধারণা করা কখনই উচিত নহে। সুবলদাসকেও অনেকে ঐরূপ কপটাচারী বলিয়া বিদ্রূপ করিত। অনেকে তাঁহাকে সামান্য একজন বৈষ্ণব মনে করিত; কিন্তু ভক্ত মাত্রেই ইঁহার উন্নত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। যাহাহউক ভক্ত সুবলদাস আদরে বা অনাদরে পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে থাকিয়া যে জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিলেন, যে শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে এমন কয়জন ভাগ্যবান জীব আছেন বলিতে পারি না, যাঁহারা

কখনও ঐ রূপ শান্তি-সুধারস আস্বাদন করিয়াছেন।

এইরূপে কিছুদিন নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সুবলদাস একদিন দয়ালবাবুকে বলিলেন, ভাই, জীবের পরমায়ুর কথা বলা যায় না, আমি কখন আছি কখন নাই; আমার একটা ইচ্ছা ছিল পুরণ করিবে কি?—আমার মনে হয়,—জীবসেবাই পরম ধর্ম্ম। মানুষকে খাওয়ান অপেক্ষা কিছু ভাল কাজ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তা,—আমার ইচ্ছা কতকগুলি সাধুসজ্জন, ব্রাহ্মণ, দুঃখীকে খাওয়াইব, তুমি এ বিষয়ে সাহায্য করিবে কি? দয়ালবাবু সুবলদাসের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি সুবলদাসকে নিজের গৃহে স্থান দিয়া যথাযোগ্য সেবা করিতেন, এবং যখন যাহা তিনি আদেশ করিতেন দয়ালবাবু অকপট হৃদয়ে তাহা তদ্দণ্ডেই পালন করিতেন। সুতরাং সুবলদাসের প্রস্তাব তিনি আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন, এবং সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহোৎসব আরম্ভ হইল। আহার্য্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন হইল। অগণ্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদির সমাগম হইতে লাগিল। সুবলদাস বাবাজীর আজ আর আনন্দ ধরে না। সমাগত ব্যক্তিগণের সমাদরে এবং সেবাশুশ্রূষার জন্য এক সুবল যেন শত সুবল হইলেন। সকলেই যথাযোগ্য সমাদর পাইয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ভক্তের হৃদয় বুঝিতে পারিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ কোথায়ও বা কীর্ত্তন, কোথায়ও বা নাচগান, কোথায়ও বা দলে দলে আহার করিতেছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে,—কোন বস্তুর অপ্রতুল নাই। সকলেই পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন, ও হরিনাম সংকীর্ত্তনাদির আনন্দ উপভোগ করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। সুবলদাস পরে দয়ালবাবুর বাটীর সকলকে নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ বাবাজীর আহার হয় নাই বলিয়া খাইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার অকাট্য যুক্তিতে বাধ্য হইয়া খাইতে বসিলেন। যখন দেখিলেন আর একটী প্রাণীও অভুক্ত নাই, তখন সুবলদাস দয়ালবাবুকে বলিলেন,—'ভাই, তবে আমি এখন আসি'। দয়ালবাবু ভাবিলেন, বাবাজি অবসর পাইয়াছেন, তাই বলিলেন—'আসি'। তাঁহার "আসার" মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। আজ সুবলদাসের এই আসাই শেষ আসা হইল।

সুবলদাস তথা হইতে বিদায় লইয়া সেই বাটীর স্থাপিত বিগ্রহমূর্ত্তির মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে তুলসী ও বিল্ববৃক্ষমূলে পদ্মাসনে বসিয়া নাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাসমাধি লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মা যে অনন্ত অক্ষয় রাজ্যের সেই রাজ্যে গিয়া উপনীত হইল, কিন্তু রাখিয়া গেল, হরিনামের মাহাত্ম্য।

এস ভাই, আর কেন? যে নামসাগরে ডুবিয়া ভোলা শ্মশানবাসী, যে নাম গাহিবার জন্য একটী মুখে তৃপ্তি হয় নাই, তাই পঞ্চমুখ ধরিয়াছেন, যে নামের জন্য ব্রহ্মা দণ্ড কমণ্ডলু সার করিয়াছেন, নারদ বীণা বাজাইয়া

যে নাম-মাহাত্ম্য ত্রিজগতে ঘোষণা করিয়া বেড়াইয়াছেন, গুরুদিনের কথা নয়,—যে নাম-মাহাত্ম্যে গৌরাঙ্গদেব নদে ভাসাইয়া গিয়াছেন, জগাই মাধায়ের মত পাপী তরাইয়াছে, আর আজ যে নামে নগণ্য অনেক পল্লীবাসী উদ্ধার হইল, এস সেই নামসমুদ্রে ঝাঁপ, দিই আর কেন কাল বিলম্ব। আমাদিগের আর হুতাশ হইবার কারণ নাই; যোগ, যাগ, তপস্যা না করিতে পারি,—সে গুলি আমাদের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু নাম নিতে কোন কষ্ট নাই,—কোন বাধা নাই। নামে আপনি প্রাণ গলিবে, সুধার আস্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য হইয়া যাইবে! "এ নাম লইতে লইতে আপনা হইতে গলিবে প্রাণ।"

শ্রীব্রহ্মচারী অতুলানন্দ।

—:0:—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

শ্রীবিগ্রহের মল্লবেশ।

শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলে, প্রধান সেবায়েৎ মহাশয় গর্ভগৃহের মধ্যে শ্রীশ্রীরণছোড়জীর সিংহাসন সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহার পর দরজার পর্দ্দা উঠাইয়া দিয়া বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হইতে একে একে রাজবেশ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে রাজমুকুট খুলিয়া লওয়া হইলে শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তির সমুদয় মোহনঅঙ্গ দেখিয়া ধন্য হইলাম। কৃষ্ণ প্রস্তরের কি সুন্দর মোহিনী মূর্ত্তি; এমন প্রাণ জুড়ান মনোমোহন বিগ্রহমূর্ত্তি শ্রীবদরিকাশ্রমের শ্রীবদরি-নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোথায়ও দেখি নাই। এক খানি উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তরে শ্রীমূর্ত্তি গঠিত; চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্ম বিরাজিত। গলদেশে দীর্ঘ বৈজয়ন্তমালা ও কক্ষে কৌস্তুভরত্নখোদিত; শ্রীমূর্ত্তি মল্লবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। উভয় পদপার্শ্বে দুইটী অন্যমূর্ত্তি রহিয়াছে।

স্নান ও পূজা।

শ্রীবিগ্রহের রাজবেশ উন্মোচিত হইলে পর আমাদিগকে বেদী সমীপে লইয়া গিয়া সেবায়েৎঠাকুর পুনরায় দরজার পরদা ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে সুগন্ধিতৈল আনীত হইল। সেবায়েতের অনুমতি লইয়া আমরা সস্ত্রীক বেদীর উপরে উঠিয়া শ্রীঅঙ্গে তৈলম্রক্ষণ করিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেবায়েৎগণ সুমধুর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কি আনন্দ!—কি তৃপ্তি! এমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা কোথায়ও দেখি নাই বা করিতে পাই নাই। তৈলম্রক্ষণের পর দধি, দুগ্ধ ও গোমতী-গঙ্গার জল দিয়া আমরা প্রাণ ভরিয়া স্নান করাইলাম কিন্তু এত আনন্দেও আমার মনে সম্যক তৃপ্তি হইতেছিল না, কারণ আমার সঙ্গীয় যাত্রিগণ পর্দ্দার বাহিরে দাড়াইয়া আছেন, একসঙ্গে এ আনন্দ ভোগ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছিলাম; পরিশেষে সেবায়েতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদি-

পকে, পর্দ্দার ভিতরে আনিলাম। মহানন্দে স্নান সমাপন করতঃ শুভ্র গাত্রমর্জ্জনী দ্বারা বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া দিলাম। তখন সেবায়েৎগণ পুনরায় রাজবেশ ও অলঙ্কারাদি পরাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, স্নানের আরম্ভ হইতে বেশাদি সমাপন পর্য্যন্ত পূজকের মুখে বিশুদ্ধ শুভ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল।

তদনন্তর পুষ্প, মাল্য, চন্দন ও তুলসী আনীত হইল। সহকারী পূজক মন্ত্র বলিয়া দিতে লাগিলেন, আমরা সস্ত্রীক সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে সচন্দন তুলসী ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলাম। তখন প্রাণমন স্বর্গীয় শান্তি সুধারসে ভরিয়া গেল। আর মনে হইতে লাগিল, ধরাধামে বৈকুণ্ঠতুল্য—শ্রীমতীরুক্মিণী দেবীর শ্রীমন্দির বলিয়া যাহার জগতে প্রসিদ্ধি সেই পরম পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আমরা শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হইলাম। নশ্বর মানবজীবনে ইহা অপেক্ষা অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? আমরা কি বাস্তবিক সেই দ্বারকাধামে আসিয়াছি,—যাঁহার অপার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"দ্বারকা নগরীং দৃষ্ট্বা নরো নারায়ণোভবেৎ।
দ্বারকায়াং মৃতো যশ্চ গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ॥
পশ্যন্ শৃণ্বন কথাং তস্যা দ্বারকেতি বদন্ কচিৎ।
দৃষ্ট্বা চক্রাং তৃণং মৃত্যা গতো যাতি পরাং গতিম্।"

আমার সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পূজান্তে জপ করিয়া দেবতা প্রদক্ষিণ করতঃ বহির্দ্দেশে চলিয়া আসিলাম। গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি সেবায়েতের প্রাপ্য ২৲টাকা দিলাম, পরে চরণামৃত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালায় রওনা হইলাম। ইতিমধ্যে পূজক মহাশয় জানাইলেন যে,—"অদ্য শ্রীবিগ্রহের মহাপ্রসাদ বাসায় প্রেরিত হইবে।" বলা বাহুল্য, ঐ দিন আমরা ভোগের জন্য ৭৲টা টাকা দিয়াছিলাম। আমরা ধর্ম্মশালায় আসিলে পর যথাসময়ে মহাপ্রসাদ আসিল; আমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। বৈকালে বিশ্রাম করতঃ রাত্রে আরাত্রিক দেখিতে শ্রীমন্দিরে গেলাম। আরতি সমাধা হইলে পঞ্চপ্রদীপের উত্তাপ ও পূজক ঠাকুরের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রাচীর গাত্রের দেববিগ্রহগুলি দর্শন করিলাম। ১। শ্রীশ্রীবলদেবজী, মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রথমেই ইনি নয়নগোচর হন। ২ শ্রীশ্রীবেণীমাধবজী,। ৩ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমজী,। ৪। শ্রীশ্রীরাধিকাদেবী,। ৫। শ্রীশ্রীকুশেশ্বরমহাদেব, ৬। শ্রীজাম্বুবানজী, ৭। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের আসন, ৮। শ্রীশ্রীগুরুদত্তাত্রেয়ের আসন,। ৯। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজী, ১০। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী, ১১। শ্রীশ্রীসত্যভামাদেবী, এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাদেবী। আমরা এই সমস্ত দর্শন করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম, পরে আহার ও নিদ্রা।

১৩ই মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে স্নান তর্পণ ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া দ্বারকার অন্যান্য দৃশ্য দেখিতে বাহির হইলাম।

সারদা মঠ।

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে প্রস্তর সোপানের দক্ষিণ পার্শ্বে শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠ। আচার্য্যপাদ ... ভ্রষ্ট বৌদ্ধগণকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন ও জ্ঞান প্রচারের সুবিধার জন্য বেদোক্ত চারিটী মহাবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী সুবৃহৎ মঠ স্থাপনা করিয়াছিলেন। দ্বারকা-ধামের সারদা মঠ ঐ চারিটী প্রধান মঠের অন্যতম। মঠের বর্ত্তমান শ্রীশঙ্করের সহিত শ্রীদ্বারকানাথের সেবায়েৎগণের মঠের সত্ত্ব-স্বামীত্ব লইয়া এক্ষণে মোকদ্দমা চলিতেছে; সেই জন্য মঠের এই দুরবস্থা। তথায় কেহ অধিষ্ঠানও করেন না; কেবল ফলাহারিণ মায়ীজী নামে একটী বাঙ্গালী বুড়া স্ত্রীলোক এই মঠে থাকেন। ইনি এইখানে শ্রীশ্রী-দ্বারকানাথের ধ্যান-ধারণায় সময় অতিবাহিত করেন এবং যাত্রীগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। ফল খাইয়া থাকেন বলিয়াই এদেশের লোক তাঁহাকে ফলাহারিণ মায়ীজী বলিয়া ডাকিয়া থাকে; কিন্তু বুড়ীর প্রকৃত নাম রাধাদাসী। বুড়ী ময়রার মেয়ে, আদি নিবাস কলিকাতা —বাঁধা বটতলা। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি গৃহত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন; তখন সবে মাত্র কাশীর রেলপথ হইয়াছে। তৎপরে কাশী হইতে বৃন্দাবন ও মথুরাপুরী হইয়া জয়পুরে যান; সেখান হইতে জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রায় সংসারচন্দ্র সেন বাহাদুরের পরিবারবর্গের সহিত পুষ্করতীর্থ হইয়া প্রভাস ও দ্বারকায় উপস্থিত হন। সেই অবধি দ্বারকাধামেই আছেন। বৃদ্ধার বর্ত্তমান বয়স প্রায় সপ্ততি বৎসর হইবে। বাঙ্গালী যাত্রীগণ ইহাঁর সেবাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, আমরাও কিছু দিলাম।

গোমতী তীর।

মন্দিরের সোপানশ্রেণী হইতে অবতরণ করতঃ আমরা মহাপুণ্যময়ী গোমতীর তীরে আসিয়া নদীতীরস্থ রাস্তায় চলিতে লাগিলাম। গোমতী তীরে কত দেবালয়, কত সাধু-সন্ন্যাসীর কুটির—আশ্রম—মঠ এবং কত শত তীর্থযাত্রীর সমাধিক্ষেত্র। প্রথমে স্নানঘাটের উপরেই মন্দিরের মধ্যে গোমতীমায়ী, পরে ২। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণজী, ৩। শ্রীশ্রীহনুমানজী, ৪। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজী, এবং ৫। সাগরসঙ্গম-স্থলে শ্রীশ্রীসঙ্গমনারায়ণজী, গোমতী-সাগর-সঙ্গম বৈকালবেলায় নয়ন-মন-প্রফুল্লকর শোভায় জীবকে মোহিত করে। এই সঙ্গম-নারায়ণজী পূর্ব্বে জলদস্যুগণের দ্বারা পূজিত হইতেন। ইহারই একস্থানে পঞ্চ পাণ্ডবের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে।

শ্রীশ্রীভদ্রকালী।

সহরের মধ্যে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা ভদ্রকালীর-বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে বস্ত্রাদি বিভূষিত চন্দনলেপিত মায়ের মূর্ত্তি; সম্মুখে সর্ব্বদাই ধূপধূনা পুড়িতেছে। মায়ের গর্ভগৃহের পার্শ্বেই আশাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা করিবার পর আশাদেবীরও পূজা করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত দ্বারকায় চক্রতীর্থ, সঙ্গমতীর্থ সপ্তকুণ্ড, নৃপকুণ্ড, গঙ্গা, গো প্রচার প্রভৃতি বহু পুণ্যস্থান আছে, আমরা সমস্ত দর্শন করিয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া বিশ্রাম করিলাম।

১৭ই বুধবার। অদ্য প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে

গেলাম। পূজার সময় শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণ কুক্ষির উপরে একটী বরশীবিদ্ধের ন্যায় দাগ দেখিতে পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক যাহা জানিতে পারিলাম নিম্নে সেই কিম্বদন্তী লিখিত হইল।

ডাকোজী রণছোড়।

শ্রীমন্দির হইতে ছয়মাসের দূর পথে—ডাকোরে একটী অতি দরিদ্র ভক্ত বাস করিতেন। হৃদয়ে তাঁহার অগাধ ভক্তি; শ্রীভগবানের বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতর আকুলি-বিকুলি করে, তাই তিনি ঘরে থাকিতে পারিলেন না। তিন মাস কাল পথ হাটিয়া,—কত বিপদে পড়িয়া কেবল প্রাণের টানে তিনি দ্বারকাধামে উপস্থিত হইলেন। প্রাণ ভরিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া ধন্য হইলেন। আবার তিন মাস হাটিয়া স্বীয় বাসভবনে গমন করিলেন। এইরূপে তিনি প্রতি বৎসর ছয় মাস কাল দ্বারকা যাতায়াতে অতিবাহিত করিতেন; বাকি ছয় মাসের পরিশ্রমে সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে হইত। ক্রমে তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, আর শরীরে পরিশ্রম কুলায় না; অতিকষ্টে তিনি শেষবার দ্বারকাধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন;—"ঠাকুর। আর যে সামর্থ্যে কুলায় না, বৎসরান্তে যখন একবারও শ্রীচরণ দর্শন ঘটিবে না, তখন আর এ দেহধারণে ফল কি? আমি তোমার সম্মুখে এ দেহ ত্যাগ করিব।"

ভক্তের ভগবান—দরিদ্রের দয়াল প্রভু আর কি স্থির থাকিতে পারেন? অমনি আদেশ হইল,—"ভয় কি ভক্ত? যাহাতে তুমি আমায় সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাও, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি। অদ্য রাত্রিতে ভোগ আরতির পর সেবায়েৎগণ নিদ্রামগ্ন হইলে, তুমি সেই সময়ে নির্ভয়ে আমার মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইও, দেখিবে দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া যাইবে। তুমি আসিলে আমি তোমার সহিত চলিয়া যাইব। তুমি আমায় পথ দেখাইয়া যেখানে লইয়া যাইবে, আমি সেই স্থানেই যাইব এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী অবস্থান করিব। কিন্তু আমার পূজার ব্যভিচার হইলে কিম্বা তোমার সংসারে পাপ প্রবেশ করিলে, আমি চলিয়া আসিব।" ভক্ত মহাহ্লাদে আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন; রাত্রিতে শ্রীবিগ্রহ লইয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন। ভক্তের ডাকে শ্রীদ্বারকানাথ মন্দির ছাড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম হইল ডাকোজী রণছোড়।

পরদিন প্রভাতে পূজারী ও পাণ্ডাগণ গর্ভগৃহের দ্বার খুলিয়া দেখেন যে সিংহাসন শূন্য—শ্রীবিগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছে। অমনি চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ মিলিল না। এদিকে ভক্ত ডাকোরে উপনীত হইয়া বিগ্রহ স্থাপন করতঃ মহানন্দে সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ভক্তটীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, সুতরাং দ্বারকানাথের সেবার ত্রুটী হওয়ায় প্রভু সেবায়েৎগণকে স্বপ্নযোগে আপন অবস্থিতি-স্থান জানাইলেন। পাণ্ডা ও সেবায়েৎগণের ডাকোরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভক্তটী

দেহত্যাগ করিলেন, ঠাকুর একটী পুষ্করিণীর জলে লুকায়িত হইলেন। সেবায়েৎগণ তাহা জানিতে পারিয়া পুষ্করিণীতে ছিপ ফেলিয়া টানিতে লাগিলেন। লীলাময়ের ইচ্ছায় একটী বঁড়শী তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষির উপর বিঁধিয়া গেল। তাঁহারা বঁড়শীবিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ উত্তোলন করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং যথারীতি বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বমত ভোগ পূজা চালাইতে লাগিলেন। সেই বঁড়শীর দাগ অদ্যাপি শ্রীঅঙ্গে দৃষ্ট হয়।

গোমতী চক্র।

বেটদ্বারকা ও শঙ্খদ্বারে যেমন শঙ্খ ও নাভিশঙ্খ, দ্বারকায় তেমনি গোমতী-চক্র প্রসিদ্ধ। গোমতী নদীতে এই চক্রাকার পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পুণ্যদা নর্ম্মদার যেমন বাণলিঙ্গ, পুণ্যবতী গণ্ডকীর যেমন নারায়ণচক্র বা শালগ্রামশিলা, গোমতীর চক্রও তদ্রূপ মোক্ষদায়ক। এই পুণ্যময় চক্র শালগ্রামশিলার পার্শ্বে রক্ষা করিতে হয়।

রাজারণছোড়।

"জয় রাজা রণছোড়" মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জরী যাত্রীগণ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের এই নাম লইয়া জয়ধ্বনি করেন কেন;—বিশ্বনাথ ভগবানের রণছোড় নাম কেন—রণদুর্ম্মদ মগধরাজ জরাসন্ধ বারম্বার মথুরানগরী আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন; অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, জরাসন্ধ বিধির বিধানে তাঁহার অবধ্য। তাই রণে বৃথা লোকক্ষয় না করিয়া লোকেশ্বর রণ ছাড়িয়া মথুরা হইতে দ্বারকায় আসিয়া ধাম স্থাপন করিলেন, তাই তাঁহার নাম রণছোড়।

দ্বারকা নির্ম্মাণ।

রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুভ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সমুদ্র দ্বারাবতী বা দ্বারকাপুরী নির্ম্মিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রুক্মীদেবী।

১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—অদ্য প্রভাতে আমরা সকলে গোমতী-গঙ্গায় স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীভগবানের পূজা আরতি দর্শন করতঃ ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি ক্রিয়া সমাধা করিলাম আমরা বৈকালে পাণ্ডার সহিত রুক্মীদেবী দর্শনের জন্য পদব্রজে রওনা হইলাম (ঘোড়া গাড়ীও পাওয়া যায়।) শ্রীমন্দিরে হইতে রুক্মীদেবীর মন্দির প্রায় ২.৩ মাইল দূরে অবস্থিত; অতি অল্প সময় মধ্যেই তথায় পঁহুছিলাম; মন্দিরে প্রবেশকরতঃ শ্রীশ্রীরুক্মী-মাতাকে দর্শন করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রুক্মীদেবীর মন্দির শ্রীমন্দির হইতে এত দূরে কেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, যখন ভগবান দ্বারকাপুরী নির্ম্মান কার্য্য সম্পাদন করতঃ স্বীয় গুরু মহামুনি দুর্ব্বাসাকে উক্ত পুরী দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ জ্ঞাপন করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা অর্থাৎ তুমি ও শ্রীমতী রুক্মীদেবী দোলা বহন করিয়া লইয়া যাও তবে আমি যাইতে স্বীকৃত আছি, অন্যথা নহে। ভগবান তাহাই স্বীকার করিলেন, ভগবান ও শ্রীমতী রুক্মীদেবী তাঁহাকে দোলায় বহন করতঃ দ্বারকাধাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

লীলাময়ের লীলা বুঝা ভার। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী হইলে দুর্ব্বাসামুনি বলিলেন এই স্থানে শিবিকা নামাও আমি এদিক ওদিক দেখিয়া আসি। দুর্ব্বাসামুনি অন্যত্র গেলে শ্রীমতী রুক্মীদেবী বলিলেন "প্রভো, আমি নারীজাতি সহজেই দুর্ব্বলা, বিশেষতঃ শিবিকা বহনে বড়ই ক্লান্তা ও পিপাসার্ত্তা হইয়াছি, আমাকে কিছু পানীয় জল আনিয়া দিউন, পান করতঃ দারুণ পিপাসা নিবারণ করি।" তথায় সুপেয় পানীয় জলের সম্ভাবনা না দেখিয়া ভগবান বিশেষ চিন্তিত হইলেন। অগত্যা স্বকীয় দক্ষিণ পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে গঙ্গা প্রবাহিত করিলেন। রুক্মীদেবী সেই গঙ্গোদক পান করতঃ সুস্থা হইলেন। ইতি-মধ্যে দুর্ব্বাসামুনি তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ক্রোধভরে রুক্মীদেবীকে বলিলেন—"এ কি রুক্মী সামান্য পরিশ্রমেই তুমি এত কাতরা হইয়াছ যে, তোমার পিপাসা নিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণকে তাহার চরণ হইতে গঙ্গা প্রবাহিত করিতে হইয়াছে। এই সামান্য কষ্ট টুকুও কি তুমি সহ্য করিতে পারিলে না? যাহাহউক তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি যে, তুমি আর দ্বারকায় যাইতে পারিবে না, তোমাকে এই স্থানেই থাকিতে হইবে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা অতীব দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। গুরুবাক্য অলঙ্ঘ্য; তদবধি রুক্মী-দেবী তথায় বাসকরিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই জল ভিন্ন দ্বারকায় আর সুপেয় পানীয় জল পাওয়া যায় না। বাহকগণ প্রত্যহ ঐ জল আনিয়া সহরে বিক্রয় করে। সহরবাসী ও যাত্রী-গণ উহা ক্রয় করিয়া থাকেন। এক এক কলসী জল এক আনা মূল্যে বিক্রয় হয়।

দ্বারকা মাহাত্ম্য।

দ্বারকার অন্যান্য নাম দ্বারাবতী, বন-মালিনী, দ্বারিকা, দ্বারকঃ, অব্দিনগরী, দ্বারকা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—

চতুর্ণামমি বর্ণানাং যত্র দ্বারানি সর্ব্বতঃ।
অতো দ্বারাবতী তুল্যা বিষম্ভিতত্ববিদিভিঃ॥

এই মহাপীঠস্থানে ভগবতী আদ্যাশক্তি রুক্মিণীরূপে সদাই বিরাজ করেন। দেবী ভাগবতে আছে,—

"রুক্মিণী দ্বারকায়াঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে।"

জগতে সাতটী যে মোক্ষদায়িনী পুরীর মধ্যে দ্বারকা অন্যতম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে দ্বারকা প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে:—

পৈতৃকী তীর্থতুল্যা না কিং তীর্থং দ্বারকাপরম্।
সর্ব্ব তীর্থ পরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহু পুণ্যদা॥
যস্যাঃ প্রবেশ মাত্রেন নরানাং জন্ম খণ্ডনম্।
দানঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেব পূজনম্॥
চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ।

মহাপুণ্যময় পবিত্র স্থান এই দ্বারকা যে স্থানে ভগবান স্বেচ্ছায় সদা বিরাজমান সেই স্থানের মত পবিত্র জগতে আর কি আছে? ক্রমশঃ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

সতীদাহ।

গত ১১ই পৌষ শুক্রবার ময়মনসিংহ থাকয়া নিবাসী বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী সেটেলমেণ্ট নাজির, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নান্দাইল সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে হঠাৎ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর ছিল। এই মৃত্যুসংবাদ তৎপত্নী সুনীতিবালা উরফে সুহাসিনী তাঁহার শ্বশুরালয় থাকয়া গ্রামে শনিবার শুনিতে পাইয়াছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই পঞ্চদশ বর্ষীয়া নবীনা যুবতী কি যেন এক অভূতপূর্ব ভাবে আবিষ্টা হইলেন! তাঁহার চক্ষে জল, মুখে শব্দ ও মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। তিনি স্থির, অটল, অচলবৎ হইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি স্থির, বোধ হইল প্রাণপাখী যেন দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, এবং হাতের শাঁখা পরিত্যাগ করিতে বলায় তিনি এইমাত্র বলিলেন যে, "শাঁখা সিন্দুর আজ পরিত্যাগ করিব না, যাহা হয় কাল প্রাতে করিবেন।" সকলেই তাঁহার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। যুবতী গোপনে জামা ও পরিধেয় বস্ত্রে কেরোসিন মাখিয়া আরও ২।৩ খানা কাপড় দ্বারা গাত্র বেষ্টন করতঃ স্বামীর লিখিত কয়েকখানা চিঠী সঙ্গে লইয়া রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে বারবার বহির্গমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাড়ীর লোক সতর্ক থাকায় সফলকামা হইতে পারেন নাই। শেষবারে সুযোগ পাইয়া বাহির হন এবং শয়ন ঘরের পশ্চাতে কেরোসিনসিক্ত পাটশোলা দ্বারা সজ্জিত চিতায় আরোহণ করতঃ করজোড়ে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। চিতা জ্বলিয়া উঠিল, সতী পরমানন্দে হাসিমুখে অগ্নিদেবের ক্রোড়ে বসিয়া পতির অনুগমন করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। টের পাইয়া বাড়ীর লোক সমবেত হইলেন। সতীর দেবর ঐ আগুনে তাহার মৃত দাদাকেও দেখিতে পাইয়া "দাদা, দাদা" ডাকিতে ডাকিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অন্যান্যে সতীর নিষেধ সত্বেও চিতায় জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। যখন সতীকে ধরাধরি করিয়া চিতা হইতে নামান হইল তখন তাঁহার শরীর বরফের ন্যায় শীতল। সতী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন, "পতি বিহনে সতীর কর্ত্তব্য কি? তোমরা ছাড়।" তাঁহাকে ঘরে আনা হইল। তিন ঘণ্টার মধ্যে সতীর গাত্রকম্প নিবারিত হয় নাই। সতী তাঁহার দেবরকে "আর্য্য-গৌরব" হইতে পতিস্তোত্র পাঠ করিতে বলিলেন। "আত্মহত্যা মহাপাপ নয় কি?" এই প্রশ্ন করায় সতী বলিলেন, "আমাকে কিশোরগঞ্জে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, আমি তথায় বাবা ও গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিব।" খাইতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন "নান্দাইল হইতে তাঁহার (স্বামীর) প্রেরিত কমলালেবু দিলে খাইতে পারি।" বাড়ীর লোক তাহাই দিয়াছিলেন। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি

নব দ্বার ব্যতীত সতীর প্রায় সর্ব্বাঙ্গই দগ্ধ হইয়াছিল। যদিও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে মাংস বহু পরিমাণে দগ্ধ হইয়াছিল, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুইটী স্থান ব্যতীত ঐ সমস্ত দগ্ধ স্থান সমূহে রক্তবর্ণ নূতন চর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল; কেবল বাম হস্তের কনুই ও দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলীর নিকট ফোস্কা পড়িয়াছিল। পরদিন সোমবার সতীকে কিশোরগঞ্জে পাঠান হয়। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পিতা ও পিতার গুরুদেব কিশোরগঞ্জ বেদবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কে তাঁহার এ অবস্থায় আত্মহত্যা পাপ কিনা জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা পাপ হয় নাই বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রায়, কবিরাজ শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র সেন সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র রায় ডাক্তার, শ্রীযুত সুরেন্দ্রকিশোর রায় হেড্‌মাষ্টার প্রভৃতি সকলেই সতীকে বহুবিধ জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সতী প্রত্যেক প্রশ্নেরই শাস্ত্রবিহিত যথাযথ উত্তর প্রদান করতঃ বলিয়াছিলেন—"আমি অমরধামে যাইতেছি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা বলিলেন "মা আজ অপেক্ষা কর।" সতী তাহাতে সম্মতা হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, কল্য মধ্যাহ্নে যাইব।" সতী প্রথমতঃ ঔষধাদি সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, পরে অনেক অনুরোধ ও চেষ্টায় ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিবের শত নাম ও স্তোত্রাদি অনর্গলরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে "আর অর্দ্ধ-ঘণ্টা সময় বাকী আছে।" বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বারবার গঙ্গোদক পান করিয়াছিলেন এবং প্রতিবারেই "জয় মা গঙ্গে" বলিয়া গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। সতী পূর্ব্ব দিবসের কথামত পরদিন মধ্যাহ্নে মহাপ্রস্থান করেন!

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সতীর প্রাণই যে পতিগত ছিল এমন নহে, তাঁহার দেহও পতিগত ছিল। যদিও সতী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে গাত্রবর্ণ তাঁহার স্বামীর বর্ণের ন্যায় কাল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু নাসিকা ও মুখের গঠন ঠিক তাঁহার পতির অঙ্গের অনুরূপ হইয়াছিল; ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় অনেক উকীল, মোক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত সজ্জন সতীর চিতার কাষ্ঠাদি বহন করিয়া নিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র চিতাভস্ম অনেকেই বাড়ী আনিয়াছিলেন। কিশোরগঞ্জ বালিকাবিদ্যালয়ে সুশিক্ষা লাভ করতঃ পরে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতার রচিত "সতী শতকের" (শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা বালা চৌধুরাণী প্রণীত একশত সতী রমণীর জীবনীসম্বলিত পুস্তক) সতী-জীবন প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার পিতার রচিত সংস্কৃত শ্লোক ও পাদপূরণেও সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ভাল ভাল কবিতা ও সুন্দর হেঁয়ালী রচনা করিতে পারিতেন। সতীর পিতা শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বধর্ম্মপরায়ণ ও আচারনিষ্ঠ কায়স্থ সন্তান। তিনি অনেক নীতি ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

জন্ম—১৩০৫ সন ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার, মধ্যাহ্ন।

বিবাহ—১৩১৭ সন ১১ই ফাল্গুণ।

বৈধব্য—১৩২০ সন ১১ই পৌষ শুক্রবার।

মৃত্যু—১৩২০ সন ১৫ই পৌষ মঙ্গলবার, মধ্যাহ্ন।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেব।

ময়মনসিংহ।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

বন্যার্ত্ত-সেবাসংবাদ—বর্ত্তমান সময়ে বন্যার্ত্তসাহায্য নানা কারণে নিষ্প্রয়োজন বোধকরতঃ, হাইকোর্ট রিলিফপার্টীর কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের কার্য্য অস্থায়ীভাবে বন্ধ করায়, "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক-সমিতির" অন্যতম সেবক স্বামী যোগানন্দ ও কুমার চিদানন্দ গত ২২শে মাঘ বুধবার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার—আমরা অতি আহ্লাদের সহিত বন্যাপীড়িত ভদ্রলোকদিগের ব্যবহারার্থে দীনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রেরিত ছোট বড় ১৭ খানা উৎকৃষ্ট নূতন গেঞ্জি প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ভগবান তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

—:0:—

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

"আর্য্য-দর্পণের" ৬ষ্ঠ বর্ষ অতীত হইতে চলিল,—যাঁহারা আগামী বর্ষে "আর্য্য-দর্পণ" গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, চৈত্র মাস মধ্যে যেন তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় অভিমত আমাদিগকে জানাইয়া অনুগৃহীত করেন। কোন সংবাদ না পাইলে বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ পার্শ্বেলে প্রেরিত হইবে; পার্শ্বেল ফেরত দিয়া দরিদ্র পত্রিকাকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। সকলেই স্মরণ রাখিবেন, "আর্য্য-দর্পণে" র অতীব আয় "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের" কার্য্যে অনাথ-দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবাপূজায় ব্যয়িত হয়।

ম্যানেজার—আর্য্যদর্পণ।

—:0:—

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, } চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

স্মৃতিচিহ্ন।

কাথিয়াবাড়ে কয়েকটী প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন আছে, তন্মধ্যে গিরণারের অশোক, রুদ্রদম ও স্কন্দগুপ্তের প্রাচীন শিলালিপি, হিউয়েন-সাং বর্ণিত জুনাগড়ের প্রাচীন গুহামন্দিরাদি, গিরণার ও শত্রুঞ্জয়ের উপর জৈন মন্দিরাদি, গুমনির ধ্বংসাবশেষ, বল্লভীপুরের ধ্বংসাবশেষ, আরামড়া ও বেটদ্বারকার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন সোমনাথ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বারকাধাম গাইকোয়ার মহারাজের উষা-মণ্ডল পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এই পরগণা বড়ই অনুর্ব্বরা, এ অঞ্চলে বাবুল, ছোট ছোট তেতুল গাছ ও পলাশ বৃক্ষ ব্যতীত অপরাপর বৃক্ষ বড় একটা জন্মে না। চাষাবাদের অবস্থাও তত ভাল নহে, উৎপন্ন শস্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, অরহর ও মুগ সামান্য পরিমাণে জন্মে। গৃহ পালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ, ও মেষই প্রধান, বন্যপশুর মধ্যে নাগেশ্বরী ব্যাঘ্র ও নীল গাই। স্বাস্থ্য মন্দ নয়; পানীয় জলের বিশেষ অভাব; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদোদ্ভবা আকাশ-গঙ্গার জলই পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জল লবণাক্ত। প্রবাদ আছে দেবী রুক্মিণীর প্রতি দুর্ব্বাসা ঋষির অভিশাপই না কি গোমতীর সুস্বাদু জল অপেয় হইবার কারণ।

উষ মণ্ডলের পরিধি তিন শত বর্গমাইল। উত্তরে কচ্ছোপসাগর, পশ্চিমে আরব্যোপসাগর পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সমুদ্রের খাড়ি। সমুদ্রের খাড়ি দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ৮ক্রোশ হইবে, উত্তরাংশ প্রায় ৩ক্রোশ প্রশস্ত আর দক্ষিণ ভাগ সামান্য খালের ন্যায়। বর্ষাকালে খাড়ির

জল অধিক হয়। নাগনাথ ও রত্নেশ্বর নামক দুইটী গ্রামের নিকট ভীমতালাও নামে একটী প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, ইহার জল অতি সুপেয়।

দ্বারকার লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চ সহস্র। অধিকাংশই হিন্দু। দ্বারকার পাণ্ডা ও সেবায়েতগণের অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এতদ্ভিন্ন গুজরাটী, কচ্ছী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি বাস করে।

এই অঞ্চলে ইংরেজী ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন ব্যতীত বারাসাই মুদ্রারও প্রচলন আছে। বারাসাই রৌপ্য কোড়ীর মূল্য আমাদের সাড়ে চারি আনা এবং বারাসাই টাকা আমাদের চৌদ্দ আনার সমান। উখামণ্ডল পরগণায় তিন প্রকার ওজন প্রচলিত; (১) ৩০তোলায় এক সের। (২) ৪০তোলায় এক সের। (৩) ৮০তোলায় এক সের। ৪০সেরে এক মণ এবং ২০মণে এক খাড়ি। হিন্দু-তীর্থযাত্রীগণের প্রদত্ত অর্থই একমাত্র দ্বারকার আয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আয় নাই।

পরব-উৎসব।

সৌরাষ্ট্রে ও গুর্জ্জরে হিন্দুগণ বৎসরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে। (১) সিয়ালু (শীত) (২) উনহালু (গ্রীষ্ম), (৩) চুমাসু অর্থাৎ বর্ষা; কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত সিয়ালু, ফাল্গুণ হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত উনহালু, এবং আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত চুমাসু। প্রতি মাসে দুইটী পক্ষ; সুদ (শুক্ল) উদ (কৃষ্ণপক্ষ)। শরৎকালে উৎসবের ঘটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, নন্দোৎসব, নবরাত্রি, দীপাবালী দেওয়ালী ইত্যাদি পর্ব্ব হয়।

১৬ই চৈত্র শুক্রবার—অদ্য ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর গোমতীতে স্নানান্তে শ্রীশ্রীভগবানকে দর্শনার্থে শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম, তথা হইতে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ মাধ্যাহ্নিক আহারাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বেটদ্বারকা, গোপীতলাওয়া, কল্পবৃক্ষ ও আরামড়া দর্শন করিতে বেলা ২ টার সময় রওয়ানা হইলাম। দ্বারকা দর্শনান্তে বেটদ্বারকা দর্শন করিতে হয়। আমরা ছিদামাপুরী পহুছার জন্য ২৪৲টাকায় দুইখানা গরুর গাড়ী ঠিক করতঃ বেটদ্বারকাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সমস্ত দিন পাহাড়ের রাস্তা দিয়া রাত্রি ৭ টার সময় গোপীতালাওয়ার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ তথায় রাত্রি কাটাইলাম।

১৭ই চৈত্র শনিবার—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ বেটদ্বারকা দর্শন জন্য গোযানে রওয়ানা হইলাম। ধর্ম্মশালা হইতে সমুদ্রের খাড়ি প্রায় দুই তিন মাইল হইবে; গাড়ি হইতে প্রায় তিন ক্রোশ নৌকাযোগে যাইতে হয়। আমরা নৌকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম; অধঘণ্টার মধ্যে ৪।৫ খানা ছোট নৌকা আসিল; প্রত্যেকে এক আনা করিয়া নৌকার ভাড়া দিয়া নৌকারোহন করিলাম। বেলা দশটার সময় নৌকা বেটদ্বারকার ঘাটে পহুছিল; নৌকা হইতে অবতরণ করতঃ প্রত্যেকে ।৵০ছয় আনা হিসাবে প্রবেশ ফিস প্রদান করিয়া সত্বরন্থিত একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

প্রাচীন শঙ্খবার দ্বীপকেই বর্ত্তমানে বেট-দ্বারকা বলে। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরকে বধ করিবার পর শঙ্খাসুরের অস্থি পঞ্জর হইতে এই দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই পৌরাণিক উক্তি। এখনও এই অঞ্চলে শঙ্খতালাও বিদ্যমান আছে; কথিত আছে এই স্থানেই শঙ্খাসুর নিহত হইয়াছিল। ইংরেজেরা বেটদ্বীপকে Parates Island অর্থাৎ বোম্বেটে বা জলদস্যুর দ্বীপ বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ বোম্বেটে শব্দ হইতেই বেট শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বারকা হইতে ৭ ক্রোশ গোযানে এবং ৩ ক্রোশ নৌকাযোগে গমন করিলে বেটদ্বারকায় পঁহুছান যায়। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বধেলরাঠোর রাজাদিগের আরামড়া সহর। ইহার পার্শ্বেই সমুদ্র এবং অপর পারে বেট দ্বীপ। আরামড়াই ছাপ দিবার স্থান। এই স্থানেই শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি উত্তপ্ত করতঃ যাত্রীগণের অঙ্গে ছাপ দেওয়া হয়; এখানে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে চারণেরা ছাপ দিয়া থাকে। পূর্ব্বে ছাপ লইতে হইলে ১১৲ টাকা দিতে হইত; এখন আরও অল্প ব্যয়ে হইয়া থাকে।

বেটশঙ্খদ্বার।

সমুদ্রের পর পারেই শঙ্খ দ্বার দ্বীপ। প্রবাদ আছে ভগবান বিষ্ণু এই স্থানে তক্ষকের নিকট হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখানে শঙ্খনারায়ণ, বেটজীরণছোড় ও রাণী মিরাবাইএর শ্রীকৃষ্ণমন্দির বিদ্যমান। কিম্বদন্তী যে যখন হিন্দুদ্বেষী মোগল বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের প্রেরিত মোগল সৈন্য দ্বারকা মন্দির আক্রমন করে, তখন দ্বারকানাথ রণছোড়-জীর বিগ্রহ মূর্ত্তি শঙ্খবারে গোপনে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত রণছোড়জী শঙ্খবারেই আছেন।

এই সকল দেবস্থান ব্যতীত শঙ্খবারের পশ্চিম প্রান্তে জলদস্যুদিগের কুল্লোরকোট নামক একটী প্রাচীন সুদৃঢ় দুর্গ আছে। ইহার উচ্চ প্রাচীর ও তোরণের উপর পুরাতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সজ্জিত। পূর্ব্বকালে বধেল রাজারা এই দ্বীপে বাস করিতেন। শেষ বধেলরাজা সংগ্রাম জলদস্যু বৃত্তি করিতেন; তিনি গাইকোয়ারের রক্ষী সৈন্য আক্রমন করিলে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ষ্টানহোপ গাইকোয়ারের পক্ষ অবলম্বন করতঃ যুদ্ধ করিয়া উক্ত রাজাকে পরাজিত করেন; তদবধি বধেল রাজারা আরামড়ায় নির্ব্বাসিত হন। শঙ্খবারে প্রচুর শঙ্খ ও নাভিশঙ্খ পাওয়া যায়। অনহলবাড়ায় একটী অমূল্য শঙ্খ আছে।

দ্বারকাধাম হইতে পোরবন্দর পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ ভূমিই জামনগরের জামের অধিকার ভুক্ত। দ্বারকাধাম হইতে পোরবন্দর পর্য্যন্ত যে সকল গরুর গাড়ী যাতায়াত করে তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য ৩৷০ আনা ও পদব্রজে গমনকারী যাত্রীদের প্রত্যেকের জন্য ।৵০ আনা হারে কর দিতে হয়; এই কর আদায়ের জন্য এই স্থানে জামনগরের একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম এই এই সংগৃহীত অর্থে দ্বারকাধাম হইতে পোরবন্দর পর্য্যন্ত রেল রাস্তা প্রস্তুত হইবে।

২০শে বুধবার—অদ্য প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ ছিদামাপুরী অভিমুখে যাত্রা

করতঃ বেলা ১২ টার সময় পথিস্থিত একটী ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলাম; তথায় মধ্যাহ্নিক আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ পুনরায় রওয়ানা হইয়া বিকালে ৫টার সময় পোরবন্দরে উপস্থিত হইলাম, তথায় একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ রাত্রি কাটাইলাম।

২২শে বৃহস্পতি বার—অদ্য ভোরে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে ঠাকুর ছিদামাজীকে দর্শন জন্য রওয়ানা হইয়া যথা সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় ঠাকুরদর্শন ও চরণামৃত গ্রহণ করতঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বিকালে সহর পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম। পুনরায় সন্ধ্যার সময় পূজা আরতি দর্শন করিয়া যথাসময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ঠাকুর সুদামের নামেই স্থানের ছিদামপুরী বা সুদামাপুরী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে, গোলকে রাসমণ্ডলবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবক ও প্রধান ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত সুদাম। একদা ভক্তাধীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামকে দ্বাররক্ষক রূপে নিযুক্ত রাখিয়া ভক্তিমতী গোপীকা শ্রীমতী বিরজার কুঞ্জে গমন করেন, সেই সময়ে প্রেমময়ী মুলাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা অতর্কিতভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া, বিরজার কুঞ্জে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হন; সুদাম দ্বার ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করেন। এদিকে বিরজাদেবী শ্রীরাধার ভয়ে নদীরূপা হইয়া গোলোকের চারিদিকে প্রবাহিতা হইলেন। তাহা হইতেই সপ্ত সাগরাও নব নদীর উৎপত্তি। শ্রীরাধা কোপভরে সুদামকে অভিশাপ প্রদান করিলেন সেই শাপে সুদামা শঙ্খচূড় দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুদামাও শ্রীরাধিকাকে শতবর্ষব্যাপী শ্রীকৃষ্ণবিরহের অভিশাপ প্রদান করেন এতদ্ব্যতীত সুদামার প্রেমিকা গোপিকার তুলসী রূপে জন্মগ্রহণ, তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহ, শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শঙ্খচূড়ের বিষ্ণুকবচহরণ ও শঙ্খচূড়বেশে তুলসীর সতীত্বনাশ, ত্রিশূলীর শূলে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু, দেবগণের শান্তি, সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত শঙ্খচূড়ের অস্থি হইতে শঙ্খাদির উৎপত্তি, তুলসীর তুলসীবৃক্ষে ও গণ্ডকী নদীতে পরিণতি তুলসী, শঙ্খ ও গণ্ডকী নদীস্থিত নারায়ণ শিলা একত্র সমাবেশে ভূতলে গোলোকের সৃষ্টির অনুজ্ঞা ইত্যাদি আখ্যায়িকা পুরাণে বর্ণিত আছে

আবার দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাভিনয় সময়েও সুদামাগোপ গোলোক হইতে গোপগৃহে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের প্রিয় পার্শ্বচর হইয়াছিলেন। যখন ভগবান দ্বারকা প্রয়াণ করিলেন, তখন পরমভক্ত সেবকশ্রেষ্ঠ সুদামাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তদবধি ঠাকুর সুদামা সস্ত্রীক এই স্থানেই পূজিত হইয়া আসিতেছেন। প্রাচীন সুদামামন্দির কালে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহারই স্থানে বর্ত্তমান রাণার পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক ১৫ হাজার টকা ব্যয়ে এই নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; রাণা স্বীয় রাজ্যমধ্যে নোট প্রচলন করতঃ এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ইহারও তোরণ দ্বার; অঙ্গন, মণ্ডপ, বিমান ও চূড়া বিদ্যমান। মন্দিরের মণ্ডপ মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত, চূড়ার উপর স্বর্ণ ধ্বজা, এই ধ্বজাটী নেপালের স্বাধীন হিন্দু নরপতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরগর্ভে

ঠাকুর সুদামা ও সুদামা পত্নীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। আমরা পূজা আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

পথ-প্রদর্শন।

এ ভব-জলধি মাঝে মোহাবর্ত্তে পড়ে
পথভ্রান্ত দিশেহারা জীবন তরণী
কাণ্ডারীবিহীন হ'য়ে কাল স্রোতে ভেসে,
যেতেছিল কোন পথে; কে বলিতে পারে ?
হেনকালে তুমি দেব পতিতপাবন
অহৈতুক কৃপাসিন্ধু কাণ্ডারী সাজিয়ে
লক্ষ্যপথে চালাইয়ে এ জীবনতরী
করিয়াছ নিজগুণে পথ-প্রদর্শন।

রাজচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

—:0:—

প্রেমে সমাধি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার শারদীয় পূজা আসিয়াছে; আবার বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে মায়ের ভক্তের ভক্তি নাচিয়া নাচিয়া মায়ের শ্রীপদে মিশিতে চলিয়াছে। মানসের শত শতদল, পল্বলের বিকশিত উৎপল হাসিয়া হাসিয়া আবার মায়ের শ্রীপদে উৎসর্গীকৃত হইতে চলিয়াছে। জগত হাস্যময়; ঘরে বধূ হাসিতেছে দীর্ঘপ্রবাসের পর স্বামী আসিবেন বলিয়া,—ক্রোড়ে সন্তান হাসিতেছে নাচিতেছে নূতন কাপড় নূতন জামা নূতন খেলেনা পাইবে বলিয়া,—ভক্ত হাসিতেছে, আবার মায়ের অমৃতোপম মধুর মুখখানি দেখিতে পাইবে বলিয়া,—আর জগৎ হাসিতেছে তাহার বহুদিন-বাঞ্ছিত মাকে ক্রোড়ে পাইবে বলিয়া—। জোৎস্না তাহার কলধৌত প্রবাহবৎ হাসি ছড়াইয়া দিয়া জগতকে আরও হাসাইয়া তুলিয়াছে। হরু ঠাকুর শাক্ত। প্রতিবৎসরই মায়ের পূজা করেন। পূর্ব্বে স্বর্ণপ্রতিমা বধূ মহামায়া গৃহে ছিল, ভুবনমোহিনী স্ত্রী সতীলক্ষ্মী দুর্গাবতী গৃহে ছিল, পূজা করিতে হরুঠাকুরের কোনও কষ্ট হইত না। এবার পূজা কে করিবে ? বধূ, স্ত্রী, পুত্র কৃষ্ণধন কেহই তো নাই। হরুঠাকুরও মহামায়ার ইহলোক ত্যাগের পর হইতেই কেমন এক অভাবনীয় ভাবে বিভোর; সংসারের কোনও কাজ করিতে পারেন না। বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ হইয়াছে; অন্তরিন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া কেবলই মাকে ডাকেন। আহার করিতে পারেন না;

বিহারের ক্ষমতা নাই। শয্যায় শুইয়া কেবল মায়ের নামে বিভোর। অশ্রুধারা অলক্ষিতে উপাধান ভিজাইয়া দেয়। কেহ খাওয়াইয়া দিলে খান, তাঁহাও বড়ই অনিচ্ছার সহিত। সময় সময় খাইতে খাইতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যান। হাতের গ্রাস হাতেই থাকে, মুখে তুলিয়া দিতে আর মনে থাকে না। দিনের পর দিন যাইতেছে, তাঁহার শরীর ও ক্রমেই রুগ্ন হইয়া পড়িল। শয্যা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা একেবারে তিরোহিত হইল। শারদীয় পূজার সময় তাঁহার শারীরিক অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। শিষ্যেরা দেখিল বড় বিপদ, ঠাকুর এমত অবস্থায় থাকিলে তো আর তাঁহা দ্বারা এবার পূজার সম্ভাবনা নাই। পূজা না হইয়া পারে না। এতকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে, এতকাল যেখানে মায়ের আবাহন হইয়াছে, এবার তাহা না হইয়া পারে না। আমরা থাকিতে ঠাকুরের অভাব কি? অমরা তাঁহার সন্তান স্বরূপ, যাহাঁর এত সন্তান তাঁহার ঘরে পূজা হইবে না এটা কি সম্ভবপর কথা? ঠাকুরের হইয়া আমরা পূজা করিব। কৃষ্ণধন সংসার ত্যাগ করিয়াছে, আমরা তো আছি; মহামায়া, দুর্গাবতী পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের স্ত্রী, আমাদের মা তো আছেন। তবে আর ভাবনা কি? মায়ের পূজা হইবেই; মায়ের কৃপা হইলে, ঠাকুর তাঁহার আবাহন করিতে পারিবেনই। ঠাকুরের অনুমতি লইয়া আমরাই পূজা করিব।

সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী একত্র হইয়া হরুঠাকুরের কাছে গেল। হরুঠাকুর আনন্দ মনে মায়ের পূজার অনুমোদন করিলেন। অনুমোদন করিবার সময় বড়ই কাঁদিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, ভাবিয়াছিলাম এবার মায়ের পূজা হইবে না, কৃপাময়ী মা আমার, আমার উপর অসীম কৃপাকরিয়া তাঁহার কাজ তিনিই করিয়া লইলেন। আমি কি করিব? আমার করিবার ক্ষমতা কৈ? তাই তিনি ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিজেই করিয়া লইলেন। জগতে এইরূপই হয়। যাহার কেহ নাই তিনি তাঁহার; যাহার পিতা নাই তিনি তাহার পিতা,—যাহার মাতা নাই তিনি তাহার মাতা,—যাহার বন্ধু ভ্রাতা কেহই নাই তিনিই তাহার বন্ধু তিনিই তাহার ভ্রাতা,—তিনিই তাহার সকল। জয় হউক মা, আজ সর্ব্ববিশ্ব তোমার জয় ঘোষণা করুক।

শিষ্যেরা মায়ের মনোমোহিনী প্রতিমা গঠন করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মায়ের পূজা আরম্ভ হইল। হরিপ্রাণের কিছুই করিতে হইল না, শিষ্যেরা সকলই করিয়া লইল। ভক্তের গৃহে মা আসিলেন, আবার আনন্দের রোল পড়িয়া গেল; বঙ্গের গৃহে গৃহে আবার আনন্দের শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রতি-পূজার সান্ধ্য আরতির সময় এক এক বার হরিপ্রাণ মায়ের মন্দিরে গমন করেন। শরীর বড়ই দুর্ব্বল, কিন্তু অধিক আনন্দের আবেশে সময়ে সময়ে সে দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়, তাই হরিপ্রাণ উন্মত্তের মত মায়ের মন্দিরে ছুটিয়া যান। সে ভাবোন্মাদ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে সাহসী হয় না।

আজ মহাষ্টমী। দলে দলে লোক হরি-প্রাণের পূজার অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র কণ্ঠে আবার বাজিয়া উঠিয়াছে— "সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে

ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।” সহস্র সহস্র কণ্ঠে আবার মায়ের জয় জয়কার ধ্বনিত হইতেছে। হরিপ্রাণ আজ উন্মত্ত, কি এক আবেশে তিনি অচেতনপ্রায়। কোথায় আর সে দুর্ব্বলতা, কোথায় সে অক্ষমতা,—আজ তিনি পূর্ণ সবল, আজ তিনি পূর্ণ-ক্ষম, ক্ষণে,—হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন, ক্ষণে—অট্ট অট্ট হাস্যে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। লম্ফে লম্ফে পূজার মন্দিরে ছুটিয়া যাইতেছেন, পূজার অঙ্গনে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া শরীরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিয়া যাইতেছেন। যখন মহাষ্টমীর সান্ধ্য আরতির মধুর বাজানা বাজিয়া উঠিয়া নিস্তব্ধ পৃথিবীকে আবার কম্পিত করিয়া তুলিল, যখন কাঁশর ঘণ্টার মধুর ধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সমস্ত বিশ্ব একটা মহাপ্রাণতার স্রোতে ভাসাইয়া দিল, তখন হরিপ্রাণ ভাবে বিভোর হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন, দুই বাহু তুলিয়া, চক্ষে পবিত্র প্রেমাশ্রু ছুটাইয়া ‘মা’ ‘মা’ রবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। সে নৃত্য যে দেখিল সেই বলিল, এ নৃত্য ভাব নৃত্য, এ নৃত্য অমর জগতের নৃত্য, এমন নৃত্য আর দেখি নাই। যে দুর্ব্বল শরীর এ ঘর হইতে ও ঘর যাইতে সক্ষম হইত না, সেই শরীরে আজ হরিপ্রাণ প্রায় দুই ঘণ্টা সমান ভাবে নৃত্য করিয়াছেন এটা কি কোনও বিশেষ শক্তির আবেশ ছাড়া হইতে পারে? শিষ্যেরা চারিদিকে দণ্ডায়-মান, কি করিবে, সে অঙ্গে কেহ হাত দিতে সাহসী হইল না। তাহারা বিস্ময়পূর্ণনেত্রে কেবল সে তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে হরিপ্রাণ হঠাৎ পড়িয়া গেলেন। শিষ্যেরা দেখিল তিনি অজ্ঞান হইয়াছেন; পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়াছেন কি তৎপূর্ব্বেই অজ্ঞান হইয়াছেন কে বলিবে। সেই অজ্ঞান অবস্থায়ই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তাহারা ঘরে লইয়া গেল। ঘরে নিয়া সেবা করিতে কেহই কম করিল না, কিন্তু করিলে কি হইবে, সে নিমীলিত নেত্র সেদিন আর উন্মীলিত হইল না। নবমী চলিয়া গেল, তবুও সে অজ্ঞানতা ভাঙ্গিল না। খাইতে দিলে মুখ বাহিয়া পড়িয়া যায়, তাহারা শলিতা দ্বারা মুখে দুগ্ধ দিতে লাগিল। তাহাও তিনি গিলিতে পারিলেন না, কেবল গলাই ভিজিল।

হরিপ্রাণ এই অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতেছেন তাঁহার মাকে; মায়ের ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন, প্রাণ মন দেহ কাহারও কথাই মনে নাই। আর এক দিন প্রায় এই রকম দেখিয়া-ছিলেন, তাহা গঙ্গার ঘাটে। আজও আবার সেই মূর্ত্তি,—সেই তাঁহার পুত্রবধূ মহামায়ার মূর্ত্তি যেন অনন্ত আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার মন্দিরে গঠিত মূর্ত্তিতে আবিষ্ট হইল। আবিষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, বলিল, আমার সঙ্গে যাবি? আমার কাছে থাকিবি? হরিপ্রাণ যেন বলিলেন,—বড় আনন্দে যেন বলিলেন যাইব। দেবী বলিলেন,—তবে কাল চলিও, কাল আমি যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে লইয়া যাইব।

দশমী পূজা হইয়া গেল, প্রতিমা বিস-র্জ্জিত হইল। সেই বিসর্জ্জনের সংগে সঙ্গেই

আবার অন্দর মহলে কান্নার রোল উঠিল। হরিপ্রাণ মরিয়াছেন। সংসারের সমস্ত জ্বালা, সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া হরিপ্রাণ আজ অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বঙ্গের একটী নন্দনকানন পুষ্পহীন হইল,—বঙ্গের একটী ক্ষুদ্র পবিত্র সংসার মহামায়ার অনন্ত মায়ায় যেন মহাসাগরের গর্ভে চিরতরে লুকাইল। ক্রমশঃ।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—:0:—

সাধক—সঙ্গীত।

(১২)

কিসে চা'স রে কুল। ক্ষেপা বাপ তোর ক্ষেপী মা, তা হয়েছে কি ভুল॥

পিতা যে তোর ঘোর সন্ন্যাসী,—
মাতা যে তোর তাঁর প্রেয়সী,
সে বাপ মায়ে গৃহি-সুতে
হয় কি অনুকুল॥

তোর মনের সাধ রাজ্যপাটে, পিতা রয় শ্মশান ঘাটে,
মা পাগলী রয় না ঘরে, পেলে বিল্বমূল—

তোর সদাই সাধ জাগে প্রাণে
স্বর্ণ কুণ্ডল প'রতে কানে
বাপ পরে তোর কে না জানে
বন ধুতুরার ফুল॥

ক্ষেপা ক্ষেপীর নাই কুলাচার করে না কুল মানের বিচার,
দুকুলে কেউ থা'ক্‌লে কি কেউ ত্যাগ করে দুকুল॥

তবু যদি থা'কতো মায়া
পেতিস্ কুল তরুর ছায়া
তা নয় মা যে খড়্গধরা
বাপ ধরে ত্রিশূল॥

বিমাতা তোর দিবে রে পথ হয় না বিশ্বাস ক'রলে শপথ,
বাপ তাঁরে রেখেছে জটে তাইতে সে ব্যাকুল।—

জটায় পেঁচে থেকে তিনি
নিজেই পথহারা ত্রিপথগামিনী
তোরে কুল দিবে কি আপনি।
করে কুল কুল ॥

মন তুমি কুল যদি চাও, বিবেক শ্মশান আশ্রমে যাও,
কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগে মাখ মোহ ভস্ম—ধূল।

ভক্তি কাঁথা প্রেমের ঝুলি
লও রে জ্ঞানের স্কন্ধে তুলি
গোবিন্দ ! তোর কুলের দায়িক
শ্রীনাথ দত্ত মুল ॥

———:0:———

যোগপ্রক্রিয়ায় রোগারোগ্য।

জগদ্রঞ্জনকারিনী জগদ্রূপিনী যোগমায়া সৃষ্টিকার্য্যে মনুষ্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বসুখে সুখী করিয়াছেন। তাহার অপার কৃপায় মানবের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। অভাবময় জগতে একমাত্র মনুষ্যই আত্মশক্তিতে সর্ব্ব অভাব পূরণ করিতে পারে। আত্মশক্তি আয়ত্ব করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে পুঞ্জীকৃত নানা কার্য্যময় কর্ম্মক্ষেত্রে সকলকার্য্যেই সুফল লাভ করতঃ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কাল যাপন করা যায়। বিশ্বপাতা বিধাতা মনুষ্যের জন্ম সময় দেহের সঙ্গে এমন চমৎকার কৌশলপূর্ণ অপূর্ব্ব উপায় করিয়া দিয়াছেন যে,তাহা জানিতে পারিলে কার্য্যনাশ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও রোগভোগ করিতে হয় না। সাধারণে সেই অপূর্ব্ব তত্ত্ব ও কৌশল জানে না। এই সকল বিষয় হিন্দুদিগের যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার নাম যোগশাস্ত্র। এই যোগশাস্ত্র যেমন দুর্লভ, যোগজ্ঞ গুরুও তেমনই অভাব। যোগশাস্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। আমরা এই শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় পদে পদে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাই আর্য্য-দর্পণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠকগণের অবগতির জন্য যোগ প্রক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের কৌশল আমরা ক্রমশঃ এই পত্রিকায় আলোচনা করিব।* আলোচ্য বিষয়গুলি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন। আমরা সকলকেই এই বিষয়গুলি পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

---

*এই প্রবন্ধ বহু পূর্ব্বে সংগৃহীত হইলেও এই বৎসর প্রবন্ধাধিক্যে আমরা যথাসময়ে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এখন হইতে প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে এই প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

সঃ আঃ—সঃ

যোগসাধনায় শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া-বিশেষ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যেমন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ হয়, তেমনি শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে প্রত্যেক কার্য্যে সুফল লাভ করিতে পারা যায়; ভাবী বিপদ আপদ ও মঙ্গলামঙ্গল জানিতে পারা যায়। প্রত্যহ নিজের সুখ দুঃখ ও ভাবী রোগের আক্রমণ প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় বুঝিতে পারাযায়; এক পক্ষ মধ্যে নিজ দেহে কোন পীড়া হইবে কিনা, তাহাও জানিতে পারা যায়। কাজেই বিনা-ব্যয়ে ও স্বল্পায়াসে পীড়ার হস্ত হইতে পরি-ত্রাণ পাওয়া যায়; রোগপীড়ায় ভুগিতে ও অনর্থক অর্থব্যয় করিতে হয় না।

অনিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা যেমন মানব দেহে রোগোৎপত্তি হয়, তেমনি ঔষধ ব্যবহার না করিয়াও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা রোগ নিরা-ময়ের উপায় বিধাতা কর্ত্তৃকই নির্দ্ধারিত আছে। আমরা ভগবানপ্রদত্ত সেই সহজ কৌশল জানি না বলিয়াই দীর্ঘকাল রোগভোগ ও অনর্থক চিকিৎসককে অর্থ দিয়া থাকি। আমি দেশ-পর্য্যটনকালে সিদ্ধযোগী মহাত্মাগণের নিকট হইতে বিনা ঔষধে রোগ শান্তির সুকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলাম; পরে বহু পরীক্ষায় তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া সাধারণের উপকারার্থে সেই অপূর্ব্ব যোগের কৌশলগুলি প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ পশ্চাল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবেন; দীর্ঘকাল রোগে যন্ত্রনা ভোগ, অর্থব্যয় কিম্বা ঔষধ দ্বারা উদর বোঝাই করিতে হইবে না। আরও সুসংবাদ এই যে যোগকৌশলে একবার আরোগ্য হইলে সে রোগ আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন। পাঠক-গণ! অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করিবেন না। পশ্চাল্লিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিয়া দেখুন, প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন এবং অসীম জ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান দেখিয়া মোহিত হইবেন। বাস্তবিক সকলের প্রয়োজনীয় ও এরূপ প্রত্যক্ষফলদায়ক শাস্ত্র হিন্দু-ঋষি ভিন্ন, আর অন্য কোন জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যোগশাস্ত্রানুযায়ী নিঃশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে, কোন পীড়া হইবে কি না অগ্রে জানিতে পারা যায় এবং বিনা ঔষধে, বিনা কষ্টে রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, আমরা [illegible] যুক্ত উপদে-ষ্টার [illegible] উপযুক্ত [illegible] বঞ্চিত বলিয়া অসীম জ্ঞানসম্পন্ন [illegible] ও শকর্ম্মগ্য, নগণ্য হইয়া [illegible] শোকে দুঃখে [illegible] করিতেছি।

যেমন ক্ষেত্রে শস্য রোপিত করিতে হইলে, প্রথমে নানা প্রকার উপায়ে ক্ষেত্রখানিকে শস্যোৎপত্তির উপযোগী করিয়া লইতে হয়, নচেৎ উক্ত বীজ শস্যোৎপাদনে সমর্থ হয় না; তেমনি যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে যোগানুষ্ঠা-নের এই ক্ষেত্র দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে সুসংস্কৃত এবং যোগানুষ্ঠানের উপযোগী করিয়া লইতে হয়, নতুবা শত সহস্র পরিশ্রমেও কোন ফল লাভের আশা নাই। এই নিমিত্তে যোগাচার্য্যগণ প্রথমে হঠযোগের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব হঠসোপানের ক্রিয়া অবলম্বন করতঃ উর্দ্ধবর্ত্তী রাজযোগ-সোপানে আরোহন করিতে হইবে। যদিও হঠযোগ

ও রাজযোগ সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, কিন্তু হঠ-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ হঠশাস্ত্রের অভ্যন্তরেও রাজযোগ বিদ্যার কিছু কিছু সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। হঠযোগ ঘটশোধন অর্থাৎ দেহ-শোধন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। যথাঃ—

আমকুম্ভ ইবাম্ভোস্থং জীর্য্যমানং সদা ঘট।
যোগানলেন সংদহ্য ঘটং শুদ্ধিং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ মানবের শরীর কাঁচা ঘট আর জীবন জল স্বরূপ; যেমন মৃত্তিকার কাঁচা ঘটে জল রাখিলে ঘট নিশ্চয় গলিয়া যায়, কিন্তু আগুনে পুড়াইয়া জল রাখিলে আর কোন আশঙ্কা নাই; তদ্রূপ জীবন রূপ জলে কখন দেহ-ঘট গলিয়া যায় তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু যোগানলে দেহঘট সংদহ্য করিলে সত্বর ঘট-ভঙ্গের ভয় থাকে না। তাই সর্ব্ব প্রথমেই হঠ-যোগের ব্যবস্থা। ফলকথা যাহাতে দেহটী যোগানুষ্ঠানে বিশেষরূপে সমর্থ হয়, তাহারই উপদেশ হঠযোগের মুখ্য বক্তব্য বিষয়। ইহাতে দেহ শোধন, প্রধান নাড়ী ও আধারাদির কথা সহ শরীরতত্ত্ব এবং আসন মুদ্রাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদিগের সংগৃহীত রোগারোগ্যের প্রক্রিয়াগুলিও হঠ-যোগের অন্তর্গত, অথচ পদ্ধতিগুলি অতি সহজ ও সুখসাধ্য এবং কোন প্রকার আশ-ঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু লিখিত নিয়ম ও উপদেশ মত কার্য্য করা চাই। নিজে নিজে ওস্তাদি এবং Principle খাটাইতে গেলে ফল পাইবেন না। আর লিখিত ক্রিয়াগুলি যোগের সামান্য সামান্য অঙ্গ মাত্র, সুতরাং শারীরিক সুফল ব্যতীত কেহ যেন ইহাতে আধ্যাত্মিক ফললাভের আশা করিবেন না; কিম্বা যোগী বলিয়া নিজকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবেন না। যাঁহারা অজ্ঞান-মলিন পৃথি-বীতে পূর্ণজ্ঞান প্রভার বিমল আলোকচ্ছটা আকাঙ্ক্ষা করেন, অচঞ্চল অনন্ত আলোকাধার সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মহা আলোকময় মহা-পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহাদের মহাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইবার নহে। আমাদিগেরও সেরূপ স্পর্দ্ধা নাই; কেবল নানারোগ-গ্রস্ত ভ্রাতৃবৃন্দের শারীরিক স্বাস্থ্য ও রোগারোগ্যের আশায় অমূল্য যোগশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নতুবা অধ্যাত্ম-যোগোপদেশ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

বাতসার। নিজ ওষ্ঠ যুগল কাকের ঠোঁটের ন্যায় করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করতঃ উহা জঠর মধ্যে পরিচালিত করিয়া পুনরায় মুখ দ্বারা রেচন করিবেন। অর্থাৎ ঠোঁট দুখানি সরু করিয়া বহির্বায়ু আকর্ষণ করিবেন; এইরূপে আপন আপন দম্‌ভোর টানিয়া মুখবন্ধ করতঃ ঢোক গিলিয়া ঐ বায়ুকে উদরে চালনা করুন; পরে ঐ বায়ুকে উভয় নাসাপথে রেচন করিবেন। শ্বাস বায়ু রেচন ও পূরক কালে অবিচ্ছিন্না গতি হওয়া চাই। এইরূপ নিয়মে পুনঃ পুনঃ মুখ দিয়া টানিতে ও নাসিকা দ্বারা ছাড়িতে হইবে। প্রত্যহ দিবারাত্রের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারিবার পাঁচ সাত মিনিট স্থিরভাবে বসিয়া এই ক্রিয়া অভ্যাস করিবেন। ফলে যত বেশীবার ঐরূপ করিতে পারিবেন, ততশীঘ্র সুফল লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ময়লা, আবর্জ্জনাদি পূর্ণ দূষিত-স্থানে, বৃক্ষতলে, কেরোসিন তৈল দ্বারা আলোজ্বালিত গৃহে ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে এই ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। খোলা জায়গায়—বিশুদ্ধ বায়ু

পূর্ণ স্থানে স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ক্রিয়ান্তে হাঁপাইতে না হয়, এরূপ মৃদুভাবে শ্বাসের ক্রিয়া করিতে হইবে।

এই ক্রিয়া শরীরের নির্ম্মলতা সাধন করে, যাবতীয় রোগ দূর করে এবং ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ যথানিয়মে সরস বায়ু পান করেন, শ্রম, দাহ, জরা, রোগ কিছুই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। ইহাতে ক্ষয়রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। এবং কফ-পিত্তাদিরোগ জন্মিতে পারে না। যথানিয়মে কিছুদিন অভ্যাসে রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর কন্দর্প সদৃশ কান্তি-বিশিষ্ট হইবে। চর্ম্ম-রোগ প্রভৃতি রোগে রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবহার না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে এই ক্রিয়া করিয়া দেখিবেন, সালসাপেক্ষা স্থায়ী সুফল লাভ করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় দুর্জ্জয় শূলবেদনা ও বুকে পিঠে, পেট প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যে কোন স্থানে বেদনা থাকিলে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই ক্রিয়াটী আমাদিগের বহু পরীক্ষিত।

বারিসার। মুখ দ্বারা আকণ্ঠ সলিল পূর্ণ করতঃ ধীরে ধীরে উহা পান করিবেন এবং কিয়ৎকাল উদর মধ্যে রাখিয়া শেষে অধোপথ দ্বারা ঐ জল রেচন করিবেন। প্রত্যহ এই বারিসার ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মলদেহ বিশুদ্ধ হইয়া দেবদেহ তুল্য হয়। এবং জরা আক্রমণ করিতে পারে না।

অগ্নিসার। নিশ্বাস রুদ্ধ করতঃ মেরু পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ নাভিগ্রন্থি সংযুক্ত করিবেন। স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া একশত বার এইরূপ করিতে হইবে। প্রত্যহ এই প্রক্রিয়া করিলে উদরজাত রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ইহার সুফল বহু লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে।

জিহ্বা শোধন। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় একযোগে গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশিত করতঃ জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ নবনীত দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন ও দোহন করিতে হয়, আর লৌহ যন্ত্র অর্থাৎ চিম্‌টা দ্বারা জিহ্বাগ্র পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিবেন। প্রতিদিন প্রভাতে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে সযত্নে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবেন। প্রত্যহ এই প্রকার আচরণ করিলে ক্রমে ক্রমে শ্লেষ্মাদোষ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং জিহ্বা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। কপাল-রন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র, ও দন্তাদির যথারীতি শোধনও শরীরের পক্ষে মহোপকারী।

দণ্ড-ধৌতি। রম্ভাদণ্ড (কলার মাইজ), হরিদ্রা দণ্ড বা বেত্রদণ্ড হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে পুনঃ পুনঃ প্রবেশিত করাইয়া শনৈঃ শনৈঃ বাহির করিবেন। প্রত্যহ প্রাতেই ইহা অভ্যাস করিতে হয়। এই দণ্ডধৌতি আচরণ করিলে উর্দ্ধমার্গ (মুখ) দ্বারা শ্লেষ্মা পিত্ত, ক্লেদ প্রভৃতি নিষ্ক্রান্ত হয় এবং হৃদ্রোগ ধ্বংস হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

বমন-ধৌতি। প্রত্যহ ভোজনাবসানে সুবুদ্ধিব্যক্তি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া জল-পান করিবেন। পরে কিয়ৎক্ষণ উর্দ্ধলোচনে নির্নিমেষ চাহিয়া থাকিয়া বমনপূর্ব্বক সেই

জল নির্গত করিবেন। প্রতিদিন এই ধৌতি অনুষ্ঠান করিলে শ্লেষ্মা ও পিত্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং অজীর্ণ, উদরাময়াদি রোগ জন্মিতে পারেনা। অম্লরোগীর পক্ষে ইহা মহদুপকারী।

বাসোধৌতি। চতুরঙ্গুল-বিস্তৃত অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার বস্ত্র ধীরে ধীরে গ্রাসকরতঃ পুনরায় তাহা বহির্গত করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রথম অভ্যাস কালে একহাত দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড গ্রাস করিবেন, তদপর ক্রমে ক্রমে ঐ বস্ত্রের দীর্ঘতা পঞ্চদশ হাত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হইবে। কিছুদিন অভ্যাস করিলে গুল্ম, জ্বর প্লীহা, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাশ, কফ, পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং দিন দিন আরোগ্য বল ও পুষ্টিসাধন হইতে থাকে।

ধৌত ক্রিয়ানুষ্ঠানের পূর্ব্বে দণ্ড বা বস্ত্রে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত মাখাইয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বস্তিযোগ। নাভিমগ্ন সলিলে পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ পূর্ব্বক গুল্‌ফ যুগলকে নিরালম্বভাবে শূন্যমার্গে উত্তোলিত করতঃ অবস্থিতি করিবেন্ এবং ঐ গুল্‌ফ যুগলের উপর গুহ্যদেশ রাখিবেন। তৎপরে ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ গুহ্যদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে হয়। প্রত্যহ এই ক্রিয়া অভ্যাস করিলে প্রমেহ, উদাবর্ত্ত ও ক্রূরবায়ু বিনাশ পায়। অভ্যাসকারী সুস্থকায় ও মদনতুল্য হইতে পারেন। আর জলমধ্যে পশ্চিমোত্তান আসনে অর্থাৎ পদদ্বয় ভূতলে দণ্ডাকারে সরল ভাবে প্রসারিত করিয়া হস্তদ্বয় মধ্যে শিরোদেশ বিন্যস্ত করতঃ অশ্বিনী মুদ্রাযোগে মূলাধার পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলে কোষ্ঠদোষ ও আমবাত বিদূরিত হয় এবং জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, ইহা সাধন দ্বারা গুল্ম, প্লীহা, উদরী, বাতপিত্ত শ্লেষ্মাজনিত রোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

নেতিযোগ। অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ সূক্ষ্ম সূত্র নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইয়া পরে উহা বদন বিবর দ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবেন। প্রত্যহ নেতিযোগের অনুষ্ঠানে শ্লেষ্মদোষ বিনাশ পায় এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে।

লৌলিকী যোগ। বেগ সহকারে উদরকে উভয় পার্শ্বে ভ্রামিত করিতে অভ্যাস করিলে রোগরাশি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় এবং দেহাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রাটক যোগ। যাবৎ নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুপতন না হয়, তাবৎ নির্নিমেষ নয়নে কোন সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাকিবেন। ইহাতে চক্ষুর পীড়া বিনষ্ট হয় এবং দৃষ্টিরনির্গমন প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া দেবদৃষ্টি জন্মে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে মুখের মধ্যে যত জল ধরে তত জল রাখিয়া অন্য জল দ্বারা চক্ষুতে বিশবার ঝাপটা দিয়া ধুইয়া ফেলিবেন। প্রত্যেক দিন দুই বেলা আহারান্তে আচমন সময়ে অন্ততঃ সাত বার চক্ষুতে জলের ঝাপটা দিবেন। যত বার মুখে জল দিবেন, তত বার চক্ষু ও কপাল ধুইতে ভুলিবেন না। প্রত্যহ স্নান কালে তৈলমর্দ্দনের পূর্ব্বে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তৈল দিবেন

এই কয়েকটী নিয়মই চক্ষুর বিশেষ উপকারী ইহাতে দৃষ্টিশক্তি সতেজ ও চক্ষু স্নিগ্ধ থাকে এবং চক্ষুর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যোগশাস্ত্রের বর্ণিত আসন গুলিও রোগ-নাশক। পদ্মাসন, ভদ্রাসন, সিংহাসন এবং ভুজঙ্গাসন অভ্যাস করিলে শরীরস্থ অগ্নি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগ রাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। আসন গুলি হাতে-কলমে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করিতে হয়। আমরাও শিক্ষা দিতে সম্মত আছি।

এক্ষণে মুদ্রা ও বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে যে উৎকটরোগাদি বিনাশ পায়, তদালোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পাঠক-গণকে শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অতীব কর্ত্তব্য। যোগক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কারণ—

কায়া নগর মধ্যেতু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ।

দেহনগর মধ্যে বায়ুই রাজা স্বরূপ। সুতরাং বায়ুতত্ত্ব অবগত হলেই স্থূল দেহের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। ভৌতিক দেহে যত প্রকার শারীরিক কার্য্য হইয়া থাকে, তৎসমস্তই বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এক চৈতন্যের সাহায্যে এই জড়দেহে বায়ুই জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। অতএব বায়ু সম্বন্ধে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের বিষয় আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ।)

—0—

চির-বাঞ্ছিত।

যাহার লাগিয়া বিদেশ ভ্রমিনু,
সহিনু কতই ক্লেশ,
কত জনে পুছি' না পেনু সন্ধান
না বুঝিনু কৃপালেশ;—
অবশেষে হায়! চমক ভাঙ্গিল
বুঝিনু মরমে মরমে—
আপনার হ'তে আপনার হয়ে
রয়েছ জীবনে-মরণে।

না চাহিতে তোমা হৃদয় জুড়িয়া
পাতিয়াছ অধিকার;
আমি অবহেলি দূরে গেছি চলি
তোমার সীমার পার।
হাত ধরে তুমি ডাক বারে বারে
'ফিরি এস পুনঃ' বলিয়া;
না জানি কোন্ কুহকে পড়িয়া
আমি তত যাই চলিয়া।

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—:0:—

উপদেশ সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১১। এ জগতে প্রত্যেক গৃহই গোলোক-ধাম, কেননা তাহাতেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাব বিদ্যমান আছে।

১১২। প্রত্যেক পরিবারকেই কৈলাস-ধামও বলা যাইতে পারে,—তাহাতে শিব-শক্তির বিকাশ আছে; গৃহস্বামী-শিব, আর গৃহিণী শক্তি।

১১৩। এই দেহ বৃক্ষবিশেষ, পিতা বীজ মাতা ক্ষেত্র; পিতা মাতৃগর্ভে বীজ রোপণ করেন, সেই বীজ মাতৃগর্ভে অঙ্কুরিত হইয়া সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। মানবের কর্ম্মই এই বৃক্ষের বিকাশ; তাহা হইতে আবার পুত্র কন্যাদিরূপ ফল ফুল হইয়া বৃদ্ধি পায়।

১১৪। প্রত্যেক গৃহিণীই অন্নপূর্ণা এবং সন্ন্যাসী শিব। সন্ন্যাসী ভিক্ষাচ্ছলে গৃহিণীতে অন্নপূর্ণার ভাব বিকাশ করিয়া দেন; সেই জন্যই সন্ন্যাসীদিগকে বিমুখ করা হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

১১৫। সহজ ভাব ভাঙ্গিও না, শুধু তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাক, তাহাতেই তাঁহাকে পাইবে।

১১৬। সদ্গুরু লাভ করতঃ যা খুসী তাই কর, কিন্তু সাবধান তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না; সময় হইলে তিনিই টানিয়া লই-বেন।

১১৭। যোগ যাগও মুক্তির কারণ না হইয়া বন্ধনের কারণ হয়।

১১৮। জড় কিম্বা মায়া + চৈতন্য = সৃষ্টি।

১১৯। জীব অহংজ্ঞানে কর্ম্ম করে বলিয়া ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

১২০। সাধনা চারি প্রকার—ফুল, বিল্ব-পত্র প্রভৃতি উপকরণে প্রতিমা পূজা—শূদ্র ভাবে সাধনা, জীবসেবা,—যেমন তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ইত্যাদি বৈশ্য-ভাবে সাধনা; আততায়ীর হস্ত হইতে নিগৃহী-তকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ভাবে সাধনা; আর অজ্ঞানকে জ্ঞান দান ব্রাহ্মণভাবে সাধনা।

১২১। যার চিত্ত যত স্থির, তিনি তত টুকু ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন।

১২২। গৃহী সন্ন্যাসীর অতি আদরের পাত্র; আবার সন্ন্যাসী গৃহীর পূজ্য।

১২৩। বিনয়ই ধর্ম্মের ভিত্তি,—দয়া ধর্ম্মের মূল; আর অভিমান নরকের মূল।

১২৪। অন্যের সন্তোষবিধানই দয়া।

১২৫। অপরাধীর অপরাধের শাস্তি দিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শাস্তি না দেওয়াকেই ক্ষমা বলে। প্রবলই ক্ষমা করিতে পারে; ক্ষমা করিবার অধিকার দুর্ব্বলের নাই।

১২৬। গৃহী সন্ন্যাসীর নিকট সর্ব্বদাই ক্ষমনীয়।

১২৭। নামের স্ফুরণ না হইলে কেহই নাম নিতে পারিবে না। নামের বিকাশের জন্যই নাম গ্রহণ, তাহা নির্জ্জনে নেওয়াই উচিত।

১২৮। যেমন স্বামীসোহাগিনী যুবতী স্বামীর নাম নিতে পারে না, স্বামীর নামে বুক কাঁপিয়া উঠে; সেইরূপ যে নামীকে আমার বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, সে মুখে নাম উচ্চারণ করিতে পারে না; একবার নাম উচ্চারণ করিলেই অঙ্গে হর্ষ, পুলক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণগুলি প্রকটিত হইবে।

১২৯। নাম করিতে করিতে প্রেম হয়।

১৩০। অনধিকারীর কাছে নামের ব্যাখ্যা করিও না, তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে।

১৩১। নাম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, আলস্য দূরে পলায়ন করিবে।

১৩২। যিনি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিয়াছেন—যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, "সে আমার, আমি তাঁর," তিনিই নামের প্রকৃত অধিকারী।

১৩৩। নামে রুচি না হইলে নাম মুখে আসে না; সেও তাঁহার ইচ্ছা,—কৃপা।

১৩৪। বৃথা নামে হৃদয় কোমল না হইয়া কঠিন হইয়া যায়; নামে অশ্রদ্ধা হয়।

১৩৫। যখন নাম নিতে নিতে আমার আমিত্ব ভুলিয়া যাইব,—আমার বলিতে কিছুই থাকিবে না; তখনই প্রকৃত নাম নেওয়া হইল।

১৩৬। উচ্চ অধিকারীই নাম নিবার যোগ্য।

১৩৭। স্ত্রীলোকের একটী সন্তানপালন দ্বারা সন্ন্যাসের সাধনা শিক্ষা হয়।

১৩৮। সন্ন্যাসী ভগবন্নির্ভর করিবে, সে কখনই আত্মনির্ভর করিবে না।

১৩৯। যুবতী যেমন স্বামীর নাম মুখে আনে না, শিষ্যও তেমনি গুরুর নাম গোপন রাখিবে।

১৪০। ভিজা কাঠ ও বিষয়াসক্ত জীব একই জিনিষ, ভিজা কাঠে সহজে আগুণ ধরেনা, বিষয়াসক্ত জীব হৃদয়ও সহজে ভগবন্নামে মজে না।

রাজচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

:0:

সিদ্ধেশ্বর-ভৈরব।

আজকাল দেশের এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে যে, হিন্দু আর হিন্দুর দেবদেবী মানিতে কিম্বা দেবদেবী সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ আদৌ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এ সব কথা বাজে কথা, বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ, ভীরু কাপুরুষ বা বায়ুরোগগ্রস্ত উন্মাদের উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অজ্ঞ সমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া নিজেরাই অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করতঃ বাহবা নিতে যত্নবান হন। তথাপি আমরা একটী সত্য ঘটনা স্বধর্ম্মনিরত-পাঠকগণের অবগতির জন্য বিবৃত করিলাম।

এবার দামোদরের বন্যা উপলক্ষে আমরা বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর গিয়াছিলাম; আমাদিগের কার্য্যকালের অধিকাংশ সময়ই কাঁথিতে

কাটাইয়াছি। আমরা কাঁথি অঞ্চলে বন্যা-পীড়িত গ্রাম সমূহ পরিদর্শন কালে দেখিয়াছি—প্রায় অধিকাংশ গ্রামে ২।১টী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক কাঁথি সহরেই কালীবাড়ী, দক্ষেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরভৈরব প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন দেবালয় আছে; তাঁহাদের কোনটীতে আজও রীতিমত পূজা অর্চ্চনা হইতেছে,—আর কোনটীতে বা কাল-মাহাত্ম্যে দেবতার আর তেমন পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা নাই—লোকেরও তেমন ভাবভক্তি নাই; কোনমতে নিয়ম রক্ষা করিয়া পূজার্চ্চনাদি হইয়া আসিতেছে। আমাদের আখ্যায়িকা-সংশ্লিষ্ট বাবা সিদ্ধেশ্বরভৈরব তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম বিগ্রহ।

যে কাঁথি সহর আজ জনকোলাহলে মুখরিত—বিচিত্র সৌধমালায় সুশোভিত—নানাপ্রকার বিপণিআপণ সজ্জিত—পূর্ব্বে সেই সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। কালপ্রবাহে সমুদ্র দূরে সরিয়া গিয়াছে, এবং জল স্থলে রূপান্তরিত হইয়া নানাবিধ বন্য গাছ-গাছড়া পূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। (বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র কাঁথি হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে।) বাবা সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের স্থানও নাকি এরূপ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এরূপ প্রবাদ আছে যে প্রত্যহ একটী দুগ্ধবতী গাভী আসিয়া বাবার বিগ্রহের উপর দাড়াইত, এবং দুগ্ধধারা স্বতঃই নিস্থত হইয়া বাবার উপর বর্ষিত হইত; ক্রমে ইহা লোকলোচনের গোচরীভূত হইল, বাবারও মাহাত্ম্য লোক-সমাজে ঘোষিত হইতে লাগিল।

কাঁথি বাজারের নিকট সরকারী খালের পাড়ে বাবা সিদ্ধেশ্বরভৈরবের আসন স্থাপিত; ইহা একটী নাতিক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের ভিতরে একটী কুণ্ড। কুণ্ডটী খালের সঙ্গে সংযুক্ত, ইহাতে খালের সঙ্গে জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে; কাজেই জোয়ার ভাটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা সিদ্ধেশ্বরও কখন দৃষ্ট কখন বা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। সিড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলে বাবা সিদ্ধেশ্বরকে দর্শন স্পর্শন করা যাইতে পারে।

আমরা কাঁথিতে খুব আনন্দেই কাটাইয়াছি। কাঁথির দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে "হরিসভা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিসভাতেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হরিসভার সভ্যদিগের সহৃদয় ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে তথাকার কোন স্বধর্ম্মানুরাগী জনহিতৈষী মুন্সেফবাবুর উদ্যোগে উক্ত "হরিসভা ও তৎসংশ্লিষ্ট" মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং কিছুদিন শিক্ষিত সজ্জন ও সভ্যগণ যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর তাঁহাদের তেমন অনুরাগ নাই, প্রাণহীন হরিসভার মন্দিরটী নীরবে দাড়াইয়া প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে উক্ত হরিসভায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা যতদিন কাঁথিতে ছিলাম, প্রতি বৃহস্পতিবারেই এই কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়াছি। অনেক স্থানেই ভগবন্নামকীর্ত্তনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া যথোচিত সাদরে গৃহীত ও অভ্যর্থিত হইয়াছি; আমরা সেজন্য স্বধর্মনিষ্ঠ সজ্জনগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ মা'দের সরল বিশ্বাস,

ভগবানে ভক্তি ও নামে রুচি অতুলনীয়া।

আমরা গুরুকৃপায় ভগবৎ প্রসঙ্গোপলক্ষে তাঁহাদের যে অপার্থিব, নিঃস্বার্থ, অকপট স্নেহ মমতা ও সন্তানবাৎসল্য লাভ করতঃ বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহারা প্রত্যেকে যেন আনন্দময়ী মায়ের জীবন্ত মূর্ত্তি।

উক্ত মা-দিগের মধ্যে কেহ একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যেন বাবা সিদ্ধেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন যে অমুক অপরাজিতা গাছের ফুল (অন্য বাড়ীস্থিত) দ্বারা আমাকে পূজা দাও। স্বপ্ন অমূলক ভাবিয়া, মা এই আদেশ গ্রাহ্য করিলেন না। পূজাও আর দেওয়া হইল না। এই ঘটনার প্রায় ১৫।২০ দিন পরে তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে এই কথা জানাইলে আমি পূজা দিতে বলিলাম। তদনুসারে পূজা দেওয়া হইল।

ইহার কয়েক দিন পরে অন্য এক বৃদ্ধা মা একদিন শেষরাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, বাবা সিদ্ধেশ্বরভৈরব তাঁহার ঘরের বারাণ্ডায় দাড়াইয়া বলিতেছেন যে, সে দিন আমাকে পূজা দিয়াছে কিন্তু আমার পূজা হয় নাই। কেন না আমি দুগ্ধ পাই নাই,—বিল্বপত্র পাই নাই,—ডাব পাই নাই,—পঞ্চামৃতও পাই নাই। তখন মা বলিলেন—"আমি কি রূপে পূজা করিব, খাঁটি দুধ কোথায় পাব?" বাবা বলিলেন—"তা হবে" মা আবার বলিলেন—"আমি দীনাহীনা দরিদ্রা, অন্যান্য পূজোপকরণ সংগ্রহের আবশ্যকীয় অর্থ কোথায় পাইব? বাবা বলিলেন—"তাও হবে।" এই বলিয়া পূজা দিতে আদেশ করতঃ চলিয়া গেলেন। ইহার পরদিন আমরা সেই বাড়ীতে গমন করায় মা আমাদিগকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—যে, "বাবা, তোমরা কি বাবা সিদ্ধেশ্বরকে কোন পূজা দিয়াছ?" আমরা বলিলাম "না মা, আমরা দেই নাই তবে আমাদের জ্ঞাতসারে পূজা দেওয়া হইয়াছে।" অতঃপর আমরা তাঁহাকে পূজার আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াদিলাম।

আমি পূর্ব্বোক্ত বাটীতে গিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম স্বপ্নবৃত্তান্ত সর্ব্বৈব সত্য। খাঁটী দুগ্ধাভাবে সংশয়াকুলচিত্তে বাজারের দুধ,—ঘৃত দধি অভাবে তিনটী উপকরণ যোগে পঞ্চামৃত দেওয়া হইয়াছে। ডাব ও বিল্ব-পত্রেও বিশেষ দোষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং অপরাধ স্বীকার করতঃ পুনরায় পূজা দিলেন।

অবিশ্বাসী অহংজ্ঞানবিমূঢ় নাস্তিকগণ জানিয়া রাখুন—হিন্দু ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম; ইহা অভ্রান্ত; যত দিন পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য আছে, ততদিন হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশ নাই। যুগ-যুগান্তর হইতে কত ধর্ম্মের উদ্ভব ও লয় হইল, কিন্তু শত সহস্র ঝড় তুফানের ভিতরেও, হিন্দুধর্ম্ম-হিমাচলের মত অচল অটলরূপে দণ্ডায়মান আছে। তাই বলি ভ্রাতৃগণ, আপন ঘরের মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করতঃ পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনের প্রয়াসী হইও না,—তোমার ঘরে অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার সজ্জিত, তুমি কেন পরের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থী? সকলেরই আপন আপন শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুমোদিত পথে চলা উচিত, তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, কাঁথিতে ধনাঢ্য অথচ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সহৃদয় মহাত্মার অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাবা সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ও তাঁহার পূজার্চ্চণার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ হিন্দুধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্য সাহায্য করিয়া সাধু মহাত্মা ও ভক্ত মণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন কি ? যে দেবালয় সর্ব্বদা সুগন্ধি কুসুম চন্দন ও ধুপধুনার গন্ধে আমোদিত থাকা উচিত—সেই দেবালয়ের এমনই শোচনীয় অবস্থা যে গলিত ফুল বিল্বপত্রের দুর্গন্ধে মন্দিরে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য ? বাবা সিদ্ধেশ্বর দুর্গন্ধপূর্ণ কুণ্ডোদ নিমজ্জিত। হায় কাল মাহাত্ম্য, ধন্য তোমার প্রতাপ ! যে হিন্দু ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, আজ কিনা তাঁহাদেরই অধস্তন সন্তানগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে হাসিমুখে অনর্থে কত অর্থব্যয় করিতেছে, অথচ চক্ষের সম্মুখে দেবতা ব্রাহ্মণের অনাদর উপেক্ষা হইতেছে, দেখিয়াও দেখিতেছেনা ! ভগবান্ ! ভারতের এমন সুদিন কবে আসিবে, যখন হিন্দুসন্তানগণ হিন্দুধর্ম্মের অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া নতমুখ উঁচু করতঃ জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। ভারতের ঘরে ঘরে হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইবে। দশদিক আনন্দিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে ॥

কস্যচিৎ সেবকস্য ॥

:0:

বর্ষশেষে নিবেদন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য)

বঙ্গাব্দ ১৩২০ সালের সঙ্গে সঙ্গে "আর্য্য-দর্পণ" ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রমকরতঃ আগামী বৈশাখ মাসে ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিয়া পুষ্টকলেবরে গ্রাহকবর্গের সমীপে সমুপস্থিত হইবে। নূতন বৎসরের প্রথম হইতেই আমরা পত্রিকার এক ফর্ম্মা অর্থাৎ আট পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়া আয়োজন উদ্যোগ করিতেছি। সুতরাং তিন ফর্ম্মার স্থলে ৭ম বর্ষে ৪ ফর্ম্মা হিসাবে প্রতি মাসে "আর্য্য-দর্পণ" বাহির হইবে। যদিও এই পত্রিকার গ্রাহক কয়েকজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্র,—সংখ্যায় অতি অল্প ; তথাপি তাঁহারা "আর্য্য-দর্পণকে" হৃদয়ের চক্ষে দেখিয়া স্বধর্ম্মের গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর্য্য-দর্পণকে "ধর্ম্মপিপাসুর সুশীতল পানীয়" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাই আমরা যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াও—আর্থিক লাভের আশা ছাড়িয়াও দেশের মঙ্গলার্থ ইহার প্রচার বন্ধ করিতে পারি নাই। এবার আবার শিক্ষিত ও সজ্জন গ্রাহকবর্গ পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন এবং তজ্জন্য-বর্দ্ধিত মূল্য দিতেও তাঁহারা সম্মত। তাঁহাদিগের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া আমরা আর্য্য-দর্পণের এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিতে সংকল্প করিলাম। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন। আশা আছে, জগদ্গুরু

জগদীশ্বরের কৃপায় আগামীবর্ষেই আমরা যথারীতি পত্রিকার কার্য্যে ব্রতী হইয়া সনাতন ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত থাকিব।

আমরা প্রতিবর্ষের প্রথম সংখ্যা পত্রিকা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া গ্রাহকবর্গের নিকট অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা গ্রহণ করিয়া থাকি। সেজন্য শেষ সংখ্যা চৈত্রমাসেই আমরা জানাইয়া থাকি যে, কাহারও ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা লইতে অসুবিধা বা আপত্য থাকিলে আমাদিগকে চৈত্রমাস মধ্যে জানাইবেন' নতুবা ভিঃ পিঃ প্যাকেট্ ফেরত আসিলে কৌপীন-মাত্রৈক সম্বল ভিখারী পরিচালক-বর্গকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়।" গ্রাহকগণই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু যে সকল গ্রাহক অকারণে নির্ম্মম হইয়া একটু ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে নিজ সাহায্য প্রতিগ্রহণ করেন, আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও একপয়সার পোষ্টকার্ডে না জানাইয়া পত্রিকা ফেরত দেন, তাঁহারা পরপ্রত্যাশান্বিত পত্রিকার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপন কার্য্যের সহায়ক-স্বরূপ সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় এরূপ দায়ীত্ব-জ্ঞানহীন অভদ্র ব্যক্তি এবার এই পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীতে নাই বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। আমরা বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহেই ৭ম বর্ষের "আর্য্য-দর্পণ" ভিঃ পিঃ ডাকে গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইব। যদি কোন গ্রাহক বিশেষ কারণে পত্রিকা গ্রহণে অসমর্থ হন, চৈত্রমাসের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। আশাকরি, কোন গ্রাহকই এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

নানাবিধ কারণ বশতঃ এই সংখ্যা পত্রিকা বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তাই এই সঙ্গে ৬ষ্ঠ বর্ষের "সূচী" পাঠাইতে পারিলাম না; বৈশাখ সংখ্যার সঙ্গে প্রেরিত হইবে। সুতরাং এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্রেই ৬ষ্ঠ বর্ষের "আর্য্য-দর্পণ" না বাঁধাইয়া অপেক্ষা করিবেন।

পত্রিকার আকার বৃদ্ধি হইলেও মূল্য কিন্তু বৃদ্ধি হইল না, সেই দুই টাকাই ধার্য্য রহিল। অতএব আশা করি, এবৎসর অনেক স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ জ্ঞানোৎসাহী সুধীসজ্জন "আর্য্য-দর্পণের" নূতন গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত, অনুগৃহীত ও বর্দ্ধিত ব্যয়জন্য ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবেন।

পরিশেষে পত্রিকার হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণের নিকট প্রার্থনা এই, তাঁহাদের যেন স্মরণ থাকে, এই পত্রিকা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—ইহার সমস্ত আয় দরিদ্র ও অনাথ নারায়ণসেবায় ব্যয়িত হয়। আপনাদিগের অনুগ্রহের উপরেই আর্য্য-দর্পণের উন্নতি ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে। এক একজনের শক্তি পত্রিকার জীবন ধারণের পক্ষে আমরা যথেষ্ট মনে করি। সুতরাং যথাসাধ্য, বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ইহার প্রচার এবং নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া গ্রাহক মাত্রেই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। পত্রিকা পাঠে যেমন একদিকে সাধুভক্তের অমৃতময়ী লেখনীর মধুরাস্বাদে তৃপ্ত হইবেন; তেমন গ্রাহকগণ আপন আপন প্রদত্ত অর্থে

অন্যদিকে দরিদ্র-নারায়ণসেবার পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন। আমাদিগের উভয়দিকেই সেবাব্রতের সার্থকতা হইবে। কিমধিক বিস্তরেণ—

বিনীত
প্রকাশক—"আর্য্য-দর্পণ"
পোঃ কোকিলামুখ
(যোরহাট)।

—:0:—

শ্রীহট্টে অন্নকষ্ট।

বিগত বর্ষাঋতুর প্রাক্কালে অকস্মাৎ বন্যার জলে শ্রীহট্ট কাছাড়ের অনেকাংশ ভাসিয়া যায়। এই আধিদৈবিক উৎপাতে শ্রীহট্টের নানা স্থানে অজন্মায় শস্য নষ্ট হইয়াছে অনেকগুলি বড় বড় মাঠে শুধু ধান নহে গো-গ্রাসের তৃণ পর্য্যন্ত ছিল না। ইহাতে শ্রীহট্টের কোন কোন স্থানে অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। ঘাসের অভাবে কৃষিকার্য্যের অনন্যসম্বল গরুগুলি মরিয়া গিয়াছে। ফলে শ্রীহট্ট জেলার অনেক স্থানে কৃষকের ঘরে অন্ন নাই, গোয়ালে গরু নাই, গোলায় বীজের ধান নাই; সুতরাং কৃষিকার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বানিয়াচঙ্গ অঞ্চলের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। আরও অনেক স্থান হইতেই অন্নকষ্টের বার্ত্তা আসিতেছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এই বিপৎপাত হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এক বাণিয়াচঙ্গেই লক্ষাধিক টাকা কৃষি-ঋণ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন। অন্নকষ্টে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। ইহারা প্রকাশ্যে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না; নিম্নশ্রেণীর দলে মিশিয়া টাকা ধার করিতেও অপমান বোধ করে। যাহাদের জমিজমা নাই তাহারা জামিন জুটাইতে না পারিলে "কৃষি-ঋণ" পাইতে পারে না। অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের ন্যায় দেশের লোকেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। শিলচরে আমরা একটা সাহায্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। প্রার্থনা করি, এই দুঃসময়ে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই সাহায্য-ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করিয়া আর্ত্তত্রাণে অগ্রসর হইবেন। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে। টাকাকড়ি সমস্ত শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস বি, এ, সম্পাদক বাণিয়াচঙ্গ অন্নকষ্ট সমিতি, অথবা "ম্যানেজার সুরমা" শিলচর, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকামিনী কুমার চন্দ।
সভাপতি—শিলচরস্থ বাণিয়াচঙ্গ অন্নকষ্ট সমিতি।

আমরাও উক্ত সমিতি পক্ষে অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছি; যিনি যাহা দান করিবেন,—"ম্যানেজার-আর্য্য-দর্পণ", পোঃ

কোকিলামুখ, শিবসাগর, আসাম—এই ঠিকানায় অথবা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায়ও পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার—"আর্য্য-দর্পণ"।

—:0:—

স্নেহলতার আত্মবলি।

হিন্দুসমাজরূপ বিরাট কলেবরের ক্ষতগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাই আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই এই সকল শুভ লক্ষণের সূচনা দেখিতে পাই। আপাততঃ যাহা ভীষণ, নিষ্ঠুরতা ও অমঙ্গলজনক বলিয়া আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার প্রয়াস পায়, কালে তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ বুঝিতে পারি ঘটনাচক্রেই এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া সেই মন্দটীই এত মঙ্গলজনকে পরিণত হইয়াছে।

যেখানেই স্বার্থত্যাগ সেখানেই অন্যের উপকার এবং প্রভূত মঙ্গল। একটুমাত্র স্বার্থের সংস্রব থাকিলে যতই মহৎ কার্য্য এবং যতই পরহিতার্থে অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা নিশ্চয়ই বৃথায় পরিণত হইবে। যাঁহারা এ জগতে জীবের হিতের জন্য কিছু করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের পুণ্যপূত নাম শাস্ত্রাদি পুরাণেতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে সযত্নে রক্ষা করিতেছে, তাঁহারা সকলেই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাই হিন্দু রাজরাজেশ্বরের মণিময় মুকুট কৌপীন-কন্থাধারী ভিক্ষুকের চরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ভারত কেন—জগতের সর্ব্বত্রই ত্যাগী ও সাধু সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়া থাকে। এইজন্যই সহমরণপ্রথা আত্মহত্যা পাপে দুষ্ট হইয়াও ত্যাগবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া হিন্দুর নিকট পবিত্র ও অনুমোদনীয় হইয়াছিল। হিন্দু চিরদিনই ত্যাগী, তাই হিন্দু বলিলেই ত্যাগের মূর্ত্তিমান দেবতা বলিয়া মনে হয়। আমরা যেখানে এই ত্যাগের আদর্শ দেখিতে পাই, সেখানেই হিন্দুসমাজের জীবন-সঞ্চার উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হই।

আজ একটী নাবালিকা, অশিক্ষিতা (অবশ্য সভ্যতার দৃষ্টিতে) বালিকা জগতসমক্ষে যে অভিনয় করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, বাস্তবিকই তাহা জগতে নূতন ও অতুলনীয়। এখনও যে হিন্দুসমাজে আর্য্য-দৃষ্টান্তের—আর্য্য-গৌরবের অভাব হয় নাই এই সকল ঘটনা হইতে আমরা তাহার আভাষ পাইয়া আনন্দানুভব করিয়া থাকি। আর্য্যরক্ত যত দিন সমাজ-দেহের যে কোন ধমনীতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের অতুলনীয় গৌরব ঘোষিত হইবে। যে স্থানে যে শক্তির যত স্ফুরণ ও বিকীরণ হইয়াছে, সেস্থানে সেই শক্তি তত দীর্ঘকাল স্থায়ী; সুতরাং আর্য্য-ভাব, আর্য্য-অনুশীলন ও আর্য্য-ধর্ম্ম যে শীঘ্রই লোপ পাইবে, আমরা তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। যতই বহিঃশক্তির প্রতিবন্ধক,—যতই অন্য জাতীয় ভাবরাশির আবর্ত্ত আসুক না কেন, এই বিশাল স্রোতশক্তিকে বিপর্য্যস্ত

করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না।

আমরা এই বালিকার অসাধারণ তেজ ও মহাপ্রাণতার বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাকে দেবী বলিয়াই মনে করিতেছি। হিন্দুসমাজের কোন বিশিষ্ট অঙ্গের ক্ষত আরোগ্য করিতেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। যে পণপ্রথা শত শত সাময়িক প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতার সাহায্যে রহিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল, আজ সেই চেষ্টা একটী নগণ্যা বালিকার আত্মত্যাগে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সমগ্র হিন্দুজাতির সাধনার ফলে এই কন্যারত্নের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমাজ আজ না হউক, কাল না হউক, অদূর ভবিষ্যতে তাহার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই অজস্র অনুতাপ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে।

এই পূতচরিত্রা বালিকাটী নিভৃত সরসীজাত পদ্মিনীর ন্যায় কলিকাতার কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পিতার নাম শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বালিকার বয়স যখন ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে, পিতা বহুকষ্টে একটী বি, এ, পাশ এবং আইনাধ্যায়ী ছাত্রকে পাত্র মনোনীত করেন, এবং চুক্তি হয় যে বরকে নগদ ও অলঙ্কারে দুই হাজার টাকা পণ ও যৌতুকস্বরূপ দান করিতে হইবে। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যদি উপযুক্ত পাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে পারেন, তবে তিনি ধন্য হইবেন ভাবিয়া অগত্যা মুখোপাধ্যায় মহাশয় পৈত্রিক ভদ্রাসনটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও এই টাকা সংগ্রহ করতঃ কন্যার বিবাহ দিতে স্থিরসংকল্প করেন। বালিকা প্রথমতঃ পিতাকে তাহার বিবাহের জন্য এইরূপ নিঃস্ব হইতে বিরত করিবার প্রয়াস পায়, কিন্তু যখন দেখিল পিতা তাহার বিবাহের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষুক সাজিতে প্রস্তুত, তখন আর স্নেহলতা স্থির থাকিতে পারিল না। পিতার সাধের স্নেহের লতাটী পিতার স্নেহপাশ চিরতরে ছিন্ন করিয়া বজ্রাদপি কঠিন হৃদয় লইয়া পিতাকে ভীষণ কন্যাদায় হইতে এবং সমাজের পণপ্রথারূপ কলঙ্ককালিমা অপনোদনের জন্য আত্মবলি দিতে কৃতসংকল্প হইল। গত মাঘ মাসে একদিন নিশীথ রাত্রে সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে স্নেহলতা গৃহছাদে উঠিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র কেরোসিন তৈলসিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নি বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিল। এইরূপে একটি মহাপ্রাণ জাতীয় মন্দিরে মহামায়ার সেবার্থে উৎসর্গীকৃত হইল।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

সৎকার্য্যে দান—জৈনগণের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনকল্পে শেঠ দানবীর হুকুমচাঁদ চারি লক্ষ টাকা দান করতঃ মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ভগবান তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

—0—

সৎসাহসের পুরস্কার—১৯১২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে শিবপুর কলেজ ঘাটে নৌকা ডুবিয়া অনেক লোক নিমজ্জিত হইয়াছিল; তাহাদিগের উদ্ধারার্থে যে ছয়জন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা বিলাতের রয়েল হিউমেন সোসাইটীর নিকট হইতে প্রশংসাপত্র ও ব্রোঞ্জ মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর এই ছয়জনকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করতঃ শতমুখে সৎসাহসের জন্য সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

———0———

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—কলিকাতা ঝামাপুকুরলেন নিবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে উইল করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পত্নীর লোকান্তর গমনের পর এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাইবেন।

———0———

সতী কাহিনী—গত শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন কলিকাতা-উত্তরপাড়া নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কলেরা হয়। পত্নী ও আত্মীয় স্বজনের যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইল। শ্রীপঞ্চমী দিন প্রাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমরধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী সৎকারের যাবতীয় আয়োজন ও পরিজনগণের প্রতি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ গীতা লইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া আসনে বসিলেন ও বস্ত্রে আগুন ধরাইয়া দিলেন। সতী যুক্তকরে স্বামীধ্যানে নিমগ্না, আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীর লোকে অনেক চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন বটে, কিন্তু সতীলক্ষ্মী তিন ঘণ্টার মধ্যেই দেহত্যাগ করতঃ স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। অতঃপর দম্পতীর যুগলদেহ একই চিতায় দাহ করা হইয়াছে।

আমরা নিম্নে আর একটী বৈচিত্র্যময় মুসলমান সতী-কাহিনী পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—ঘটনাটী এই—পতি বৃদ্ধ ও মুমূর্ষুপ্রায়, পত্নী দ্বিতীয় পক্ষের পরিণীতা, তরুণী ও সুন্দরী। বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের পুত্র ও কন্যা জীবিত আছে। তাহার অভাবে পত্নী মুসলমান ধর্ম্মানুসারে পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সন্তানগণের অশেষ কষ্ট হইবে ভাবিয়া মুমূর্ষু পতি, পত্নীকে পত্যন্তর গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করিল, পত্নীও সম্মতা হইয়া স্বামীবক্ষে মুখ লুকাইল। অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধের প্রাণত্যাগ হইল। শব অপসারিতকালে দেখা গেল পত্নীও পতির অনুগমন করিয়াছেন। ধন্য সতী! ধন্য তোমার পতিপ্রেম! আজ ভারতের ঘরে ঘরে এরূপ কত শত সতী বনফুলের ন্যায় নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে কে তাহার খবর রাখে?

পাঠকগণ! নিম্নের ঘটনাটী অন্য রকমের—ইহা পত্নীর অনুগমন নয়, পতির সহমরণ।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতারার অধীন ডুমরিয়া গ্রামে গঙ্গারাম দত্ত নামে এক দরিদ্র বৃদ্ধ ও তাহার বৃদ্ধা পত্নী এক ভগ্নগৃহে বাস করিতেছিল। তাহারা নিঃসন্তান, ফেরি দ্বারা অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একসময়েই উভয়ের জ্বর হয়। গ্রামে স্বজাতি থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহাদিগের খোঁজ খবর নেয় নাই। ২।৩ দিন উপবাসের পর বৃদ্ধ নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষার্থ গমন করে; ২।৩ সের দানা সংগ্রহ করতঃ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে ডাকে; স্ত্রীর বাকশক্তি রোধ হইয়াছে, কে উত্তর দিবে? অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধার প্রাণবিয়োগ হইল। বৃদ্ধ ও মৃতা পত্নীর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করতঃ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও সকল দুঃখের অবসান হইল।